এমিলি ব্রন্টি
রাহুর প্রেম

অনুবাদ:
অশোক গুহ
সাহিত্য
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ

মহালয়া ১৩৬১

প্রকাশিকা

আভারাণী মিত্র

২৪সি, রামকমল সেন লেন

কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

মুদ্রণী

কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

[illegible]

[illegible] মিত্র

পরিবেশক

রূপায়ণী বুক শপ

১৩।১ কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা-১২

সাড়ে চার টাকা

। পরিচিতি ।

এমিলী ব্রন্টী

১৮১৮-১৮৪৮

কাল—উনিশ শতক।

স্থান—ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত জলাভূমিময় অঞ্চল।

সেখানে এক পাদ্রীর ঘরে জন্মালেন তিনটি বোন। শার্লটি, য়্যান আর এমিলী। পাণ্ডব-বর্জিত এ অঞ্চল। সংসার আছে, সমাজ নেই। তাই পারিবারিক বৃত্তে তিন বোনের দিন কেটে চললো পড়াশুনোয়। আর গোপনে গোপনে সাহিত্য-সাধনায়।

এই সাহিত্য-সাধনার ফলে একদিন ত্রয়ীর একখানা কবিতার বই বেরুলো। ওঁরা সে-বই-য়ে নিলেন ছদ্মনাম। শার্লটি কুরার বেল, য়্যান য়্যাক্টন বেল এবং এমিলী এলিস বেল। ভিক্টোরীয় যুগের সনাতনী সংস্কারের জন্যই পুরুষোচিত নামের এই ব্যবহার হোল বটে, কিন্তু সমালোচকেরা সে বইখানিকে কদর করলেন না। তবু এমিলীর কবিতা কিছুটা সমাদর পেল। ভগবদ বিশ্বাসে ভাবমেদুর সে কবিতা।

কিন্তু দমলেন না ত্রয়ী। আবার উপন্যাসের মাধ্যমে চেষ্টা শুরু হোল। এমিলী ওরফে এলিস বেল লিখলেন 'উদারিং হাইটস' য়্যাক্টন বেল 'আগনেস গ্রে' আর কুরার বেল—'জেন আয়ার'। প্রথম দুখানির বহু দেরীতে প্রকাশক মিললো; কিন্তু তৃতীয়খানি প্রকাশকের নামঞ্জুরীর ছাপ [illegible] ধূসর হয়ে উঠলো। অবশেষে সেখানিও ছাপা হোল এবং প্রথম দুখানির-

সাকল্যকে ম্লান করে দিলে। কিন্তু 'ওয়াদারিং হাইটস্' আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোল পরে। এখনো তাই আছে।

যাহোক, 'ওয়াদারিং হাইটস্' বেরুল, কিন্তু সমালোচকেরা সঠিক বিচার করতে বসলেন না। বইখানি অবহেলিত হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু ভগিনীরা তবু দমলেন না, আবার শুরু করতে হবে। নিজের ক্ষমতার প্রতি আছে অটুট বিশ্বাস। কিন্তু এবার এল আকস্মিক দুর্ঘটনা। এমিলীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল। সেদিনের কথা লিখেছেন তাঁর বোন শার্লটি তাঁর স্মৃতিকথায়:—দিনের পর দিন কি ভাবে সে সইলে সেই রোগের দহনজ্বালা, আমি তো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম বিস্ময়ে, ভালবাসায় আর উদ্বেগে। এমন তো আর দেখিনি। পুরুষের চেয়েও শক্তিশালী, শিশুর চেয়েও সরল, তখন তার প্রকৃতি।......দুটি মাস কেটে গেল; নির্মম মাস দু'টি......আমাদের হৃদয়ের ধন শুকিয়ে যেতে লাগল চোখের উপরে। মৃত্যুর দিনে এমিলীর তো আর কোন অস্তিত্বই ছিল না, শুধু ছিল যক্ষ্মা-জর্জর ক'খানি অস্থিপঞ্জর। ও মারা গেল ১৮৪৮ সালের ১৯শে ডিসেম্বর।'

য়্যানও ক মাস পরে ওঁরই সঙ্গী হলেন। রইলেন শার্লটি।

আর রইল এমিলীর একমাত্র সাহিত্যকীর্তি 'ওয়াদারিং হাইটস্'। অবশ্য ইদানীং তাঁর কবিতারও সমাদর দেখা যাচ্ছে।

॥ কৈফিয়ৎ ॥

আবার 'ওয়াদারিং হাইটস্' পড়লাম। এই প্রথম স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার ত্রুটি (হয়তো সত্যিই এগুলি ত্রুটি) ; স্পষ্ট ধারণা হোল, অন্য লোকের কেমন লাগে—লেখিকার অপরিচিতদের কেমন লাগে। কাহিনীর সংযোগ-অঞ্চলকে তো তারা চেনে না। তাদের কাছে ইয়র্কশায়ারের ওয়েস্ট রাইডিং-এর নগণ্য গ্রাম, তার অধিবাসী আর আচার ব্যবহার তো অপরিচিত, অজ্ঞাত।

এমনি মানুষের কাছে উত্তর ইংলণ্ডের এই জলাময় অঞ্চল কোনো কৌতূহলের সৃষ্টি করে না। এদের ভাষা, রীতিনীতি, এমন কি এদের আবাসভবনও পাঠকদের কাছে তো বহুলাংশেই দুর্বোধ্য আবার যেখানে সুবোধ্য সেখানে তো বিরক্তিকর। যে-সকল নরনারীর প্রকৃতি শান্ত, যাদের অনুভূতির বেগটা সাধারণ এবং মামুলী, বিশিষ্টতা বলে যাদের কিছু নেই—যারা ছোটবেলা থেকেই রীতিনীতি কাটছাট করে চলতে শিখেছে, ভাষাকে সংযত করে রাখছে, ওদের কাছে শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন জলাভূমিময় অঞ্চলের অশিক্ষিত ভূস্বামীদের উদ্ধত ব্যবহার, পৌরুষ ভাষণ এবং আবেগের বর্বর প্রকাশ তো খারাপ লাগবেই। তেমনি বহু পাঠক এই বইয়ে এমন অনেক কথা পাবেন যা শুধু আদি বা অন্ত অক্ষর দিয়েই ব্যক্ত হয়—মাঝখানে থাকে ফাঁকা। আমার ক্ষমা-প্রার্থনার শক্তি নেই, বরং আমি শব্দগুলির পূর্ণ প্রকাশের পক্ষে। দুর্দান্ত এবং মন্দস্বভাবদের এই গালগালগুলো দিয়ে কথা অলঙ্কৃত করবার আক্ষেপ আছে বই কি। শুধু একটি অক্ষরে তার প্রকাশ রুচি-সম্মত হলেও আমার কাছে দুর্বল এবং ব্যর্থ বলেই মনে হয়। আমি তো জানি না—এতে রুচিটা কোথায় বাঁচে—কোন্ রসিকজনের ভাবাবেগকে রেহাই দেয়—কোন্ ভীরুতা তাকে আড়াল করে রাখে!

ওয়াদারিং হাইটস্-এর গ্রাম্যতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ আমি তা মেনে নিই। আমার মনে হয়, বইখানির গুণ সেইখানেই। হাঁ, সারা বইখানা জুড়েই রয়েছে গ্রাম্যতা। এতে হাওরের ছাপ আছে, বনবাদাড়ের ঝোপঝাড়ের শিকড়ের সেই গাঁটও রয়ে গেছে। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, যদি লেখিকা শহুরের অধিবাসিনী হতেন, তাহলে তাঁর রচনায় অন্য বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠতো। যদি এমন একটা বিষয়েও তাঁর ঝোঁক পড়তো, তাহলেও তার আঙ্গিক হোত ভিন্ন জাতের। এলিস বেল যদি অভিজাত মহিলা বা নগরবাসিনী হতেন, যাকে 'সমাজ সংসার' বলা হয়, তাতে যদি তিনি অভ্যস্ত হতেন, এই অঞ্চল আর তার বাসিন্দাদের অন্য দৃষ্টি দিয়েই তিনি দেখতেন। গ্রামাঞ্চলে লালিতা মেয়ের চোখে তিনি যা দেখেছেন তার থেকে তফাৎটা ঢের বেশিই হোত।

একথা নিশ্চিত যে, হয়তো বিষয়ের বিস্তৃতি ঘটতো—আরো ব্যাপক হোত; কিন্তু আরো মৌলিক এবং আরো সত্য হয়ে উঠতো কিনা কে বলবে! এই দৃশ্য আর সংযোগস্থল, এই দুটিই এমন দরদে জীবন্ত হয়ে উঠতো না।

এলিস বেল সেভাবে বর্ণনা করেননি, যাতে এমন মনে হবে যে, তাঁর নিজের চোখ আর রুচিটাই সব—তারই আনন্দে তিনি মত্ত;—তিনি যেন তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা তাই যথাবিহিতই হয়েছে।

মানব চরিত্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আবার আলাদা ব্যাপার। আমি একথা বলতে বাধ্য, তিনি যে-চাষীদের ভিতরে বাস করতেন, ওদের সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব জ্ঞান ছিল একজন মঠবাসিনীরই মতো। মঠবাসিনী যেমন মঠের ফটকের বাইরে কদাচিৎ পা দেন—যে লোকালয়ে তাঁর বাস তার খবর রাখেন না—তিনিও ছিলেন ঠিক তাই। আমার ভগিনীর এই ঘরকুণো স্বভাব স্বাভাবিক নয় অবস্থাগতিকে এই নির্জনপ্রিয়তা তাঁর ভিতরে এসেছিল! শুধু গির্জায় যাওয়া বা পাহাড়ে একটু আধটু বেড়াতে যাওয়া ছাড়া তিনি খুব কমই বাড়ির আঙিনা পার হোতেন! আশেপাশে মানুষদের উপর তিনি সদয় ছিলেন কিন্তু কখনও সঙ্গ পেতে লালায়িত হয়ে ওঠেন নি। সামান্য কয়েকজন ছাড়া কারো সঙ্গদানের

অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়নি। তবু তিনি তাদের জানতেন। তাদের আচার ব্যবহার, ভাষা, কুলজি সব জানতেন, ব্যগ্র কৌতূহলেই শুনতেন, আবার খুঁটিয়ে বলতেও পারতেন। জীবন্ত এবং নিভু'ল হয়ে উঠতো তাঁর বর্ণনা। কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত তিনি কখনো বলেননি। তাই তিনি বাস্তবতার বিয়োগান্ত আর ভয়ংকর দিকটারই উপাদান সংগ্রহ করে ছিলেন, তিনি ওদের গোপন কাহিনী থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে পড়েছিল তারই ছাপ! তাঁর কল্পনা সূর্যকরোজ্জ্বল তো ছিল না, ছিল বিষাদগম্ভীর, চঞ্চলতার থেকে শক্তিই সেখানে প্রকাশ পেত বেশী। তাই গ্রামবাসীদের এই লক্ষণগুলি থেকে যে উপাদান পাওয়া গেল—কল্পনা তাকে গড়ে-পিটে সৃষ্টি করলে হিথক্লিফ, আর্ন-শ, ক্যাথিরিন। এদের সৃষ্টি করে, তিনি বুঝে উঠতে পারেননি—তিনি কি করেছেন, কি গড়েছেন। তাঁর পাণ্ডুলিপি পড়ে যদি কেউ নালিশ করতেন যে, তিনি এমন জীবন্ত ভয়ঙ্করের ছবি এঁকেছেন যা রাত্রের নিদ্রা কেড়ে নেয়, আর দিনের মানসিক শান্তিতে তোলপাড় তোলে—এলিস বেল হয়তো অবাক হয়ে যেতেন। ভাবতেন এর মানে কি, হয়তো বা অভিযোক্তাকে কৃত্রিমতার দায়ে দায়ী করতেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তাঁর মন সতেজ গাছের মতোই বেড়ে উঠতো তার উন্নত মহিমায় আর ঋজুতায়—ডালপালা ছড়িয়ে দিত—তার পরিণত ফলে আসতো সুপক্ক স্নিগ্ধ মাধুর্য আর রোদের ঝলমলানি খেলে যেত; কিন্তু ঐ মনের উপরে সময় আর অভিজ্ঞতাই শুধু ছাপ ফেলতে পারত—অন্যের প্রভাব নৈব নৈব চ।

'ওয়াদারিং হাইটস্'-এর অনেকখানির উপরই মহা অন্ধকার তার পাখা মেলে আছে। তার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিদ্যুৎময় পরিবেশে যেন বিজলির আলো ঝলসে ওঠে, একথা আমি মেনে নিচ্ছি; কিন্তু একথাও বলি, এর এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মেঘাবৃত দিবালোক বা গ্রহণগত সূর্যের আভাসও পাওয়া যায়। সত্যকার সহৃদয়তা এবং সরল বিশ্বস্ততার উদাহরণ হিসেবে নেলি ডীনকেই ধরুন না; আর কোমলতা আর পত্নীব্রতের উদাহরণ তো এডগার লিন্টন। কেউ কেউ আবার হয়তো বলবেন, এই গুণগুলি পুরুষের ভিতরে মূর্ত হয়ে ওঠেনি, যেমন

ওঠে নারীর ভিতরে। কিন্তু এলিস বেলকে কে একথা বোঝাত? তিনি এ অন্যায় অভিযোগ সইতে পারতেন না যে, একনিষ্ঠা, মায়াদয়া, সহনশীলতা এবং কোমলতা ইভকন্যাগণেরই একচেটে, কিন্তু আদমের পুত্রগণের কাছে তাই-ই গুণ হয়েও দোষ। তিনি বলতেন, দয়া, ক্ষমা সেই পরম পুরুষেরই গুণ—তিনি তো নরনারীর স্রষ্টা। যা পরম পুরুষকে মহিমায় সমুজ্জ্বল করে তোলে, দুর্বল মানুষকে তা হেয় করবে কেন! জোসেফের চরিত্রচিত্রনে হাস্যরসও আছে—তবে তা শুষ্ক, একটু বা শয়তানিভরা। ছোট-ক্যাথিরিনের চরিত্র চিত্রনে কিছুটা বা লাবণ্য চলকে পড়ছে, আর উদ্দাম আনন্দের মিশেল। এমন কি ঐ নামধেয়া প্রথমা নায়িকার ও রুক্ষতার ভিতরে অদ্ভুত সৌন্দর্য নেই এমন নয়। ওর ঐ বিকৃত কামনা আর কামনাময় বিকৃতির মধ্যে আছে একাগ্রতা আর নিষ্ঠা।

তবে হিথক্লিফের উদ্ধার অসম্ভব। জাহান্নামের পথে যে সোজা চলেছে, তার থেকে একটু চ্যুতি নেই। যেদিন থেকে এই কালো চুলওলা কালো রঙ ছেলেটা এল, মনে হোল যেন শয়তান থেকে ওর উৎপত্তি—সেইদিন থেকে নেলি ডীন যেদিন ওকে চাঁদোয়া-ঢাকা বিছানায় মৃত দেখতে পেল সেইদিন পর্যন্ত সে এক এবং অভিন্ন। ওর ব্যঙ্গময় চোখ বুজিয়ে দেখার চেষ্টায় ওর উন্মুক্ত অধরের ভিতর দিয়ে শাণিত শাদা দাঁতের ব্যঙ্গময় ঝলক তেমনি অবাহতই রইল।

মানুষের অনুভূতি মাত্র তার একটি। কিন্তু ক্যাথিরিনের প্রতি ভালবাসা তো তা নয়। সে আবেগ তো ভীষণ, অমানুষিক। সে আবেগ কোন্ পাপবুদ্ধির কারখানায় পুটপাকে সৃষ্টি; এতো আবেগ নয়—আগুন। সে তো অন্তরের অন্তঃস্থলে জ্বালাময়ী ক্ষত সৃষ্টি করে, অনির্বাণ অবিরাম ধ্বংসের অনলে জাহান্নামের হুকুম তামিল মনে করে। না ভালবাসা নয়। হিথক্লিফের মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ তার হেয়ারটন আর্ণ-শর প্রতি ব্যবহারে। তাকে সে সর্বস্বান্ত করেছে, তবু তার আছে রুক্ষ সহানুভূতি। আর নেলি ডীনের প্রতি আভাসময় শ্রদ্ধা। এই লক্ষণ দুটি বাদ দিলে, ওকে আমরা বেদিয়া বা জাহাজী লস্করের সন্তানও বলবো না, বলবো মানুষ দেহে দৈত্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে—ও এক প্রেত—এক ইব্লিস।

হিথক্লিফের মতো চরিত্রসৃষ্টি বিধেয় বা সঙ্গত কিনা তা আমি জানি না। (উচিত বলে তো মনে হয় না।) তবে আমি এইটুকু জানি, লেখিকার সৃষ্টি শক্তি আছে, মাঝে মাঝে সেই শক্তির তিনি রাশ টানতে পারেন না। কখনো কখনো সে-শক্তি, অদ্ভুত উদ্ভাবনা করে বসে, নিজের খেয়াল-খুশি মতো কাজ করে। লেখক হয়তো নিয়ম বাতলে দিলেন, আদর্শ ছকে দিলেন, সে-নিয়ম মেনে চললো সেই শক্তি বছরের পর বছর ধরে; তারপর বিদ্রোহের জানান না দিয়ে একদিন এমন হোল যে সে তার আর বাগ মানলে না—উপত্যকায় চাষবাস আর করবে না, জোয়ালে সে আর বাঁধা থাকবে না—সে চালকের তারস্বর চীৎকার না শুনে হেসে উঠল নাগরিকজনের দিকে চেয়ে। সাগরের পারের বালি দিয়ে সে আর খেলাঘর গড়বে না, সে এখন মূর্তি খোদাইয়ের কাজে লেগে যাবে। আর তার এই খেয়াল-খুশিতে আপনারা পাবেন এক একখানি প্লুটো, জোভ, তিসো ফোন বা সাইকি বা জলবালা নয় তো মাতৃমূর্ত্তি। তার নিয়তি বা অনুপ্রেরণা তাকে যে দিকে চালাবে সে তাই করবে। সে সৃষ্টি ভীষণ বা মহান, বা স্বর্গীয় যাই-ই হোক না কেন—আপনাদের তো কোনো উপায় নেই—তাকে নীরবে মেনে নিতে হবে। আর নামে মাত্র শিল্পী তোমার কাজ হচ্ছে যে হুকুম তোমার নিজের নয়, যে হুকুমে কৈফিয়ৎ তলব চলে না সেই হুকুম মেনে কাজ করা। তাকে নিজের খেয়াল খুশি মতো বদলাতে তো পারবে না। যদি ফল আকর্ষণীয় হয়, পৃথিবী তোমাকে তারিফ করবে, অথচ এই প্রশংসার কতটুকুই বা তোমার প্রাপ্য? আর যদি বিরক্তিকর হয়, সেই একই পৃথিবী তোমার নিন্দা করবে, অথচ তুমি তার জন্যে কতটুকুই বা দায়ী?

কারখানায় তৈরী হয়ে ছিল, সাধারণ উপাদানে, সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে 'ওয়াদারিং হাইটস্'; নগণ্য যন্ত্রপাতি আর সরল উপাদানে খোদাই হয়েছিল। যিনি কারিগর তিনি এক নিঃসঙ্গ জলাভূমির ধারে পেয়েছিলেন এক চাঙড় গ্রাণিট পাথর; তার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হোল, এই পাথরের টুকরোখানা থেকে কি করে একখানা মাথা গড়ে তোলা যায়। রুক্ষ হবে সে মাথা, হবে শয়তানী মুখোস আঁটা—কিন্তু আকৃতিতে থাকবে মহিমার একটি উপাদান—সেটি

শক্তি। যেমন তেমন বাটালি নিয়ে তিনি কাজ করতে লেগে গেলেন। মডেল রইল না; শুধু নিজের কল্পনার রূপই তাঁর সম্বল। সময় এবং পরিশ্রম দুয়েরই ব্যয়ে ঐ পাথর মানুষের রূপ পেলে, মূর্তি গড়ে উঠল—বিরাট কৃষ্ণকায়, ভ্রূকুটিময়। অর্ধেক মূর্তি, অর্ধেক পাথর। মূর্তি হিসেবে ভীষণ, শয়তান-মাফিক; আবার পাথর হিসেবে সুন্দর, শ্যাওলায় ঢাকা আর বনবাদাড়ের ঝোপঝাড়ের ফুটন্ত ফুল তার সুগন্ধি নিয়ে সেই দৈত্যের পায়ের কাছে ছড়িয়ে রইল।

—কুরের বেল (শার্লটি ব্রণ্টী)

॥ অনুবাদকের কথা ॥

গ্রন্থকর্ত্রীর ভগিনী কুরের বেল ওরফে শার্লটির ভূমিকার পরে 'ওয়াদারিং হাইটস্' সম্পর্কে কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। এতে তো কৃষ্ণকায় নিগ্রোর গায়ে আরো কালো রং চাপানোই সার হবে। তবে যুগটা বিশ শতক এবং উনিশ শতক বিগত বলেই কিছু বলা প্রয়োজন।

যুগের শর্ত অনুসারে বর্তমান হাওয়া এখন ভিন্নমুখী। 'আর্টের জন্ত আর্ট'এ বুলি আজ বরবাদ হয়ে গেছে। যদি বা থাকে, সেও মাথা চাড়া দিয়ে নেই—লুটিয়ে পড়েছে ধূলায়। শিল্পীর গজদন্তের মিনার বিশ শতকের প্রথমে হেলানো-মিনারে রূপান্তরিত হয়েছিল—এখন তো তা একেবারে ধসে গেছে। এখন বাস্তবতা-কায়েম, ইতিহাসবোধ আর সমাজবোধ সৎ-সাহিত্যের নিশানা। কিন্তু এমিলী ব্রণ্টীকে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তার 'গুণলেশ না পাওবি' গোছের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

ইয়র্কশায়ারের জলাভূমিময় অঞ্চলে তাঁর জন্ম—সেই তাঁর পরিবেশ। তাছাড়া পরিবেশের সঙ্গেও খাপ খাইয়ে নিতে তিনি পারেন নি। তিনি ছিলেন আধুনিক পরিভাষায় 'এস্কেপিস্ট'—বা যাকে বলে জীবন থেকে পলাতকা। তাই মনের কল্পনা তাঁর প্রধান উপজীব্য ছিল, আর জলাভূমি আর অরণ্যের বন্ত রুক্ষ মহিমা মিশিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এই একক উপন্তাস তারই ফল। মানুষ সেখানে আছে—কিন্তু রক্তমাংসের পৃথিবী থেকে তারা কেমন একটু বেতর, বেখাপ্পা। তাদের সংঘর্ষও তাই অতি অস্বাভাবিক। সাহিত্যে এরই নাম রোমান্টিকতা। কিন্তু রোমান্টিকতাই যদি হয়, তাহলে তাও অপূর্বই বলতে হবে। এই অপূর্বতার জন্তেই বিশ শতকের বর্তমান পাদেও এটি বেঁচে আছে—বিশুদ্ধ বাস্তববাদী নাগরিক মনও জুড়ে আছে। এর

জনপ্রিয়তা এখনো অটুট। তাই সুলভ এবং দুর্লভ সংস্করণ এর অগুনতি। এর অনুবাদও তাই।

বাংলা ভাষায় এই বইয়ের এইখানিই সর্বপ্রথম সংস্করণ। এই সংস্করণ সম্বন্ধে তর্জমাকারের বক্তব্য একটু আছে। দীর্ঘ উপন্যাসের কোথাও বা প্রয়োজনবোধে একটু কাটছাঁট করতে হয়েছে, এতে মূলের রস ব্যাহত হয়নি, ক্ষুণ্ণও হয়নি। যাহোক, গৌড়জনের উনিশ শতকের এই বিদেশী মধুচক্রের রস উপভোগ্য হলেই আমার প্রয়াস সার্থক মনে করবো।

অশোক গুহ

॥ রাহুর প্রেম ॥

॥ অশোক গুহ অনূদিত ॥

মা

ঝড়

সিমেণ্ট

দুইধারা

বনেদীঘর

জনক ও জাতক

খুদে খাটালের গলি

রিক্সা ওয়ালা

সাংহাই-এ ঝড়

বিমুগ্ধ আত্মা

ফাঁসির মঞ্চ থেকে

অন্তরতম

অগ্নিগর্ভ

তমসার শেষে

অভিযাত্রী

সূর্যঙ্করা

সহধর্মিণী

শিল্পী

এই সংগ্রামে

অপরাজেয়

সম্ভবনার পথে

হাকেল বেরী ফিন্‌

এক

১৮০১ সাল।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে এইমাত্র ফিরলাম। ইনিই আমার একক প্রতিবেশী—এঁর অত্যাচার হয়তো আমাকে পোয়াতে হবে। অঞ্চলটি সত্যই সুন্দর। আমার তো মনে হয় না, সংসারের গোলমাল থেকে সম্পূর্ণ দূরে এমন আর একটি বাড়ি আমি সারা ইংলণ্ডে খুঁজে পেতাম! দুঃখবাদীর এ এক প্রকৃত স্বর্গ। আমি আর মিঃ হিথক্লিফ জুড়ি মিলেছে ভাল, এই নির্জনতাকে আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে নেব। মানুষটিতো তিনি চমৎকার! ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে হাজির হতেই সন্দেহভরে কালো চোখ দুটিকে ভ্রূর আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন, হাতের আঙুলগুলো এক গুপ্ত অভিসন্ধিতে যে ভাবে কোটের অভ্যন্তরে গিয়ে আশ্রয় নিলে, তাতে মনটা তাঁর উপর সদয় হয়েই উঠলো। কিন্তু কতটুকু তিনি তা টের পেলেন?

শুধালাম, আপনিই মিঃ হিথক্লিফ?

উত্তরে মাথা নড়ে উঠলো।

মশাই আমি আপনার নূতন ভাড়াটে মিঃ লকউড্। পৌঁছেই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। থ্রাসক্রস-এর দখল নিয়ে যে-রকম পেড়াপীড়ি করেছি, আশা করি আপনি তাতে বিরক্ত হননি। কাল শুনলাম, এ সম্পর্কে আপনার নাকি অন্য মতলবই ছিল।

তাঁর মুখে বিকৃতি দেখা দিল, বাধা দিয়ে বললেন, মশাই থ্রাসক্রস-গ্রেঞ্জ আমার নিজের সম্পত্তি। কেউ আমাকে তা নিয়ে অসুবিধেয় ফেলবে, তা হতে দেব কেন—বরং বাধাইতো দেব—আসুন, ভিতরে আসুন!

দাঁতে দাঁত চেপে 'ভিতরে আসুন' কথাটা উচ্চারিত হোল, প্রকাশ পেল তার অন্তরালের ভাব-ব্যঞ্জনা। তার সুস্পষ্ট অর্থ তো 'তুমি নিপাত যাও'! এমন কি যে-ফটকে ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেইখানেও কথার সঙ্গে সঙ্গে দরদের সাড়া পাওয়া গেল না। হয়তো অবস্থা-গতিকেই আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবো বলে ঠিক করলাম; আমার চেয়েও গোপনস্বভাব মানুষটিকে দেখে বুঝি বা একটু মনও টানলো।

আমার ঘোড়াটা ফটক ঠেলছে দেখে তিনি তার লাগাম খুলে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন, তারপরে হঠাৎ আগে আগে এগিয়ে গেলেন উঠোনের ভিতরে। হাঁক পাড়লেন, জোসেফ, মিঃ লকউডের ঘোড়াটাকে নিয়ে যাও, আর আমাদের জন্য কিছু মদ নিয়ে এস!

এই যুগ্ম আদেশ শুনে মনে হোল বোধহয় সর্বসাকুল্যে এইটিই একমাত্র পরিচারক। তাই গাছপালার ভিতরে গজিয়েছে ঘাস, পোষা জন্তুরাই এখন এখানকার একমাত্র মালী।

জোসেফ বয়স্ক মানুষ। বুড়োই বলা যায়, খুব বুড়োই বোধহয়, কিন্তু সবল শিরালো তার শরীর।

আমার ঘোড়ার রাশ খুলে দিতে দিতে চাপা স্বরে সে আপন মনে বলে উঠল, 'ঈশ্বর ভালই করুন!' আমার মুখের দিকে এমন বিরূপ দৃষ্টিতে তাকালে যে, মনে হোল, ওর খাবার হজম হতেও বুঝি ঈশ্বরের দয়ার দরকার। আমার আকস্মিক আগমনেই শুধু এই আজান্ ওর মুখ দিয়ে বেরোয় নি।

মিঃ হিথক্লিফের বাসভবনের নাম ওয়াদারিং হাইটস্। 'ওয়াদারিং' কথাটা আঞ্চলিক বিশেষণ। ঝড়বাদলে এই বাড়িখানির উপর দিয়ে আবহাওয়ার তোলপাড় চলে, নামটা তারই পরিচায়ক। সবসময়েই এখানে প্রাণ-মাতানো বিশুদ্ধ হাওয়া। তাই উত্তুরে এই হাওয়া যে কত প্রবল হয়ে উঠবে তাতো বোঝাই যায়—সে হাওয়া বইবে ঠুঁটো ফার গাছে-ভরা ঢালু জমির উপর দিয়ে, কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে। কাঁটা গাছগুলো যেন একপেশে হয়ে এলিয়ে আছে—সূর্যের কাছে যেন চাইছে ভিক্ষা। এটি সুখের কথা যে,

স্থপতির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল বলে বাড়িখানি মজবুত করেই গড়েছিল। এখানে সরু সরু জানালা, গভীর খাঁজ কেটে বসানো—আশে পাশে পাথর দিয়ে সুরক্ষিত।

উঠোন পার হতে হতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাড়ির সামনে, বিশেষ করে সদর দরজায় অদ্ভুত কারুকৌশলের নিদর্শন। গ্রিফিন (অর্ধ-ঈগল অর্ধ-সিংহ) আর নগ্ননিলাজ শিশুর ভিড়ে হঠাৎ একটা তারিখ চোখে পড়ল। ১৫০০ সাল। আর আছে একটা নাম, হেয়ার্টন আর্ণ-শ। বুঝি বা দু-একটা মন্তব্য করতাম, গম্ভীরমুখ মালিকের কাছ থেকে জায়গাটার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ফরমায়েস করে বসতাম; কিন্তু ফটকে তাঁর ব্যবহারে মনে হোল,···তিনি হয় আমাকে জলদি ভিতরে নিয়ে আসতে চান, নয়তো তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে চান। তাই বাড়ির ভিতরে ঢোকার আগে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে ইচ্ছে হোল না।

এক পা গিয়েই পারিবারিক উপবেশন-কক্ষ। বারান্দা বা পথের ভূমিকা নেই; এইটিই আসল বাড়ি। এর পরে রান্নাঘর, বৈঠকখানা; কিন্তু মনে হয় রান্নাঘরটিকে অন্যখানে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। বহু দূর থেকে বক্‌বকানি কানে এল, আর বাসন-কোসনের ঝনঝনানি। বিরাট অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে তো ভাজা, সেদ্ধ বা সেঁকার চিহ্ন পর্যন্ত নেই; নেই তামার সস্‌প্যানের আর টিনের ঝাঁঝরির ঝক্‌মকানি দেয়ালে; এক প্রান্তে তবু বিরাট সীসে আর টীনে মেশানো বড় বড় থালা থেকে ঠিকরে পড়ছিল আলো আর উষ্ণতা। রূপোর থালা আর পানপাত্র একটা বিরাট ওক কাঠের আলমারিতে থরে থরে সাজানো, আর সেটা গিয়ে ঠেকেছে ছাদ অবধি। চিমনির উপরে রকমারি পুরানো দিনের বন্দুক—ভীষণ-দর্শন তারা। কয়েক জোড়া পিস্তল, আর শোভা হিসেবে রয়েছে তিনটে ঝলমলে রঙের গুলীর বাক্স। মেঝে সাদা মসৃণ পাথরে তৈরী। চেয়ারগুলি উঁচু খাড়াপিঠওয়ালা, আদি যুগের বলেই মনে হয়। সবুজ তাদের রং। ছায়া ঘন কোণে কোণে আবার দু'একখানা কালো চেয়ার উকিঝুঁকি মারছে। আলমারির নীচে আশ্রয় নিয়েছে ঝুলকুসরঙা একটা কুকুর, একপাল তার সন্তান। তারা চীৎকার করছে। অন্যান্য কোণে আছে অন্যান্য কুকুরগুলো।

ঘর আর তার আসবাব পত্রে অসাধারণত্ব নেই। এর মালিক উত্তরের যে-কোন সঙ্গতিপন্ন চাষী হতে পারে। সে ঐ চেয়ারে বসবে, গোল টেবিলের সামনে থাকবে ফেনা-ওঠা মদ। এদের আপনি এই পাহাড় অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালে যে কোন জায়গায়ই নৈশভোজপর্বের পরে দেখতে পাবেন। কিন্তু মিঃ হিথক্লিফ যেন তাঁর বাসস্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণ অমিল, তার জীবনধারার সঙ্গেও। বেদের মতোই রঙে তাঁর লেগেছে ঘোর; পোষাকে আচারে-ব্যবহারে তিনি আবার ভদ্রলোকও বটেন। যে-কোনো প্রাদেশিক জমিদারের মতোই ভদ্র; হয়তো বা একটু অপরিছন্ন; কিন্তু এই অবহেলায়ও বেমানান নন। ঋজু সুন্দর তাঁর দেহ, একটু বা তিনি বিষণ্ণ; হয়তো বা কেউ এতে তাঁর গর্বই টের পাবেন। কিন্তু মনের সহানুভূতির তারে যে ঝঙ্কার উঠলো, সেতো আমাকে জানিয়ে দিলে তাতো নয়।

বুঝতে পারলাম, তিনি নিজের ভাব-ব্যঞ্জনার প্রকাশ চাননা বলেই তাঁর এই গাম্ভীর্য—পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনিময় সম্বন্ধেও তিনি উদগ্রীব নন। অন্তরালে থেকে তিনি সমান ভাবেই ঘৃণা করবেন নয়তো ভালবাসবেন; আবার অন্যে যে তাঁকে ভালবাসবে বা ঘৃণা করবে—এতেও তাঁর সমান ঔদ্ধত্য! না, না আমি একটু তাড়াতাড়ি বলে যাচ্ছি; ওঁরই উপর আমার নিজের বিশেষত্বগুলো বেশি করেই চাপিয়ে বসে আছি। কেউ তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তিনি হয়তো সম্পূর্ণ অন্য কারণেই হাতখানা গুটিয়ে রাখেন—আমার সঙ্কুচিত হবার কারণ থেকে সে হয়তো একেবারেই আলাদা। আমার শরীরের কাঠামোটাই বুঝি একটু অদ্ভুত; মা তো বলতেন, গৃহসুখ কখনো পাব না; এই তো গত গ্রীষ্মেই আমি যে সে ব্যাপারে অনুপযুক্ত তার প্রমাণ দিয়েছি।

সমুদ্রতীরে তখন মাসখানেক ছিলাম। চমৎকার সে আবহাওয়া। একটি সুন্দরীর সঙ্গও পেয়েছিলাম। যতদিন সে আমার দিকে চেয়েও দেখে নি, সে তো ছিল আমার কাছে সত্যকার দেবী। আমি স্পষ্ট করে তাকে কখনো আমার ভালবাসা জানাতে পারিনি; কিন্তু যদি চোখের ভাষা থেকে থাকে, তাহলে অতি বড়মূর্খও বুঝতে পারতো—আমি মজে গেছি। অবশেষে ও বুঝতে

পারলো। দৃষ্টি বিনিময়ে দিলে উত্তর—সে যে কম্নলোকের সবচেয়ে মধুর স্পর্শ। আমি কি করলাম? লজ্জায় বিবশ হয়ে দিলাম স্বীকৃতি। নিজের ভিতরে নিজেকে ঔদাসীন্যে গুটিয়ে নিলাম শামুকের মতো। প্রতি দৃষ্টিতে ঘনিয়ে আসতে লাগলো উদাসীনতা, দূরে সরে সরে গেলাম। শেষে সেই নিষ্পাপ কুমারীর নিজের ইন্দ্রিয়েরই প্রতি এল সংশয়। নিজের হয়তো ভুল হয়েছে এই ভেবে বিব্রত হয়ে তার মাকে পেড়াপীড়ি করে সেখান থেকে চলে গেল। এই ব্যবহারে আমার সুচিন্তিত নির্মমতার খ্যাতি বাড়লো; কিন্তু এ-খ্যাতির যে আমি কত অনুপযুক্ত সে তো আমিই বুঝতে পারছি।

বসে পড়লাম। কুকুরটাকে আদর করবার চেষ্টা করছি। সে তার আশ্রয় ছেড়ে আমার পায়ের কাছে এসেছে, ঠোঁট তার কুঁচকে আছে, সাদা দাঁতগুলি দিয়ে ঝরছে লালা। আমার সোহাগে দীর্ঘ এক গোঙানি বেরিয়ে এল।

একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ হিথক্লিফ, পায়ের লাথি মেরে গোঙানি থামিয়ে দিলেন। বললেন, কুকুর নিয়ে আদর না করাই ভাল। ও আদর পায়নি, ওকে আদর করার জন্য পোযাও হয়নি। তারপর পাশের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার হাঁকলেন—জোসেফ! সেলারের গভীর থেকে এল জোসেফের অস্ফুট স্বর, কিন্তু উঠে আসবার লক্ষণ নেই। মনিব নিজেই নিচে নেমে গেলেন, আমাকে রেখে গেলেন ঐ ভীষণ-দর্শন কুকুরী আর ঝাঁকড়া লোম-ওয়ালা কুকুরের সঙ্গে—তারা আমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীর উপরে পাহারা বসালে। চুপ করে বসে রইলাম, ওদের দাঁতের সংস্পর্শে আসার ইচ্ছে তো নেই। ভাবলাম, ওরা হয়তো ঠাট্টা-তামাসা করলে বুঝবে না, তাই কুকুর তিনটের দিকে তাকিয়ে চোখঠারা আর মুখভঙ্গী শুরু হোল। কিন্তু শ্রীমতী কুকুরী আমার মুখভঙ্গীতেই এমন রেগে উঠলেন যে, তিনি একলাফে আমার হাঁটুর উপরে উঠে এলেন। আমি তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের মাঝখানে টেবিলটা এনে প্রতিরোধ-প্রাকার খাড়া করলাম। এতে গোটা মৌচাকেই সাড়া পড়ে গেল,

আধ ডজন নানা আকারের আর বয়সের চারপাওয়ালা শয়তান অন্তরালের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এল মাঝখানে। অনুভব করলাম, আমার পা আর কোটের লেজটাই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। একটা লাঠি দিয়ে ওদের যথাসম্ভব দূরে তাড়িয়ে দিয়ে আর্তকণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। বাড়ির অধিবাসীদের কছে শান্তি-স্থাপনের দাবী পেশ করা হোল।

বিরক্ত হয়ে সেলারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন মিঃ হিথক্লিফ আর তাঁর অনুচর। স্বাভাবিক গতির চেয়ে জোরে এলেন বলে মনে হোল না—এদিকে এখানে তো উদ্বেগ আর চীৎকারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভাগ্য ভাল, রান্নাঘরের এক বাসিন্দে তাড়াতাড়িই এল। স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি, গাউন তার গুটানো, নগ্ন বাহুদুখানি, আর অগ্নি-আরক্ত তার মুখ। সে একখানা খন্তি ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে এল, আর সেই খন্তিখানা আর জিভ হোল তার অস্ত্র। এক নিমেষে যেন ভোজবাজিতে ঝড় থেমে গেল। এবার এসে ঢুকলেন মনিবটি।

ব্যাপার কি? আমার দিকে তাকিয়ে শুধালেন। আতিথ্যের এই অপমানের পর আমার আর সহ্য হোল না।

হাঁ, ব্যাপার কি-ই বটে! বিড়বিড় করে বললাম, আপনার এই জানোয়ার-গুলোর মতো সাংঘাতিক বুঝি পাগলা শুয়োরও নয়। আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই, একজন অচেনা মানুষকে একপাল ক্ষুদে বাঘের পাল্লায় ফেলে রেখে গেছলেন!

যিনি কিছু ধরেন না, তাঁকে ওরা কিছু বলে না, তিনি স্থানচ্যুত টেবিলটা টেনে এনে, আমার সামনে বোতলটি রেখে মন্তব্য করলেন। আর কুকুরগুলোর তো সজাগ থাকার অধিকার আছে। আসুন, এক গেলাস ইচ্ছে করুন!

না, ধন্যবাদ।

আপনাকে কামড়ায়নি তো?

কামড়ালে যে কামড়েছে সে কি অক্ষত থাকতো?

হিথক্লিফের মুখখানায় হাসি খেলে গেল। আসুন, আসুন! আপনি নাজেহাবুদ হয়ে পড়েছেন। একটু মদ খান। এখানে অতিথি বড় কম

আসেন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমি আর আমার কুকুরগুলো ঠিক তাঁদের অভ্যর্থনা করতে জানি না। মশাই, আপনার স্বাস্থ্য-পান করছি।

আমি নুয়ে পড়ে পাল্টা স্বাস্থ্য-পান করলাম। একপাল কুকুরের ব্যবহারে রাগ করা মূর্খতা। তাছাড়া লোকটা আমারই দৌলতে আরো আমোদ পাবে, এটা বরদাস্ত করতেও রাজি নই। এখন তো ঠাট্টা-তামাসার ঐ দিকেই মোড় ঘুরেছে। একজন ভাল ভাড়াটেকে তিনিও বোধহয় ঘাটাতে চাইলেন না, সর্বনাম আর ক্রিয়াগুলোকে টুকরো-করা থেকে ক্ষান্ত হলেন। এবার আমার এই অবসর যাপনের স্থানের সুবিধে-অসুবিধের কথাই পেড়ে বসলেন। এ সম্বন্ধে তাঁকে বেশ ওয়াকিবহাল বলেই মনে হোল। তাই বাড়ি ফেরবার আগে উৎসাহিত হয়ে আগামীকাল আসার স্বেচ্ছাকৃত স্বীকৃতিও দিয়ে ফেললাম। কিন্তু আমার এই অনধিকার আগমনের পুনরাবৃত্তি তিনি নিশ্চয়ই পছন্দ করেন নি। তবু আমি কাল যাব। ওঁর তুলনায় নিজেকে অনেকখানি সামাজিক মনে হতে অবাক হয়ে গেছি।

দুই

গতকাল ছিল কুয়াশাময় আর ঠাণ্ডা বিকেল। আমার বসার ঘরে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বিকেলটা কাটিয়ে দেব বলে একরকম ঠিক করে ফেলেছিলাম। ঐ মাঠ আর কাদা ভেঙে কে যাবে ওয়াদারিং হাইটস্-এ? কিন্তু পরে (বারোটা থেকে একটার ভিতরে আমি নৈশভোজন শেষ করে থাকি। আমার গৃহের পরিচারিকা বয়স্কা, বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তাকেও আমি গ্রহণ করেছি। সে তো ভাবতেই পারে নি যে আমি পাঁচটার সময় খেতে চাইব) সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে ঘরে এসে দেখি একটি পরিচারিকা তার কোলে বসে আছে। ঝাড় আর কয়লার ঝুড়িগুলি এখানে ওখানে ছড়ানো; আর ছাই চাপা দিয়ে আগুন নেবাতে গিয়ে ছাইময় হয়ে গেছে সারা ঘর। এই দৃশ্য দেখে তখনি চলে এলাম। টুপিটা নিয়ে চার মাইল পথ হেঁটে হিথক্লিফের বাগানের ফটকে গিয়ে হাজির

হলাম। সময় মতোই এলাম। তুষারপাত শুরু হয়ে গেল, পড়তে লাগলো প্রথম বর্ষণের পাখীর পালকের মতো তুষার।

ঐ নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় মাটি তখন কালো তুষারে জমাট বেঁধে গেছে, বাতাসে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফটকের শিকলটা খোলা গেল না, তাই ফিরে না গিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেলাম, তারপর এখানে-ওখানে ঝোপ পেরিয়ে ছুটে চললাম। ঢোকার জন্যে ধাক্কা মারা শুরু হোল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আমার হাতে ব্যথা ধরে গেল, কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ শুরু করলে।

মনে মনে বললাম, ওরে হতভাগ্য বাসিন্দের দল, অতিথির উপর অভদ্রতা করিস বলে নিজেদের জাত থেকে চিরতরে তোদের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই তো উচিত। আমি তো কখনো আমার বাড়ির দরজা দিনের বেলা বন্ধ করে রাখতাম না। যাক, আমি বন্ধ দরজা তুচ্ছ করেই যাব—ভিতরে ঢুকবো! এই ঠিক করে কড়াটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলাম। খামারবাড়ির জানালা থেকে জোসেফ তার মুখ বার করলে।

কি জন্যে এসেছেন আপনি, সে চেঁচিয়ে উঠলো, মনিব এখন খোঁয়াড় দেখতে গেছে। যদি কথা বলতে চাও তো চলে যান।

আমি জবাব দিলাম, ভিতরে কি দরজা খোলবার কেউ নেই?

আছে, ঠাকরুণ আছেন, কিন্তু তিনি তো খুলবে না। আপনি যত ইচ্ছে চেঁচাও না!

কেন? আমি কে সেকথা ওঁকে বললে হয় না জোসেফ?

না, না, আমি পারবো নি। আমি জানি নি বাপু! মুখখানা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুষারপাত প্রবল হয়ে উঠলো। আমি হাতল ধরে আর একবার চেষ্টা করলাম। এমনি সময়ে একটি যুবক এল, গায়ে তার কোট নেই, কাঁধে একখানা কাস্তে, উঠানের পিছনে এসে সে হাজির হোল। সে আমাকে অনুসরণ করতে বলে এগিয়ে চললো। ধোবিখানা, বাঁধানো কয়লা রাখার জায়গা, পাম্প, পায়রার খোপ ছাড়িয়ে অবশেষে আমরা এলাম এক মস্ত বাড়িতে।

উষ্ণ আরামদায়ক সে পরিবেশ, এইখানেই সেদিন আমি এসেছিলাম। এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডে আগুন ঝ[illegible]করছে, টেবিলে সান্ধ্যভোজের প্রচুর আয়োজন, আর তারই কাছে গৃহকর্ত্রীকে দেখে খুশী হলাম। ওঁর অস্তিত্বতো আমি কখনো সন্দেহও করিনি। আমি অভিবাদন করে প্রতীক্ষায় রইলাম, মনে আশা উনি আমাকে বসতে বলবেন। তিনি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু এখন তো স্থির, মূক তিনি।

উঃ কি দিন! বললাম, শ্রীমতী হিথক্লিফ আমার তো ভয় হয়, আপনার পরিচারকদের কুড়েমিতেই দরজার উপর যথেষ্ট ধকল গেছে। ওরা যাতে শুনতে পায় তার জন্যে আমি প্রাণান্ত চেষ্টা করেছি।

তিনি মুখ খুললেন না। আমি তাকালাম—তিনিও। নিস্পৃহ সে-দৃষ্টি, সৌজন্য নেই। বড় বিব্রত হলাম, বিসদৃশ লাগলো।

বসুন, যুবকটির রুক্ষ স্বর শোনা গেল, কর্তা এখুনি আসবেন।

বসলাম ; ইতস্তত করেই সেই শয়তান জুনোটাকে ডাকলাম। এই দ্বিতীয় সাক্ষাতে সে একটু বা খুশিই হোল। পরিচয়ের অভিজ্ঞান হিসেবে সে লেজের ডগা নাড়তে লাগলো

আবার মন্তব্য করলাম, সুন্দর—কুকুরটি! আপনি কি ওর একটি বাচ্চা দিতে পারেন?

ওগুলো তো আমার নয়, গৃহিণী আস্তে আস্তে বললেন। কিন্তু এমন ভাবে হয়তো হিথক্লিফও কাউকে প্রত্যাখ্যান করতেন না।

আপনার বুঝি এইগুলিই প্রিয়? একটা জায়গা দেখিয়ে দিলাম, সেখানে বুঝি বেড়ালই ছিল।

হাঁ প্রিয় হিসেবে ওগুলো তো সেরা। তিনি বিদ্রূপভরেই বলে উঠলেন।

দুর্ভাগ্য আমার, সেগুলি ছিল মৃত খরগোসের স্তূপ। আমি আবার আগুনের কুণ্ডের কাছে এগিয়ে এলাম, আজকের সন্ধ্যার এই দুর্যোগের কথাটা পেড়ে বললাম।

আপনার বেরোনো উচিত হয়নি, তিনি উঠে পড়লেন, চিত্র-বিচিত্র পাত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আগে তিনি ছিলেন আলো থেকে দূরে, এখন আমি তাঁর সমগ্র দেহটি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আর তাঁর মুখখানা। তিনি তন্বী, মনে হয় এখনো কৈশোরের লীলা সাঙ্গ হয়নি—সুন্দর দেহ তাঁর, মুখখানি তো অতি সুন্দর—অমন মুখতো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। অঙ্গ-সৌষ্ঠব সুন্দর, সুন্দরী তিনি; কণ্ঠদেশের পেলবতায় দোদুল্যমান স্বর্ণহার; চোখের দৃষ্টি যদি কমনীয় হোত, সে তো হোত দুর্নিবার। আমার সৌভাগ্য যে, আমার কোমল হৃদয়ে সে শুধু একই ভাবাবেগ জাগিয়ে তুললে—সে তো বিদ্রূপ আর হতাশাময়—অথচ এ দৃষ্টি তো ওই প্রসন্ন দুই চোখে অস্বাভাবিক বলেই মনে হবে। টিনগুলি ওঁর নাগালের বাইরে, তাই ওঁকে সাহায্য করতে গেলাম। কৃপণ যেমন তাঁর সঞ্চিত মুদ্রা গণনায় কেউ সাহায্য করতে গেলে আঁতকে ওঠে তেমনি তিনিও আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

বাধা দিয়ে বললেন, আপনার সাহায্য আমি চাইনি। নিজেই আমি নিতে পারব।

তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, মাপ চাইছি।

আপনাকে কি চায়ে ডাকা হয়েছে? তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দর কালো পোষাকটির উপর একখানি ঝাড়ন বেঁধে এক চামচে চা পাত্রের উপর রেখে জিজ্ঞেস করলেন।

পেলে খুশিই হতাম, উত্তর দিলাম।

আপনাকে ডাকা হয়েছে কিনা বলুন? তিনি আবার আওড়ালেন কথাটা।

না, একটু হেসেই বললাম, চায়ে ডাকবেন তো আপনি।

তিনি চা, চামচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। কপালে তাঁর কুঞ্চন দেখা দিয়েছে, তার নীচে লাল ঠোঁট বেরিয়ে আছে, যেন শিশু তিনি, কাঁদবার উপক্রম করছেন।

এরই মধ্যে যুবকটি একটি নোংরা জোব্বা গায়ে চাপিয়ে অগ্নিকুণ্ডের আগুনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ট্যারচা চোখে আমার দিকে তাকালে, যেন

হোল আমাদের মধ্যে যেন এক ভয়ংকর বিবাদ উপস্থিত। ও পরিচারক, না আর কেউ এ সম্পর্কে সন্দেহ হোল। ওর বেশভূষা, আচার-ব্যবহার অভদ্র, তাতে শ্রীযুক্ত আর শ্রীমতীর আভিজাত্য নেই। ওর ঘন ধূসর কোঁকড়া চুল রুক্ষ, বিন্যাসের সুরুচি সেখানে নেই, ওর দাড়ি খোঁচা-খোঁচা গজিয়ে উঠেছে গালে, সাধারণ শ্রমিকেরই মতো—কিন্তু তবু ও সহজ, স্বচ্ছন্দ, বুঝি বা উদ্ধত। গৃহকর্ত্রীর সুমুখে ও কোন বাধ্যতার পরিচয় দেয় নি। ওর পদমর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেলাম না বলে ওর এই অদ্ভুত ব্যবহার উপেক্ষা করতেই চেষ্টা করলাম। পাঁচ মিনিট পরে হিথক্লিফ এসে আমাকে এই অবস্থা থেকে কিছুটা বা উদ্ধার করলেন।

খুশি হবার ভান করে বললাম, কথামত আমি এসেছি। আর মনে হয় আধঘণ্টাখানেক দুর্যোগের জন্য আটক থাকতে হবে—আপনি আমাকে আশ্রয় দিলে বাধিতই হব।

আধ-ঘণ্টা? পোষাক থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললেন, আপনি যে কি করে এই তুষারপাতের ভিতর বাইরে বেরুলেন, তাই ভাবছি। আপনি কি জানেন, জলার ভিতরে পথ হারিয়ে ফেলতে পারতেন? যাদের পথঘাট চেনা তারাই এমন সন্ধ্যায় পথ হারায়; আর এখনি এই দুর্যোগ যে কেটে যাবে না একথা আমি আপনাকে বলতে পারি।

আপনার একটা ছোকরাকে আমার সঙ্গে দিতে পারেন তো? সে না হয় রাতটা থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জেই কাটাবে?

না, তা সম্ভব হবে না।

তাই না কি! তাহলে আমাকে নিজের উপরই নির্ভর করতে হবে।

নোংরা জোব্বা-পরা ছোকরাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, কি চা-টা করবে নাকি? তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার উপর থেকে সরে গেল। এখন যুবতীর দিকেই নিবদ্ধ।

উনি কি চা খাবেন? হিথক্লিফকে তিনি শুধালেন।

তৈরী করবে কি না বল? এমন বর্বরের মতো কথাটা উচ্চারিত হোল, আমি তো চমকে গেলাম। স্বর তো মন্দ প্রকৃতিরই পরিচারক। তাঁকে

আর চমৎকার মানুষ বলে ভাবতে পারলাম না। চা তৈরী হতে, তিনি আমাকে ডাকলেন—এবার চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে আসুন! আমরা সবাই টেবিলের চারধারে এসে বসলাম, সেই যুবকটিও বাদ পড়লো না। এক থমথমে নীরবতা তখন জুড়ে বসেছে ঘরে।

মনে হোল, মেঘ যদি আমারই সৃষ্টি হয়ে থাকে, মেঘমুক্তি আমারই কর্তব্য। এমন গোমরা মুখে ওঁরা নিশ্চয়ই খাবার টেবিলে এসে রোজ বসেন না। যতই বদমেজাজী হোন এই যে সর্বময় ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে, এতো ওদের প্রাত্যহিক রূপ নয়।

দুপেয়ালা চা-পানের বিরতির মাঝখানে শুরু করলাম, এ কিন্তু বড় অদ্ভুত যে, চিরাচরিত প্রথা আমাদের আচার-ব্যবহার, ভাবধারাকে এক আলাদা ছাঁচে ঢালাই করে দেয়। মিঃ হিথক্লিফ, আপনার মতো এমন নির্বাসনে কাটিয়ে কেউ যে সুখী হতে পারে একথা বহু লোকই ধারণা করতে পারবে না। কিন্তু আমি নির্ভয়ে একথা বলতে পারি যে, এমন নম্র শান্ত মহিলা যেখানে আপনার গৃহের আর অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে আছেন, সেখানে……

আমার গৃহের অধিষ্ঠাত্রী—তিনি বাধা দিলেন, মুখে শয়তানি বিদ্রূপ ঝলসে উঠলো। কোথায় আমার সেই নম্র শান্ত মহিলা…

আপনার স্ত্রী মিসেস হিথক্লিফের কথাই আমি বলছি।

ওঃ—হাঁ, আপনি হয়তো বলছেন যে তাঁর আত্মা নিয়েছে সে স্থান—দেহ তাঁর মিলিয়ে গেলেও তিনি ওয়াদারিং হাইটস্‌কে রক্ষা করছেন। তাই কি?

ভুল হয়েছে বুঝলাম, সংশোধনের চেষ্টাও করলাম। ওঁদের বয়সের তারতম্য দেখেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে, ওরা স্বামী-স্ত্রী হতে পারেন না। এক জনের বয়স চল্লিশ হয়েছে ; এ এমন এক বয়েস, যখন আর ভালবেসে বিয়ে করবার মোহ মানুষের খুব কমই থাকে ; সে-স্বপ্ন মুলতুবী থাকে অন্তিমের দিনগুলির জন্যে। আর অপরাকে তো সপ্তদশী বলেও মনে হয় না।

হঠাৎ আমার মনে ঝলক দিয়ে গেল, ঐযে আমার পাশে ভাঁড়টা বসে, পাত্র থেকে চা গিলছে, রুটি খাচ্ছে আ-ধোয়া হাতে, ঐ লোকটাই

হয়তো ওঁর স্বামী। অবশ্যই ও ছোট হিথক্লিফ। এই তো জীবন্ত সমাধি। এখানে ঐ অপদার্থ গোঁয়ারটার চেয়ে সরেস কোনো জীব নেই বলেই ওঁর এই আত্মোৎসর্গ। আহা—ওঁর এই নির্বাচন নিয়ে দুঃখ তো আমারই সৃষ্টি। হয়তো এ আমার গর্ব, না, গর্ব নয়-সত্য। আমার পাশের এই লোকটি তো বিতৃষ্ণাই জাগায়; আর আমি যে মোটামুটি সুশ্রী এ অভিজ্ঞতা আমার আছে।

আমার অনুমানকে সমর্থন করে মিঃ হিথক্লিফ জানালেন, মিসেস হিথক্লিফ আমার পুত্রবধূ। বলতে বলতে ওঁর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। ঘৃণাব্যঞ্জক এ দৃষ্টি—মুখের পেশী তো আত্মার ভাষার ব্যাখ্যা করে, অবশ্য ওঁর মুখের পেশী যদি সেদিক থেকে অদ্ভুত কিছু হয় তো জানি না।

ওঃ আপনি তাহলে ওঁর ভাগ্যবান স্বামী—আমি আমার প্রতিবেশীর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলাম।

আগের চেয়েও খারাপ অবস্থা। যুবকটি আরক্ত হয়ে উঠলো, হাত তার মুষ্টিবদ্ধ, বুঝিবা আসন্ন আক্রমণে উদ্যত। কিন্তু নিজেকে সে দমন করলে, ঝড়ের আবেগ সংক্ষুব্ধ হয়ে উৎসারিত হোল এক বর্বর কটুক্তিতে। আমারই উপরই তা বর্ষিত গেল। আমি অবশ্য ভ্রূক্ষেপ করলাম না।

মশাই, আপনার অনুমান ভুল, গৃহকর্তা মন্তব্য করলেন, আপনার এই দেবীর মালিকানার ভাগ্য আমাদের কারোই হয় নি। ওঁর সাথীটি মারা গেছে। আগেই বলেছি, উনি আমার পুত্রবধূ, আমার ছেলের সঙ্গেই ওঁর বিয়ে হয়েছিল।

তবে এই ছেলেটি—

আমার ছেলে নিশ্চয়ই নয়।

হিথক্লিফ আবার হাসলেন, এই ভালুকের মতো ছোকরার পিতৃত্ব তাঁকে আরোপ করে যেন বড় ঠাট্টাই করা হয়েছে।

এবার যুবকটি গর্জে উঠলো, আমার নাম হেয়ারটন আর্ণ-শ। এই নামটাকে আপনি শ্রদ্ধা করে চলবেন এই পরামর্শই আমি আপনাকে দিচ্ছি।

আমি তো অশ্রদ্ধা করিনি, উত্তর দিলাম। নাম উচ্চারণে যে মর্যাদা প্রকাশ পেল, তাতে মনে মনে হাসলাম।

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমি ভ্রূক্ষেপও করলাম না। আমার ভয় হচ্ছিল, পাছে ওর কানে একটা ঘুসি মেরে বসি বা আমার হাসির কারণটা প্রকাশ করেই দিই। এই পারিবারিক বৃত্তে নিজেকে বেমানান বলেই মনে হোল। পরিবেশের বিষণ্ণতা এখন অপসৃত, সহজ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আমার চারদিকে এখন জীবন্ত পরিতৃপ্ত মানুষ। ভাবলাম, তৃতীয়বার যদি এখানে আসতে হয়, আমি বেশ সাবধান হয়েই আসবো।

খাওয়া শেষ হোল, কেউ একটু আলাপও করলেন না। বাইরের আবহাওয়া দেখবার জন্যে জানালার কাছে এলাম। সে-এক ভয়াবহ দৃশ্য! অন্ধ রাত অকালে নেমে এসেছে, আকাশ আর পাহাড় যেন হাওয়ার এক ভয়াল ঘূর্ণি আর শ্বাসরোধী তুষারে একাকার হয়ে গেছে।

পথ চিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক না পেলে আমার তো বাড়ি ফেরাই সম্ভব হবে না। না বলে পারলাম না একথা, পথ বোধহয় এরই মধ্যে, বরফে ঢেকে গেছে, যদি না গিয়ে থাকে, তাহলেও এক পা এগুনো যাবে না।

হিথক্লিফ বললেন, হেয়ারটন, ভেড়াগুলোকে খামার-বাড়ির বারান্দায় নিয়ে গিয়ে রাখো, সারারাত খোঁয়াড়ে থাকলে ওরা তো বরফে চাপা পড়ে যাবে, একটা তক্তা দিয়ে আড়াল করে রেখো।

বিরক্ত হয়ে বললাম, আমি এখন কি করি!

আমার প্রশ্নের জবাব এল না; চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, জোসেফ কুকুরগুলোর জন্যে একপাত্র জাউ নিয়ে আসছে, শ্রীমতী হিথক্লিফ আগুনের কুণ্ডের উপর ঝুঁকে পড়ে এক আঁটি পোড়া দেশলাই নিয়ে মেতে আছেন। চায়ের পাত্রটা রাখতে গিয়েই হয়তো ওগুলো পড়ে গিয়েছিল। জোসেফ পাত্রটা নামিয়ে রেখে ঘরের সবাইকে দেখে নিলে, এবার সে ভাঙা স্বরে বলে উঠলো, বাপু, কি করে তুমি ঠুঁটোটি হয়ে বসে আছ, যখন সবাই

ছুটোছুটি করছে। তা বলে কি হবে বাপু—তোমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না। তোর মার মতো তুই গোল্লায় যাবি!—শয়তানে তোকে ধরবে!

এমন বক্তৃতাটা আমার উদ্দেশ্যেই নিক্ষিপ্ত হোল বলে প্রথম মনে হয়েছিল, তাই বেশ রেগেই ঐ পাজীর ধাড়িটার দিকে এগিয়ে এলাম, ওকে লাথি মেরে বার করেই দেব। শ্রীমতী হিথক্লিক আমাকে বাধা দিলেন, তাঁর উত্তরেই বাধা পেলাম।

ওরে পাজী বুড়ো, তিনি বললেন, তোমার কি উপিয়ে যাবার ভয় নেই যে শয়তানের নাম করছ? দেখ, আমাকে জ্বালিও না, তাহলে শয়তানকে তোমাকে উপিয়ে নিয়ে যেতেই বলব। থাম, এদিকে তাকাও তো জোসেফ! তিনি একখানা কালো মোটা বই তাক থেকে পেড়ে নিলেন। আমার যাদুবিদ্যার দৌড়টা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। শীগ্‌গীরই বাড়িখানাই বদলে যাবে। ঐ রাঙা গরুটা আর সেদিন দৈবাৎ মরেনি, আর তোমার গাঁটে গাঁটে বাতও হঠাৎ ধরে নি।

জোসেফ ভয়ে শিউরে উঠে বললো, ভগবান, শয়তান থেকে বাঁচাও গো!

ওরে হতভাগ্য লক্ষীছাড়া—দূর হ, নইলে আমি সত্যই ক্ষতি করবো। কাদামাটি দিয়ে তোর ছাঁচ গড়বো—দেখবি—তারপর কি করি? যা দূর হয়ে যা!

খুদে ডাইনীর সুন্দর চোখে বিরূপতা—এ তো সত্য নয়, ভান, তবু জোসেফ সত্যকার ভয়ে ভীত। কাঁপতে কাঁপতে সে বেরিয়ে গেল। মনে হোল, নির্মম আনন্দজাত ওঁর এই আচরণ। এবার ওঁকে একা পেয়ে আমার দুর্দশার কথাটা জানাতে চেষ্টা করলাম। অধীর হয়েই বললাম, মিসেস হিথক্লিফ, আপনাকে বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা করবেন। আপনার ঐ মুখখানা দেখে মনে হয় আপনার মনটি ভাল না হয়েই যায় না। যাতে চিনে বাড়ি ফিরতে পারি এমন ক'টা হদিস বাত্‌লে দিন না! লণ্ডনে যাবার পথ সম্বন্ধে আপনার যতটুকু জ্ঞান, বাড়ির পথ সম্পর্কে আমার জ্ঞান তার চেয়ে বেশি হবে না!

চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আছেন, জলছে মোম, ই সামনে সেমোটা বইখানি খোলা। তিনি তেমনি বসে থেকেই জবাব দিলেন, যে পথে এসেছিলেন, সেই পথেই ফিরে যান। এর থেকে ভাল পরামর্শ আমি জানি না।

তার পরে যদি একথা শুনতে পান বরফভরা জলা কি গর্তে আমার লাস পাওয়া গেছে, তখন কি আপনার বিবেক ফিসফিস করে বলবে না যে, আপনিই এর জন্যে কিছুটা দায়ী?

তা কেন হবে? আমি তো আপনাকে পথে দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারব না, ওরা তো আমাকে ঐ বাগানের দেয়ালের সীমানা অবধিও যেতে দেবেনা!

চেঁচিয়ে উঠলাম, আপনি! এমনি রাতে আমার শত সুবিধে হলেও আপনাকে উঠোন পেরোতেই বা বলবো কেন? আমাকে পথটা বাত্‌লে দিন, পথ দেখাবার কথা তো বলিনি; না হয় তো মিঃ হিথক্লিফকে ধরে একজন লোক যোগাড় করে দিন।

তিনি নিজে আছেন, আর আছি আমি, আর্ণ-শ, জিল্লা আর জোসেফ। কাকে চাই আপনার?

খামারবাড়িতে ছোকরা চাকর-বাকর কেউ নেই?

না, আমরা সবশুদ্ধ এই ক'জনই আছি।

তার মানে, আমাকে এখানে থেকে যেতে হবে।

সে আপনি বাড়ির কর্তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিন, আমি কিছু জানিনে।

এমন সময় রান্নাঘরের দোর-গোড়া থেকে হিথক্লিফের ক্রুদ্ধ স্বর ভেসে এল, আশা করি আর কখনও পাহাড় অঞ্চলে এমন নির্বোধের মতো বেড়াতে বেরবেন না। সেদিক থেকে এ আপনার এক শিক্ষা হোল। আর এখানে থাকার ব্যবস্থা? অতিথিদের থাকার মতো এখানে ঘর নেই; থাকতে হলে, হয় হেয়ারটন, নয় তো জোসেফের সঙ্গে এক বিছানায় আপনাকে শুতে হবে।

বললাম, এই ঘরে একটা চেয়ারে শুয়েই তো আমি ঘুমতে পারি।

না, না। গরীব হোক বড় মানুষ হোক, অচেনা লোক তো অচেনাই। আমি যখন অসতর্ক থাকবো তখন কাউকে এখানে ঘুমতে দিতে পারবনা। অভদ্র লোকটা বলে বসলো।

অপমানে আরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। কথায়ও প্রকাশ পেল বিরক্তি। ওঁকে ঠেলে উঠানে চলে এলাম, আর তাড়াতাড়িতে আর্ণ-শর গায়ে ধাক্কাই লাগলো। অন্ধকার। বেরুবার পথ খুঁজে পেলাম না। ঘুরে মরছি, এমন সময় ভদ্র ব্যবহারের আর একটি দৃষ্টান্ত পেলাম ওদের আলাপে। প্রথমে ছোকরাটি আমার উপর যেন সদয় হয়ে বললে, পার্ক অবধি ওঁর সঙ্গে আমি যাব।

ওর সঙ্গে গোল্লায় যাও না কেন! মনিব চেঁচিয়ে উঠলেন। হয়তো তিনি মনিব নন, ওর আত্মীয়ই হবেন। তাহলে ঘোড়াগুলোর খবরদারি কে করবে?

একরাত ঘোড়াগুলোর সেবা না করলেও চলবে, একটা মানুষের জীবনের তার চেয়ে ঢের বেশি দাম। কারও যাওয়াই উচিত। শ্রীমতী হিথক্লিফ অস্ফুট স্বরে বললেন। তিনি যে এত প্রসন্ন হবেন ভাবতে পারিনি।

তোমার হুকুমে নাকি! হেয়ারটন বিদ্রূপ করে উঠলো। ওর যদি তোমার কাছে এত দাম, চুপ করে থাক না।

তীক্ষ্নস্বরে উত্তর এল, ওর ভূতটা এসে তোমাদের কাঁধে চাপবে আর যতদিন না থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জ চুরমার হয়ে যায়, ততদিন মিঃ হিথক্লিফেরও আর ভাড়াটে জুটবে না!

শোন একবার, ও শাপমন্যি দিচ্ছেগো! জোসেফ অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো। ওর দিকেই আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

একটা লণ্ঠনের আলোয় কিছু দূরে সে গরু দোহাচ্ছিল। কোন ভূমিকা না করে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে হাঁক পেড়ে বললাম, কাল এটা পাঠিয়ে দেব। তারপর ছুটলাম দরজার দিকে।

মালিক, মালিক, ও লম্পোটা চুরি করে যে পেলালো গো! বুড়ো আমার পিছনে ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে লাগল। ওরে নাসার, ওরে হে, ওরে নেকড়ে, ছুটে আয়—লে-লে-লে! দরজাটা সবে খুলেছি, এমন সময় ছুটো

লোমশ দৈত্য এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, পেড়েও ফেললে মাটিতে। আলোটা গেল নিবে। হিথক্লিফ আর হেয়ারটনের মিশ্র অট্টহাসি আমার লাঞ্ছনা আর ক্রোধ বাড়িয়ে দিলে। এও বরাত ভাল যে, পশুগুলির জ্যান্ত টুকরো টুকরো করে ফেলার ইচ্ছে ছিলনা, ওরা থাবা বাড়িয়ে হাই তুলতে শুরু করলে, লেজ দোলাতে লাগলো। কিন্তু আমি যে উঠে পড়ব তা তো দেবে না। বাধ্য হয়ে শুয়েই রইলাম, ওদের মনিব এসে আমাকে উদ্ধার করলেন। টুপী মাথায় নেই, সারা শরীর কাঁপছে রাগে, এই দুষ্কৃতকারীদের এবার আমাকে বাইরে নিয়ে যাবার হুকুমই দিলাম—অসংলগ্ন শাসানি উঠলো আমার মুখ থেকে—তাদের প্রচণ্ডতায় যেন রাজা লিয়রের অক্ষম হুঙ্কারই প্রকাশ পেল।

আমার এই থরোথরো আবেগে নাক দিয়ে ঝরতে লাগলো রক্ত, কিন্তু তখন হিথক্লিফ হাসছে, আমারও গালাগালের পালা চলতে লাগলো। কোথায় যে এ দৃশ্য গিয়ে সমাপ্ত হোত জানিনা, আমার চেয়ে বিবেচক আর আমার গৃহস্বামীর চেয়ে সহৃদয় একজন মানুষ কাছে ছিল বলেই রক্ষে। সে জিল্লা, বাড়ির পরিচারিকা ; সে গোলমাল শুনে বেরিয়ে গেল। ভেবেছিল, ওরা হয়তো আমার উপর অত্যাচারই শুরু করেছে। মনিবকে আক্রমণ করবার সাহস তার ছিলনা। তাই সে তার কণ্ঠের কামান ঐ ছোকরাটার দিকেই ঘুরিয়ে দিলে।

সে চেঁচিয়ে উঠলো, ওগো আর্ণ-শ, আপনি এর পরে কি করবে তাই ভাবছি। আমাদের দরজায় কি খুন হবে নাকি গো ? না, এবাড়িতে বাপু আমার আর পোষাবে না···দেখ তো, বাছার দিকে তাকিয়ে দেখতো···ওর তো দম বন্ধ হয়ে এল বলে ! আহা-হা ! অমনি ভাবে চলে যাবেন না ! আসুন, ভিতরে আসুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তোমরা বাপু, আবার কিছু করে বোসোনা !

এই বলেই সে হঠাৎ আমার গলায় এক পাত্র বরফের মতো ঠাণ্ডা জল এনে ঢেলে দিলে, তারপর টেনে নিয়ে গেল রান্নাঘরে। মিঃ হিথক্লিফ পিছনে

পিছনে এলেন। তাঁর আকস্মিক আনন্দ নিবে গেছে, আবার ফিরে এসেছে চিরাভ্যস্ত বিষণ্ণতা!

আমি অসুস্থ, মাথা ঘুরছে, মূর্চ্ছাই বুঝি যাব, তাই ওঁরই ছাদের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। উনি জিল্লাকে এক গেলাস ব্র্যাণ্ডি আমাকে এনে দিতে হুকুম দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। এদিকে জিল্লা আমার দুর্দশা দেখে সান্ত্বনা দিলে, মনিবের হুকুমও সে তামিল করলে। খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, এবার সে আমাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

তিন

সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে-যেতে সে বললে, আমি যেন মোমবাতিটা লুকিয়ে রাখি, আর টুঁ শব্দটিও যেন না করি। ঘরখানা সম্পর্কে মনিবের এক অদ্ভুত ধারণা, কাউকে সেখানে তিনি থাকতে দেন না। কারণটা জিজ্ঞেস করলাম। সে বললে, জানে না; বছর-খানেক কি বছর-দুই হোল এখানে আছে। ওদের যা সব ব্যাপার, কৌতূহল না জেগে তো উপায় নেই।

আমি তখন এতই হতবুদ্ধি হয়ে গেছি যে, আমার কৌতূহলও জাগলো না। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানাটা খুঁজতে লাগলাম। ঘরে আসবাবের মধ্যে একখানা চেয়ার, একটা মস্ত বড় ওক কাঠের বাক্স, তাতে খানিকটা আবার ঢাকনার মতো। বাক্সটার কাছে গিয়ে বুঝলাম, এ এক সাবেকি আমলের খাট। এ খাট ব্যবহার করলে বাড়ির প্রতিটি মানুষের একটি করে কামরার দরকার নেই। এটিই একটা গোটা কামরা যেন, এর ঢাকনা খুলে দিলে টেবিলের কাজও চলবে। আমি ঢাকনা খুলে আলোটা নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। তারপর ঢাকনা টেনে দিলাম। এবার হিথক্লিফ বা আর কারো সতর্ক প্রহরা থেকে আমি নিরাপদ।

মোমখানা যেখানে রাখলাম, সেখানে ছ্যাতলা-ধরা খানকয়েক বই এক কোণে সাজানো। কাঠের বাক্সের উপরে আঁচড়ে-আঁচড়ে কি সব লেখা। না,

তেমন কিছু নয়, একই নাম বিভিন্ন ঢঙে লেখা···কোনটা বা খুদে কোনটা বা বড়। ক্যাথেরিন আর্ন-শ কোথাও বা ক্যাথেরিন হিথক্লিফ হয়ে গেছে; আবার ক্যাথেরিন লিণ্টনে পরিণত হয়েছে।

বৈচিত্র্যহীন ঔদাসীন্যে কেটে যাচ্ছে সময়। মাথাটা এলিয়ে দিলাম জানালার উপর—পড়ে যাচ্ছি ওর নাম—ক্যাথেরিন আর্ন-শ-হিথক্লিফ-লিণ্টন। এমনি করতে করতে চোখ বুজে এল; কিন্তু পাঁচ মিনিটও হয়নি এরই মধ্যে হঠাৎ অন্ধকারে ঝলক দিয়ে গেল সাদা ক'টা অক্ষর—এরা যেন অশরীরীর মতোই স্পষ্ট—হাওয়া ভরে গেল, ক্যাথেরিনে কিলবিল করে উঠলো। এই নামটা যেন এসে জুড়ে বসলো চেতনায়, সত্তায়—তাকে দূর করে দেবার জন্যই উঠে পড়লাম। দেখি, আমার মোমের পলতেটা একখানা প্রাচীন পুথির উপর হেলে পড়েছে, আর সারা ঘর গরুর চামড়া পোড়ার গন্ধে এখন আমন্থর। নিবিয়ে দিলাম আলো ফুঁ দিয়ে; খারাপ লাগছে এই ঠাণ্ডায়, এই বিবশতায়। উঠে পড়ে বইখানা হাঁটুর উপর খুলে বসলাম। খুদে খুদে হরপে ছাপা টেস্টা-মেণ্ট। বড় সোঁদা গন্ধ তার, প্রথম পাতায় লেখা—ক্যাথেরিন আর্ন-শ এই পুথির মালিক। আর পঁচিশ বছর আগেকার একটা তারিখ। বইখানা বুজিয়ে রাখলাম, তারপর একখানার পর আর একখানা খুলতে লাগলাম। সব ক'খানিই এমনি করে দেখা হয়ে গেল। ক্যাথেরিনের গ্রন্থাগারটি সুনির্বাচিত, আর এর এই জরাজীর্ণতা তাদের অতি-ব্যবহারেরই পরিচয় দেয়; হয়তো বা বিধি-মতো হয় নি এই যা। এমন কোনো পরিচ্ছেদ নেই যেখানে পড়েনি কালির লেখনে মন্তব্য—মুদ্রাকর যতটুকু ফাঁকা রেখেছিল সেটুকু বোধহয় ভরাট হয়ে গেছে। কতগুলি অসংলগ্ন ছত্র, কতকগুলি বা নিয়মিত রোজনামচা—ছেলেমানুষের হাতের কাঁচা লেখা। একখানা বাড়তি পাতায় (এ খানা তো অমূল্য সম্পদ, হয়তো প্রথম দর্শনেই এর মূল্য সবচেয়ে বেশি)···বন্ধু জোসেফের একখানা ব্যঙ্গচিত্র দেখে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। মুন্সিয়ানা নেই আঁকায়, কিন্তু ক্ষমতা আছে। এই অচেনা-অজানা ক্যাথেরিনের প্রতি তখনই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ওর হরফগুলি আবিষ্কারের চেষ্টা চললো।

নীচের প্যারায় লেখা—রোববার খুব খারাপটা! বাবা যদি ফিরে আসতেন আবার! হিণ্ডলে তো বদলি হিসেবে খুবই খারাপ—হিথক্লিফের উপর ও ঘোর অবিচার করে। আমি আর ও বিদ্রোহ করবো—আজ সন্ধ্যেয় তো তারই প্রথম শুরু।

সারাদিন বৃষ্টি—বন্যা হয়ে গেছে যেন দিনটার উপর দিয়ে। গীর্জেয় যাওয়া গেল না। তাই চিলেকোঠায় জোসেফ উপাসনার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। হিণ্ডলে আর তার বৌ এখন নীচের ঘরে আগুন পোয়াচ্ছে। ওরা যা-ই করুক, বাইবেল তো পড়ছে না। কিন্তু আমাকে আর হিথক্লিফকে আর ঐ বেচারা চাষীর ছেলেটাকে তো যেতেই হবে পুথি নিয়ে উপরে, সার বেঁধে দাঁড়াতে হবে শস্যের বস্তার উপরে। তারপর গোঙানি আর কাঁপুনির পালা। জোসেফও কেঁপে কেঁপে উঠবে, হয়তো বা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবে উপাসনা। কিন্তু বৃথা আশা। পাকা তিনটি ঘণ্টা ধরে উপাসনা চললো। তবু আমার ভাই আমাদের নামতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, কি, এর মধ্যে হয়ে গেল? রোববার সন্ধ্যেয় আমরা খেলতে পাই, তবে বেশি গোলমাল করা বারণ। একটু হাসলেই অমনি খেলা বন্ধ, কোণে গিয়ে লুকোতে হয়।

ভাই যেন অত্যাচারী শাসক, সে কথায়-কথায়ই বলে, তোমাদের যে উপরওয়ালা আছে, একথা তোমরা ভুলে যাও। যে আমাকে চটাবে তাকে আমি শেষ করে দেব। আমি চাই হৈ চৈ না করে চুপ করে থাকবে। এই ছোকরা তুই হৈ হট্টগোল করিস নাকি? ফ্রান্সেস, যাবার সময় ওর ঝুটিটা ধরে এক ঘা কষিয়ে দিয়ে যেও তো! ওর আঙুল মটকাবার শব্দ শুনতে পেলাম। ফ্রান্সেস্ বেশ আচ্ছা করেই চুল টেনে দিলে। ও গিয়ে এবার ওর স্বামীর কোলে বসলে; দুজনেই যেন ছেলেমানুষ—কিসব বকে আর চুমু খায়—আমাদের তো ওদের এই বোকামি দেখে লজ্জাই হয়। আমরা তো ঐ আলমারীটার আড়ালে যতটা সম্ভব ভদ্রভাবেই ওসব করি। এই তো আমার পিনাফোর (জামার উপরে আচ্ছাদনি) খানা সেদিন পর্দার মতো করে টাঙিয়েছি, এমন সময় জোসেফ কি কাজে আস্তাবল থেকে

এদিকে এল। ও আমার পর্দাখানা তো ছিঁড়ে ফেললোই, আমার কানের উপর একটা থাপ্পড় মেরে খেঁকিয়ে উঠলো, এই তো সবে কর্তা গেলেন, এখনো তাঁর শেষ কাজের সময়ের মন্ত্রতন্ত্র তোমার মনে আছে, আর এরই মধ্যে এই সব হচ্ছে? ছিঃ ছিঃ কত ভাল বই রয়েছে, সেসব পড়, না হয় তো বসে, নিজের পরকালের কথা ভাব!

এই বলে ও আমাদের ধরে বসিয়ে দিলে। তারপর নিয়ে এল একখানা বাইবেল; দূর থেকে মিউনো আলো এসে ঠিকরে পড়ছে, তারই আলোতে পড়তে হবে। আমার সহ্য হল না। ঐ নোংরা বইখানা নিয়ে কুকুরের খোঁয়াড়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম, মনে মনে দিব্যি গাললাম, অমন ভাল বই ছোঁবও না। হিথক্লিফও তাই করলে। সোরগোল পড়ে গেল অমনি।

ওগো কত্তাগো, আসুন গো, দেখুন ক্যাথি বইখানা কি করেছে! জাহান্নামে দিয়েছে, আর হিথক্লিফ তাই করেছে। আপনি ওদের দেখ 'সে।'

হিণ্ডলে তার আগুনের কুণ্ডের স্বর্গ থেকে ছুটে এসে একজনের ধরলে কলার চেপে, আর একজনের হাত, তারপর রান্নাঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। জোসেফ জানালে, এবার শয়তান এসে আমাদের ধরবে। আমরা দুকোণে দুজনে বসে পড়লাম। এই বইখানা আর একটা দোয়াত তাক থেকে পেড়ে নিলাম, দরজাটা দিলাম খুলে। তারপর প্রায় বিশমিনিট ধরে লিখেছি। কিন্তু আমার সাথী তো বড় অস্থির, সে পরামর্শ দিলে গয়লা বৌ-এর জোব্বাটা পড়ে আছে, ঐটে চুরি করে নিয়ে ওরই আড়ালে আড়ালে মাঠে গেলে কেমন হয়! চমৎকার ফন্দি—তারপরে যদি ঐ গোমড়ামুখো বুড়োটা আসে, তখন তো দেখবে শয়তান অমাদের উপিয়ে নিয়ে গেছে। মাঠে বৃষ্টিতে ভিজলে কি আর হবে—এখানেও তো তেমনি ঠাণ্ডা।

বোধ হয় ক্যাথেরিন তার সংকল্পটা কাজে খাটিয়েছিল। পরের ছত্রে অন্য কথাই লেখা। মনে হয় সে তখন অশ্রুমুখী।

সে লিখেছে:—হিণ্ডলে যে আমাকে এমনি করে কাঁদাবে কে জানতো! আমার মাথায় তো যন্ত্রণা হচ্ছে, বালিসে মাথা রাখা যায় না, কিন্তু তবু তো

ওকে ছাড়তে পারব না। বেচারী হিথক্লিফ! হিণ্ডলে ওকে বলে বাউণ্ডুলে, এক সঙ্গে বসতে দেয় না, খেতেও দেয় না। আরও বলেছে, আমরা একসঙ্গে খেলতেও পাব না। ও যদি হুকুম না মেনে চলে, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবারও ভয় দেখিয়েছে। বাবা হিথক্লিফকে আদর করতেন বলে বাবাকেও ও যাচ্ছেতাই বলে (ওর কি করে এত সাহস হোল)—ও বলেছে, হিথক্লিফ যা তাই-ই ওকে করে তবে ছাড়বে।

বিবর্ণ পাতার উপরে তন্দ্রায় বার বার ঢুলে ঢুলে পড়ছিলাম। পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত হরফে সরে সরে যাচ্ছিল চোখ। লাল রঙের চিত্র-বিচিত্র এক শিরোনামা দেখলাম। রেভারেণ্ড জেবস্ ব্রাণ্ডারহামের গিমারর্ডন গীর্জায় বক্তৃতা। অর্ধচেতনায় মগজে ঢুঁড়ে মরছিলাম, কি বলবেন জেবস্ ব্রাণ্ডারহাম! এবার এলিয়ে পড়লাম বিছানায়, ঘুম এল। হায় চা আর বদ মেজাজের ফল! নইলে এমন ভয়ানক রাত কাটাতে হবে কেন? যখন থেকে সইবার শক্তি হয়েছে, এমন রাত তো আর জীবনে কাটাই নি।

স্থানকালের কথা ভুলে গেলাম, স্বপ্ন ভেসে এল। মনে হোল ভোর হয়েছে। বাড়ি ফিরে চলেছি, জোসেফ আমার পথপ্রদর্শক। পথে গভীর তুষার, হুমড়ি খেতে খেতে চলেছি। আমার সাথী বার বার আমাকে গাল দিচ্ছে, একখানা তীর্থযাত্রীর লাঠি কেন আনিনি—ও ছাড়া নাকি বাড়ি ফেরা যাবে না। ওর নিজের মোটা লাঠিটাও বার বার ঘোরাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য মনে হোল, নিজের বাড়িতে ঢুকতে অমন একখানা অস্ত্রের কেন দরকার হবে, তারপরেই এক নতুন ভাবনার বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে গেল। আমি তো বাড়ি ফিরছি না। আমরা চলেছি জেবস ব্রাণ্ডারহাম যেখানে তাঁর বক্তৃতা দেবেন সেখানে! হয় জোসেফ, নয় তো আমি একঘরে হব আমাদের কোনো একটি বিচ্যুতির জন্য।

উপাসনা মন্দিরে এসে গেলাম। দু-তিনবার এরই পাশ দিয়ে আমি গেছি। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে গীর্জাটি। জলার ধারে। তার আর্দ্র হাওয়ার জন্যই বোধহয় ওখানকার গোরের দেহগুলি সংরক্ষিত করবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

ছাদটা এখনো অটুটই আছে; কিন্তু পাদ্রীর বাৎসরিক বৃত্তি মোটে বিশপাউণ্ড আর দু-কামরার ঘরে তাঁর বাস বলেই কেউ সহজে একাজ নিতে চান না। আর একথাও চালু যে, তাঁর এই যজমানের দল বরং তাকে উপোস করাবে, তবু একপয়সা পকেট থেকে দিয়ে তাঁকে বাঁচাবে না। কিন্তু আমার স্বপ্নে তো ভিড়ই দেখতে পেলাম। আর পাদ্রীর বাণী—সে তো চারশো নব্বই ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগে এক-এক পাপের বিবৃতি।

ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। হাই তুলছি, আড়মোড়া ভাঙছি, মাথা নাড়ছি আর চাঙ্গা হতে চেষ্টা করছি। চোখ রগ্‌ড়ে, চিমটি কেটে ওঠ-বোস্ করে নিজেকে সজাগ রাখছি। এইবার তিনি এলেন উপসংহারে। এই সংকট মুহূর্তে আমার কেমন এক প্রেরণা এল, আমি জেবস্ ব্রাণ্ডারহামকে ঘোর পাপী হিসেবে চিত্রিত করতেই উঠে দাঁড়ালাম।

মহাশয়, আমি চিৎকার করে উঠলাম, এই বন্ধ ঘরে বসে বসে আমি আপনার উপদেশের চারশো নব্বইটি ধারা শুনেছি। চারশো নব্বইবার টুপী তুলে নিয়ে চলে যাবার জন্য উঠে পড়েছি, কিন্তু চারশো নব্বইবারই আপনি আমাকে আবার বসতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু চারশো একানব্বই তো আর সহ্য হবে না! আসুন শহীদ ভাইরা, আমরা ঐ ধর্মযাজককে টেনে নামাই, ওঁকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলি, যাতে করে ওঁর এই উপদেশ আর কখনো শুনতে না হয়!

জেবস্ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, তারপর নিজের আসনে বসে বললেন, তাহলে তুমিই সেই মানুষ! চারশো-নব্বইবার তুমি তোমার মুখবিকৃতি করেছ, আর চারশো নব্বইবার আমি আমার আত্মার বাণী শুনেছি। ওর প্রতি যে দণ্ডাদেশ হয়েছে, এস আমরা সেই আদেশ পালন করি!

সমস্ত জনতা তাদের মোটা লাঠি নিয়ে একযোগে আমার চারদিকে ধেয়ে এল। আমার আত্মরক্ষার অস্ত্র নেই। জোসেফ আমার সবচেয়ে কাছের আক্রমণকারী, তার লাঠিটা কেড়ে নেবার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে লাগলাম। জনতার সজমে হণ্ডে দণ্ডে সংঘাত বাধলো, আমার উদ্দেশ্রে আঘাত পড়তে লাগলো।

অন্যের পিঠে। সমস্ত উপাসনা মন্দির প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। প্রতিবেশী প্রতিবেশীদের মারছে, ব্রাণ্ডারহ্যামও অলস হয়ে বসে থাকতে চান না, তিনি বেদীর কাঠের মঞ্চের উপর জোরে শব্দ করে উৎসাহ প্রকাশ করছেন। আর সেই শব্দে আমি জেগে উঠলাম। এই যে তুমুল শব্দের ঢেউ বয়ে গেল, এর কারণ কি? পাদ্রীর ঐ শব্দের মানেই বা কি? কিছু নয়, ফারগাছের একটা শাখা দমকা হাওয়ায় ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে শার্সিতে। এক মুহূর্ত যেন দ্বিধাভরেই শুনলাম, এবার উপদ্রবকারীকে আবিষ্কার করলাম; তারপর পাশ ফিরে শুলাম। তন্দ্রা এল, এল স্বপ্ন; এ স্বপ্ন আগের চেয়েও বুঝি খারাপ।

ওক কাঠের কামরায় শুয়ে স্পষ্ট হাওয়ার গোঙানি শুনতে পেলাম, আর তুষারপাতের শব্দ বয়ে বয়ে এল বাতাসের ঝাপটায়। ফারগাছের ডালটায় আবার সেই বিরক্তিকর শব্দের পুনরাবৃত্তি। অতিষ্ঠ হয়ে উঠে ঐ শব্দ বন্ধ করে দিতে চাইলাম। মনে হোল, উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলতে গেলাম। ছিটকিনি খোলার অন্ধিসন্ধি জাগরণে জানা ছিল, কিন্তু এখন ভুলে গেছি। কিন্তু তবুতো এ শব্দ থামাতে হবে, বিড়বিড় করে আপন মনে বললাম। কাচের শার্সির উপর হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করছি। একবার হাত বাড়িয়ে সেই উদ্ধত শাখাও ধরতে গেলাম; তার বদলে তুষার-শীতল কটা আঙুল চেপে ধরলো আমার হাতখানা। খুদে হাত! দুঃস্বপ্নের তীব্র তীক্ষ্ণ ভয়ে আমি অভিভূত, হাত সরিয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু হাত তো আঁকড়ে ধরে রইল, ফোঁফানি ভেসে এল! শোকের গভীরতম সে ধ্বনি। কে যেন বলে উঠলো, আমাকে ঢুকতে দাও গো, ঢুকতে দাও! হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য চেষ্টা করে বললাম, 'কে তুমি?' 'আমি ক্যাথেরিন লিণ্টন', কম্পিত স্বরে এল উত্তর (কেন আমি লিণ্টনের কথা ভাবলাম, লিণ্টনের বদলে আর্ণ-শই তো অমন বিশবার পড়েছি?) 'এই বাড়ি ফিরলাম, জলায় পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।' ওর কথা ভেসে আসছে, আর আমি অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি এক শিশুর মুখ, সে জান্‌লা দিয়ে তাকিয়ে আছে। ভীতি আমাকে নিষ্ঠুর করে তুললো। ওকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা বৃথা, তাই ওর হাতখানা

টেনে নিয়ে এলাম ভাঙা শার্সির উপর, ঘসতে লাগলাম। ফিন্‌কি দিয়ে ছুটলে রক্ত, গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বিছানার চাদর ভিজে গেল, এখনও কেঁদে কেঁদে বলছে, আমাকে ভিতরে ঢুকতে দাও গো, দাও! তার হাত এখনো আঁকড়ে ধরে আছে, ভয়ে আমি তো পাগল। শেষে বললাম, কি করে দেব গো? যদি ভিতরে আসতে চাও আমাকে আগে ছেড়ে দাও! শিথিল হয়ে এল আঙুল, ভাঙা ফোকরের ভিতর দিয়ে হাতখানা টেনে আনলাম, একগাদা বই এনে পিরামিড় তৈরী করে ফেললাম শার্সির কাছে; ঐ আকুতি যাতে না শুনতে হয়, তাই কান বন্ধ করে দিলাম। মনে হয়, পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল, আবার শুনতে পেলাম সেই মড়া কান্না। যা দূর হয়ে যা! চেঁচিয়ে উঠলাম, তোকে কখনো ভিতরে ঢুকতে দেবনা, বিশবছর ধরে কাঁদলেও না! কান্না গলে গলে পড়লো, 'বিশবছর তো হোল। আজ বিশবছর ধরেই তো আমি ঘর ছাড়া।' আবার দুর্বল হাতের আঘাত, আবার আঁচড়ের শব্দ উঠলো বাইরে, বইয়ের স্তূপ নড়ে নড়ে উঠছে, কে যেন সামনে ঠেলে দিচ্ছে। লাফিয়ে উঠে পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পা যে নড়ে না; তাই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম জোরে; দ্রুত পায়ের শব্দ আমার ঘরের দিকে এগিয়ে এল; কে যেন সবলে ঠেলে খুলে ফেলল দরজা। আলো ঝলকে দিয়ে গেল বিছানার শিয়রে। তখনো কাঁপছি, ঘাম মুছছি আর বিড়বিড় করে চলেছি! যে এসেছে, তার এগুতে দ্বিধা; আপন মনে কি বলছে। অবশেষে আধো ফিস-ফিসানিতে বললে 'কেউ আছ নাকি?' উত্তরের সে আশা করে নি। নিজের অস্তিত্ব স্বীকারই শ্রেয় মনে হোল। হিথক্লিফের উচ্চারণভঙ্গী আমার চেনা। তাছাড়া আমি চুপ করে থাকলেই বা কি, ওতো তন্ন তন্ন করে তাল্লাশ চালাবে। তাই ঢাকনা খুলে দিলাম। কি যে হয়ে গেল, সে কথা আমি তো ভুলতে পারব না।

হিথক্লিফ প্রবেশদ্বারে। পরনে ট্রাউজার, গায়ে সার্ট, একটা মোমবাতি তার হাতে। ফোঁটা ফোঁটা গলন্ত মোম ঝরছে তার আঙুলের উপর; তার মুখখানা পেছনের দেয়ালের মতই সাদা। ওককাঠের এই সিন্দুকটার প্রথম শব্দ হতেই যেন সে বৈদ্যুতিক আঘাত পেল। আলোটা হাত থেকে কয়েক হাত দূরে

ঠিকরে পড়লো, উত্তেজনায় সে থরোথরো কাঁপছে, বাতিটা তুলে নিতেও বুঝি সে এখন অক্ষম।

মহাশয়, আমি আপনার অতিথি, তাকে এই ভীরুতার অপমান থেকে বাঁচাবার জন্তেই বলে উঠলাম। আমার বরাত, দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমের ভিতরে চেঁচিয়ে উঠেছি। আপনাকে যে বিরক্ত করলাম, এজন্য দুঃখিত!

আরে তাই বলুন—মিঃ লকউড! আমি তো ভেবেছিলাম আপনি অন্য কোথাও—গৃহস্বামী মোমখানা চেয়ারের উপর রেখে বলতে লাগলেন। এখনো বুঝি স্থির হয়ে ধরে রাখার মতো শক্তি তাঁর নেই। আপনাকে এ-ঘর কে দেখিয়ে দিলে? তিনি দাঁতে দাঁত চেপে মুখের মাংসপেশীর আবেগ দমন করলেন, হাতের আঙুলে নখ বসিয়ে দিলেন। কে এ-কাজ করলে? ওদের এখুনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে হচ্ছে!

আপনার দাসী জিল্লা, মেঝেয় লাফিয়ে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি পোষাক পরতে-পরতে বললাম। মিঃ হিথক্লিফ, আপনি যদি ওকে তাড়িয়েও দেন, আমি কিছু মনে করব না। ওর এ শাস্তি প্রাপ্য। এটা যে হানাবাড়ি তার আর একটা প্রমাণ আমার উপর দিয়েই ও পেতে চেয়ে ছিল। উঃ মশাই। এই কামরায় ভূত আছে, দানা আছে। আপনি ঢাকনা এঁটে দিয়ে ভালই করেছেন মশাই। এই কামরায় থেকে কেউ আপনাকে ধন্যবাদ দেবে না।

হিথক্লিফ শুধালেন, কি ব্যাপার মশাই, আপনিই বা কি করছেন? যখন এখানে ঢুকে পড়েছেন, শুয়ে পড়ে রাতটা কাবার করে দিন; কিন্তু দোহাই আপনার, অমন বিদঘুটে শব্দ করবেন না। মানুষের গলা না কাটতে গেলে অমন শব্দ বেরোয় না!

ঐ খুদে শয়তানিটা যদি জানালা দিয়ে ঢুকতে পেত, আমার টুঁটী টিপেই শেষ করে দিত! জবাব দিলাম। আপনার অমন অতিথিবৎসল পূর্বপুরুষের অত্যাচার সইতে আর আমি রাজি নই। আচ্ছা মশাই, ঐ যে রেভারেণ্ড জেবস্ ব্রাণ্ডারহাম উনি আপনার মার দিকের আত্মীয় নন? আর ঐ যে ছেনাল মেয়েটা ক্যাথেরিন লিণ্টন, না আর্ণ-শ কি ওর নাম—ও নিশ্চয়ই খুব

খারাপ ছিল ? ও যে দানো হয়ে আছে তাতো আমাকে নিজেই বলেছে। এই বিশবছর ধরে পৃথিবীতে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও জীবনে পাপ করেছিল, তেমনি ওর পাপের উচিত শাস্তিই পেয়েছে !

উচ্চারণ করেই মনে পড়লো ক্যাথেরিন আর হিথক্লিফের কথা তো পড়েছি, ওদের নাম যে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ কথা তো একেবারে ভুলে গিছলাম, এখন মনে হচ্ছে। নিজের বোকামিতে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলাম, কিন্তু সেটা চেপে রেখে তাড়াতাড়ি বললাম, 'সত্যি কথা বলতে গেলে মশাই, প্রথম রাতটা আমি—বলতে বলতে থেমে পড়লাম। বলতে যাচ্ছিলাম—পুরানো পুথিগুলো পড়েই কাটিয়েছি। কিন্তু তাতে তো ওদের লিখিত ও মুদ্রিত বিষয় সম্পর্কে আমি যে জানি তা-ই-ই প্রকাশ পাবে ; তাই নিজের ভুল সংশোধন করে বললাম, ঐ জানালার উপরের লেখা পড়তে-পড়তেই কাবার হয়ে গেল।

আপনার এভাবে কথা বলার মানে কি ? হিথক্লিফ যেন বর্বর আবেগে গর্জে উঠলেন—আমার বাড়িতে বসে এসব কথা বলার আপনার সাহস হোল কি করে ?' উঃ লোকটা কি পাগল ! তিনি ক্রোধে নিজের কপালে চাপড়াতে লাগলেন।

বুঝতে পারলাম না, এতে রেগে উঠব, না, আমার কৈফিয়ৎ দিয়ে যাব ; কিন্তু হিথক্লিফ তো অস্থির। মায়া হোল, স্বপ্নের কথাই বলতে লাগলাম। ক্যাথেরিন লিন্টন-এর নাম আগে কখনো শুনি নি একথা বললাম, কিন্তু বার বার পড়বার পর ঐ নামই যেন মূর্তিমতী হয়ে এল আমার কাছে, তখন আর কল্পনার রাশ টেনে রাখতে পারিনি। হিথক্লিফ শুনছিলেন আর শয্যার আশ্রয়ে এলিয়ে পড়ছিলেন ; শেষে তো একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বিছানার অতলে। ওঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের স্রোতে বাধা পড়ছে, মনে হোল এক প্রকাণ্ড ভাবাবেগের আতিশয্য চেপে রাখবার জন্য সংগ্রাম করছেন। কিন্তু আমি যে ঐ সংগ্রামের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, একথা তো ওঁকে জানানো হবে না। আমি কাপড়-চোপড় পরতে লাগলাম, ঘাড়

দেখলাম। রাতের দীর্ঘতা নিয়ে করলাম স্বগতোক্তি। 'এখনো তিনটে বাজেনি! নিশ্চয়ই ছটা বেজেছে—এ আমি হলফ করে বলতে পারি! এখানে সময় যেন বদ্ধ-জলার মতো আটকে থাকে; তাহলে আমরা বোধহয় আটটায় শুয়ে পড়েছিলাম।'

আমরা শীতের দিনে ন' টায় শুই, উঠি চারটেয়—গৃহস্বামী একটা অস্ফুট কাতরানি গলায় দলে-পিষে দিয়ে বলে উঠলেন। ওঁর ছায়া-হাতের ভঙ্গীতে মনে হোল, চোখ থেকে বুঝি জলও মুছে ফেললেন। বললেন, মিঃ লকউড, আপনি আমার ঘরে যেতে পারেন; আপনার ছেলেমানষি চীৎকারে আমার ঘুমের দফা তো রফা হয়ে গেছে।

উত্তর দিলাম, আমারও তাই! আমি ভোর অবধি উঠোনে পায়চারি করে বেড়াব। আপনার ভয় নেই, আমি আর আসব না। শহরে বা গ্রামে কোথাও আর সমাজে মেলামেশা করতে যাব না। ও রোগ একেবারে সেরে গেছে। বুঝদার মানুষের কাছে তো নিজের সঙ্গই যথেষ্ট।

হাঁ, আপনি জবর সাথী বটে! হিথক্লিফ অস্ফুট স্বরে বললেন, ঐ মোমবাতি-খানা নিয়ে যেখানে খুশি চলে যান। আমি আসছি। উঠোনে যাবেন না, কুকুরগুলো ছাড়া আছে; আর বাড়িতে আছে জুনো—সে আমাদের সান্ত্রী—শুধু বারান্দা আর সিঁড়ি অবধিই আপনার হদ্দ। যান, চলে যান! আমি মিনিট দুয়েকের ভিতরেই আসছি।

আদেশ মেনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম; সংকীর্ণ অলিন্দ শুরু হয়েছে, কোথায় তার শেষ কে জানে! দাঁড়িয়ে রইলাম, আমার বাড়িওয়ালার কুসংকার-অন্ধ আচরণের সাক্ষী হলাম। বিছানায় তিনি এগিয়ে পড়ে খুলছেন জানালা, আবেগে এবার বিস্ফূর্ত হয়ে পড়লেন; এস, এস! রুদ্ধ আবেগে কেঁপে উঠলেন, ক্যাথি আমার, এস। আর-একটিবার এস! আমার প্রিয়া একবার আমার কথাটি শোন—শোন! অশরীরী আত্মা তার খেয়াল-খুশিতে চলে, সে মূর্তিমতী হয়ে উঠলো না। কিন্তু বাতাস আর তুষারের মাতন শুরু হোল। সে-এক উদ্দাম আবেগ, এসে আমার কাছে পৌঁছে আলোটা নিবিয়ে দিলে।

দুঃখের এই স্রোতে কি যে ব্যথা কে বলবে? তার সঙ্গে মিশে আছে ওঁর ঐ প্রলাপ—সমবেদনায় মন ভরে গেল, নির্বুদ্ধিতা চোখে পড়ল না। বরং নিজের উপর রাগ হোল—কেন শুনলাম, কেন বললাম এই দুঃস্বপ্নের কথা—তাই তো এ-ব্যথা। কিন্তু কেন—কেন এ-ব্যথা আমি বুঝি না। ছুটতে-ছুটতে এলাম রান্না ঘরে, সেখানে আগুনের স্ফুলিঙ্গ এখনো ঝিকমিক করছে, আমার মোমখানা আবার জ্বালিয়ে নিলাম। স্পন্দনবিহীন চারদিক, শুধু একটা ধূসর বেড়াল উঠে এল ছাইয়ের গাদা থেকে, সে আমাকে দেখে ম্যাও ম্যাও করে উঠলো। এ যেন এক দ্বন্দ্বের আহ্বান।

দুটি বেঞ্চিতেই রান্না ঘরের জায়গাটুকু প্রায় ভর্তি। একখানা বেঞ্চিতে আমি সটান শুয়ে পড়লাম, গ্রিমালকিন, ঐ শয়তান বেড়ালটা আর-একটায় উঠে পড়লো। দুজনেই দু দিকে ঢুলছি। আমাদের এই আশ্রয় এখনো আক্রান্ত হয় নি। এমন সময় জোসেফ একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। সিঁড়িটা ছাদে গিয়ে ঠেকেছে, তারপর ফোকর দিয়ে উপরে উঠে গেছে। বোধহয় এই তার চিলেকোঠায় আরোহণের পথ। সে আলোর রেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টি সন্দিগ্ধ। বুঝলাম, ওর এই নিভৃত আশ্রয়ে আমার অনধিকার প্রবেশ বুঝি মন্তব্যেরও অতীত; পাইপ টানছে, আর ধোঁয়া ছাড়ছে। ওর এই বিলাসে আমি বাধা দিলাম না। শেষ টান দিয়ে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। যেমন গম্ভীরভাবে এসেছিল, তেমনি চলে গেল।

আবার পদক্ষেপ শোনা গেল, অনেক সহজ তার গতি। 'সুপ্রভাত' বলবার জন্যে হাঁ করে ছিলাম, আবার মুখ বুজে রইলাম। স্বাগতবাণী অনুচ্চারিত রয়ে গেল। হেয়ারটন আর্ন-শ এসে ঢুকলো, শাবল খুঁজছে সে ঘরের কোণে; না পেয়ে গালাগাল দিচ্ছে; আমি বা আমার সাথী বেড়ালটির উদ্দেশ্যে একবার সম্ভাষণও জানালে না। বেঞ্চি ছেড়ে ওর পিছনে-পিছনে যাবার উদ্যোগ করলাম। ও লক্ষ্য করে ভিতরের একটা দরজা শাবলের ডগা দিয়ে

খুলে দিলে, তারপর অস্ফুট শব্দে জানিয়ে দিলে যে, স্থান-পরিবর্তন করতে হয়তো ঐখানেই আমাকে যেতে হবে।

বাড়ির ভিতরে যাবার দরজা। সেখানে এখন মেয়েরা জেগে গেছেন। জিল্লা একটা বিরাট চোঙায় ফুঁ দিয়ে চিমনির আগুনের শিখা জ্বালাতে ব্যস্ত; মিসেস হিথক্লিফ ঐ আলোতে বসে পড়ছেন বই। যেন বিভোর হয়ে গেছেন; শুধু মাঝে মাঝে আগুনের হল্‌কা উড়ে আসছে বলে দাসীকে ভৎর্সনা করছেন, অথবা দু-একটা কুকুর এসে ওঁর মুখে নাক ঘসছে বলে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। হিথক্লিফকে সেখানে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আগুনের কাছেই তিনি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন; এইমাত্র জিল্লার সঙ্গে ঝড়ের পালা শেষ হয়েছে; জিল্লা এখন কর্মব্যস্ত, কিন্তু ঝাড়নখানা মাঝে মাঝে টানছে আর গজরাচ্ছে।

আর তুমি—তুমি তো একটা অপদার্থ—আমি ঢুকেই শুনলাম—তিনি পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন।

নিতান্ত নিরীহ গালাগাল—হাঁস-ভেড়া এমনি আর কি—কিন্তু সেগুলিকে অনুচ্চারিত রেখে, ড্যাশ, দিয়ে তার তীব্রতা বাড়িয়ে তুলছেন—আবার তোমার সেই পুরানো ফন্দি ধরেছ। ওরা তো তবু নিজেদের রুজি-রোজগার করে, আর তুমি তো আমার উপর বসে বসে খাচ্ছ! তোমার আর বসে থাকা চলবে না, একটা কাজ খুঁজে নাও! এই যে আমার চক্ষুশূল হয়ে বসে থাকবে তা হবে না! এর জন্যে কাজ করতে হবে—এই বেশ্যা, শুনছিস!

হাঁ, আমি, আমি অস্বীকার করলেও আপনি তা করাতে পারেন। মেয়েটি তার বই বুজিয়ে চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। কিন্তু আমি কিছুই করবো না। গাল দিয়ে দিয়ে আপনার জিভ ক্ষয়ে যাবে। আর যদি কিছু করতে হয়তো, আমার যা ইচ্ছে হবে তাই করবো!

হিথক্লিফ হাত তুললেন, মেয়েটি সরে গেল, ঐ হাতের ওজন তার জানা। এমন কুকুর-বেড়ালের ঝগড়ায় আনন্দ পাইনে, তাই আমি ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে এলাম। অগ্নিকুণ্ডের কাছে তার উষ্ণতার ভাগীদার হতেই চলেছি, যেন এই

বাধাপ্রাপ্ত বিবাদের সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। দুজনেরই যথেষ্ট ভদ্রতাজ্ঞান আছে, তাই বিবাদ স্থগিত রইল। হিথক্লিফ মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা পকেটে পুরে ফেললেন, মিসেস হিথক্লিফ ঠোঁট কুঁচকে দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর আমি যতক্ষণ ছিলাম, তিনি মূর্তির মতোই দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হোল না এই মুহূর্ত। আমি ওদের ছোট-হাজরীর নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে উষার প্রথম আলো দেখা দিতেই সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এলাম। মুক্ত বাতাস। তার আবেগ নেই, মিহি তুষারের মতোই তার শীতলতা।

বাগানের শেষ সীমায় এসে তখনও পৌছইনি, এরই মধ্যে বাড়িওয়ালা হাঁকডাক শুরু করলেন। তিনি আমাকে জলা পার করে দিয়ে আসতে চান—এই তাঁর প্রস্তাব। প্রস্তাব সাধু! কেননা পাহাড়ের ওপিঠে এখন গর্জমান শুভ্র সমুদ্র। তার তরঙ্গের বিক্ষোভে নেই চড়াই-উতরাইয়ের অভিজ্ঞান। বহু গর্ত এখন কানায় কানায় জলে ভরা; আর পাথরের ঢিবি তো এখন মানচিত্র থেকে মুছে গেছে। অথচ কাল তো সে ছবি ছিল স্পষ্ট। ছ'সাত হাত অন্তর আমি এক-একখানা খাড়া পাথর দেখেছিলাম কাল, সারা প্রান্তর জুড়ে ছিল পাথরগুলি। এইগুলিতে চুণকাম করা, অন্ধকারে পথের নির্দেশ দেবার এরাই পিল্‌পে। কিন্তু আজ কর্দমাক্ত বিন্দু ছাড়া তাদের তো কোনো সত্তা নেই। এখানে ওখানে শুধু জেগে আছে বিন্দুর সার। আমার সঙ্গী বার বার আমাকে ডানে কি বাঁ দিকে যাবার নির্দেশ দিতে লাগলেন। অথচ আমার মনে হচ্ছিল, আমি নির্ভুলভাবেই আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে চলেছি। কথাবার্তা কমই হচ্ছিল। অবশেষে হিথক্লিফ এসে দাঁড়ালেন থ্রাসক্রস পার্কের সুমুখে; বললেন, এবার আর ভুল হবে না। মাথা নুইয়েই বিদায়ের পালা শেষ হোল। এবার এগিয়ে চললাম নিজের উপর নির্ভর করে। দেউড়ি ঘরখানি এখনো খালি পড়ে আছে। পার্কের এই ফটক থেকে গ্রেঞ্জ এখনো দু' মাইল। মনে হোল, সে-পথ চার মাইল হয়ে দাঁড়াল আমার কাছে। কখনো বা গাছের আড়ালে হদিশ হারিয়ে ফেললাম, কখনো বা তুষারে গলা

অবধি ডুবে যেতে লাগলাম; যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই বুঝতে পারবেন আমার দশা। যাই হোক, ঘুরে ঘুরে বাড়ি এসে যখন ঢুকলাম, বারোটার ঘণ্টা পড়লো। ওয়াদারিং হাইটস্ থেকে প্রতিটি মাইল আসতে ক'ঘণ্টা লেগেছে তার একটা হিসাব পাওয়া গেল।

আমার বাড়ির প্রধানা পরিচারিকা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আমাকে দেখে ছুটে এল, একসঙ্গে সোরগোল তুলে বললে, ওরা আমার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। সবাই ভেবেছে, কাল রাতেই আমি মারা গেছি। ওরা তখন জল্পনা করছিল, কি করে আমার লাসটা খুঁজে পাবে। ফিরে এসেছি দেখে ওরা শান্ত হোল। বুক-অবধি অসাড় হয়ে গেছে, টেনে-হিঁচড়ে উপরে উঠে এলাম। শুকনো পোষাক পরে ঘরের ভিতরে ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট পায়চারি করে কেটে গেল। প্রাণী দেহের স্বাভাবিক তাপ ফিরে এল। এবার এলাম বসার ঘরে। বিড়ালের ছানার মতো তখন আমি দুর্বল। অগ্নিকুণ্ডের প্রসন্ন আলো উপভোগ করতে লাগলাম, আর পরিচারিকা নিয়ে এল আমাকে সজীব করে তোলার জন্যে কাফি। ধোঁয়া উঠছে তখনো পেয়ালা থেকে।

চার

কি চপলমতি আমরা! যে-আমি সামাজিক মেলামেশা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাই, সে-ই কিনা এই অসম্ভব কাণ্ড করে বসলাম! সন্ধ্যে অবধি কেটে গেল অবসন্ন নির্জনতায়। নিজের মনে চললো দ্বন্দ্বের পালা—তারপরে হঠাৎ পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলাম। আমার ঘর-গৃহস্থালির কি কি দরকার এই ওজুহাতে মিসেস ডিনাকে (আমার পরিচারিকা) খাওয়ার সময় কাছে বসতে বললাম। মনে আশা, সে নিশ্চয়ই গল্পে মানুষ হবে—আমাকে সে সজীব করে তুলবে, নয়তো দেবে ঘুম পাড়িয়ে। শুরু করলাম, তুমি অনেকদিন এখানে আছ—ষোল বছর বলছিলে না?

কর্তা, আঠারোটি বছর আছি গো। কর্ত্রী-ঠাকরুণের যখন বিয়ে হোল,

তখন তাঁর কাজ করতে এনু। তিনি মারা যাবার পর কর্তা আমাকে ঘর-সংসার দেখাশুনোর জন্যে রেখে দিলেন।

তাই নাকি!

বিরতি। মনে হোল, ও বোধহয় নিজের ব্যাপারে ছাড়া গল্প-প্রবণ নয়, কিন্তু ওতে তো আমার কৌতূহল নেই। কিছুক্ষণ হাঁটুর উপর হাত রেখে ঠায় বসে রইল, মুখখানায় ওর ভাবনার মেঘ জমেছে। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, দিনকাল কত বদলে গেছে!

বললাম, হাঁ, তুমি তো অনেক দেখেছো।

হাঁ, দেখনু বৈকি, কত ঝড়-বাদল গেল গো!

মনে মনে ভাবলাম, এবার বাড়িওয়ালার পরিবারের দিকে কথার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। হাঁ, বিষয় বটে! ঐ যে সুন্দরী বিধবা, ওর ইতিহাস তো আমি জানতে চাই। ও কি এ অঞ্চলের মেয়ে, না, অন্য জায়গা থেকে আমদানি? এই ইচ্ছে নিয়েই মিসেস ডিনাকে শুধালাম, হিথক্লিফ কেন থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জ ভাড়া দিয়ে তার চেয়ে ওঁছা বাড়িতে থাকেন। তাঁর কি টাকাকড়ি তেমন নেই, যাতে এই বাড়িখানা সাজিয়ে-গুছিয়ে থাকা যায়?

কে বললে, টাকাকড়ি নেই কর্তা? কত যে টাকা কে বলবে গো, বছর বছরই তো বাড়ছে। হাঁগো, হাঁ ভাল বাড়িতে থাকার মতো ঢের ঢের টাকা আছে—কিন্তু একটু হাড় কিপ্‌টে মানুষ গো মানুষ! থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জ ভাড়া নিতে চায় এমন ভাড়াটে দাঁওমতো পেলে দরাদরি করে কয়েক শো টাকা বাড়িয়ে নেবে তবে ছাড়বে। মানুষের এত লোভ যে কেন হয় কে জানে। অথচ ওতো নিজে একা।

ওঁর এক ছেলে আছে না?

হাঁ, একটা ছিল বটে—সে তো কবে মরে গেছে।

ঐ যে মেয়েটি—মিসেস হিথক্লিফ—তারই বিধবা বৌ না?

হাঁ গো হাঁ।

ওর বাড়ি কোথায়?

কর্তা, ওতো আমারই আগের মনিবের মেয়ে। ওর আগে নাম ছিল ক্যাথেরিন লিণ্টন। আহা বেচারী, কত যত্ন-আত্তি করেছি! আমি তো ভাবি, হিথক্লিফ এখানে আসে না কেন—তাহলে তো ওর সঙ্গে আবার থাকতে পাই!

কি? ওর নাম ক্যাথেরিন লিণ্টন? বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলাম। মুহূর্তের ভাবনায় পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার সেই অশরীরী ক্যাথেরিন তো ও নয়। মুখে বললাম, আমার আগে যিনি ছিলেন, তাঁর নাম তাহলে লিণ্টন?

হাঁ গো কর্তা!

আর্ণ-শটি কে বল তো—ঐ যে হেয়ারটন আর্ণ-শ—মিঃ হিথক্লিফের বাড়িতে থাকে? আত্মীয় নাকি?

না, উনি হচ্ছেন মিসেস লিণ্টনের ভাইপো।

ঐ মেয়েটির ভাই?

হাঁ ওর সোয়ামিও তো ঐ ওনার ভাই ছেলো; একজন মার দিক দিয়ে, আর একজন বাপের দিক দিয়ে। হিথক্লিফ মিঃ লিণ্টনের বোনকে বে করেছেল।

ওয়াদারিং হাইট্‌স্-এ আর্ণ-শ নামটা খোদাই করা দেখলাম, ওঁরা কি বনেদী ঘর?

খুব বনেদী—হেয়ারটন ওঁদের বংশের শেষ টিমটিমে বাতি, আর মিস ক্যাথি আমাদের—ঐ লিণ্টনদের গো কর্তা। ওয়াদারিং হাইটস্-এ গিছলেন নাকি? হ্যাখগো, কি বলতে কি বন্ন—ও কেমন আছে কর্তা?

কে—মিসেস হিথক্লিফ? ভালই তো দেখলাম। সুন্দরী বটে! কিন্তু মনে বুঝি সুখ নেই।

তাতে অবাক হব না! মনিবকে কেমন লাগলো?

মিসেস ডিন, বলবো কি, লোকটা একটু অভদ্র—তাই না?

অভদ্দর বলে অভদ্দর—একেবারে করাতের ধার যেন, আর কড়া যেন শান-পাথর। ওঁর সঙ্গে যত না মিশবেন, ততোই ভাল কর্তা।

ওঁর—ওঁর এই জীবনে হয়তো বহু ধকল গেছে, তাই এমনি হয়ে গেছে। ওঁর কথা কিছু জান?

জানি, সব জানি; শুধু জানি না, কোথায় জন্মেছে, আর ওঁর বাপ-মা কে? আর কি করেই বা এক কাঁড়ি টাকা পেলে? ঐ ছোঁড়া হেয়ারটন ছাড়া ঐ এলাকার সবাই জানে ও কি রকম ঠকেছে।

দেখ, মিসেস ডিন, আমার এই পাড়া-পড়শীর কথা যদি বল তো বড় ভাল হয়, নইলে বিছানায় শুয়েও ঘুম আসবে না। বোসো না, গল্পই না হয় শোনা যাক!

নিশ্চয়ই কর্তা! যাই একটা সেলাই-ফোঁড়াই কিছু নিয়ে আসি, তারপর যতক্ষণ বলবেন, বসে থাকবো। কিন্তু আপনার তো সর্দি লেগেছে, আপনাকে কাঁপতে দেখনু গো। আপনার তো কিছু পথ্য চাই।

সে ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলে গেল; আমি আগুনের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে রইলাম। মাথা যেন জ্বলে যাচ্ছে, বাকি শরীরটা যেন হিম হয়ে আছে। তাছাড়া আমার মগজে আর স্নায়ুতে তখন পাক খাচ্ছে উত্তেজনা। আজ আর গতকালের ব্যাপারের পরিণাম সম্পর্কে তখন আমি শুধু অস্বস্তিই ভোগ করছিলাম না, ভীত হয়েই উঠলাম। সে তাড়াতাড়ি নিয়ে এল একটা পাত্র, আর সেলাইয়ের সরঞ্জামের বটুয়া। ধোঁয়া-ওঠা পাত্রটা আমার সুমুখে রেখে, সরে এসে বসলো। আমাকে দরদী শ্রোতা পেয়ে খুশি। সে ভূমিকা না করেই শুরু করলে—

এখানে আসার আগে বলতে গেলে ওয়াদারিং হাইটস্-এই থাকতাম, আমার মা হেয়ারটনের বাপ হিণ্ডলে আর্ণ-শর সেবা-শুশ্রূষা করতেন, আর আমি যেতাম ছেলেপুলেদের সঙ্গে খেলা করতে। কাউকে খপর দিতে হলে আমিই ছুটতাম, খড় শুকোবার কাজেও যোগান দিতাম, এককথায় সব সময়েই খামারেই থাকতাম, যে-কাজ যখন দরকার করতাম। সেদিন

ছিল গ্রীষ্মকালের ভোর বেলা—ভারি সুন্দর দিন—ফসল কাটার সময় তখন শুরু হয়ে গেছে। বুড়ো মনিব আর্ণ-শ কোথায় যাবেন বলে পোষাক-আষাক পরে নিচে নেমে এলেন। দিনের কাজ জোসেফকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি হিণ্ডলে, ক্যাথি আর আমার দিকে তাকালেন, আমি তখন ওদের সঙ্গে বসে জাউ খাচ্ছিলাম। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, ওগো আমার নাদুস-নুদুস মানুষটি, আজ আমি লিভারপুল যাচ্ছি, তোমার জন্য কি আনবো? যা তোমার ইচ্ছে বল, কিন্তু যেন বেশি ভারী জিনিষ না হয় দেখো। আমাকে হেঁটে যেতে হবে, ফিরতেও হবে। এক-একবারে ষাটটি মাইল—বহু দূর পাল্লার পথ!' হিণ্ডলে একটা বেহালা চাইলে। এবার তিনি ক্যাথিকে শুধালেন; তার বয়েস তখন ছ' বছরও পোরে নি, কিন্তু তখনি আস্তাবলের যে কোনো ঘোড়ার সওয়ার হয়ে সে বসে, ও তাই একটা চাবুক চাইলে। আমাকেও তিনি ভোলেন নি, বড় ভাল মন ছিল তাঁর, তবে মাঝে মাঝে বড় কড়া হতেন। আমার জন্যে এক পকেট-ভর্ত্তি আপেল আর ডালিম আনবেন বললেন। এবার ছেলেমেয়েকে চুমু খেয়ে রওনা হলেন। তিন দিনের দিন মিসেস আর্ণ-শ আশা করে রইলেন তিনি রাতে খাবার সময় ফিরবেন। খেতে বসতে দেরী করতে লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল, কিন্তু আসবার নামটি নাই। ছেলেমেয়েরা ছুটে ছুটে ফটকে যাচ্ছে দেখতে, শেষে তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়লো। রাত হয়ে এল; তিনি ওদের বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে চাইলেন; কিন্তু ওরা বসে থাকার জন্যে আবদার ধরলে। তারপর প্রায় যখন এগারোটা, নিঃশব্দে দরজার আগল খুলে গেল, মনিব এসে ঢুকলেন। চেয়ারে ঝুপ্ করে বসে পড়লেন। হাসছেন আর কাত্‌রাচ্ছেন; সবাইকে ভিড় করতে বারণ করলেন। প্রায় আধ-মরা হয়ে ফিরেছেন—তিন-তিনখানা রাজ্য পেলেও তিনি আর অতখানি হাঁটবেন না এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

উপরের কোটটা খুলে ফেলে বাণ্ডিলের মত করে জড়িয়ে নিয়ে ছিলেন, সেটা খুলতে খুলতে বললেন, বাবাঃ মারাই বুঝি যাব! ওগো শোন তো, এমনটি

আর জাবনে ঘটেনি, কিন্তু ভগবানের দান হিসেবেই একেও তোমাকে নিতে হবে। কিন্তু যা কালো, দেখেতো মনে হয় শয়তানেরই দান!

আমরা ভিড় করে দাঁড়ালাম; ক্যাথির মাথার উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, একটা নোংরা ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক-পরা বাচ্চা—মাথার চুল তার কালো। বেশ বড়; হাঁটতে কথা কইতে পারে বলেই মনে হয়; ওর মুখখানা দেখে ক্যাথেরিনের থেকেও বড় বলে মনে হয়। কিন্তু ওকে দাঁড় করিয়ে দিতে ও শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল, আর বার বার কি সব আউড়ে গেল। কেউ বুঝতে পারলে না সে কথা। আমি তো ভয়ই পেলাম, আর মিসেস আর্ণ-শ তো তখনি ওকে হাত-পা ধরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে তৈরী। তিনি তো জ্বলে উঠলেন, নিজেদের বাচ্চা থাকতে কি করে উনি একটা বেদের বাচ্চাকে বাড়িতে এনে তুললেন, কি করবেন উনি এই বাচ্চাটাকে নিয়ে? না, তিনি পাগল হয়ে গেছেন? মনিব ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু তিনি তখন ক্লান্তিতে আধ-মরা, মিসেস-এর বকাবকির ভিতরে যেটুকু শুনতে পেলাম, তাতে বুঝলাম, মনিব ওকে লিভারপুলের এক রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। বাড়িঘর নেই, উপোস করে আছে, কথাও বলতে পারে না। উনি তো ওকে তুলে নিয়ে ওর বাপ-মার সন্ধান করতে লাগলেন। কেউ বলতে পারে না কার ছেলে। এদিকে মনিবের কাছে টাকাও তেমন নেই, হাতেও সময় কম। তাই ভাবলেন এখানে বসে থেকে খরচ বাড়িয়ে লাভ নেই, তিনি ওকে বাড়িতেই নিয়ে আসবেন। ওকে ফেলে যে আসবেন না সে-কথা তখন স্থির করে ফেলেছেন! শেষে আমার মনিবানীকে গজরে গজরে চুপ করে যেতে হোল। মিঃ আর্ণ-শ আমাকে ওকে স্নান করিয়ে ফরসা পোষাক পরিয়ে দিতে বললেন। হুকুম হোল, ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই ঘুমবে।

হিণ্ডলে আর ক্যাথি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল, এবার গোলমাল শান্ত হতে ওরা বাবার পকেটতল্লাশে লেগে গেল। হিণ্ডলের বয়েস চৌদ্দ। সে বাবার পকেট থেকে কয়েকটা ভাঙা টুকরো বার করলে, এক সময়ে ঔটেই

বুঝি ছিল বেহালা। সে কেঁদে উঠলো। আর ক্যাথি যখন শুনলে যে, তার বাবা ঐ অচেনা ছেলেটার দিকে মন দিতে গিয়ে চাবুকখানা হারিয়ে ফেলেছেন, সে মুখ ভেঙচে, ঐ হাবা ছেলেটার গায়ে থুথু ফেলে, তার রসবোধের পরিচয় দিলে। তার বদলে সে তার বাবার কাছ থেকে পেল পুরস্কার, এক প্রচণ্ড চড়। তিনি ওকে স্বভাবটা ভাল করতে বললেন। ওরা তো ওকে কিছুতেই বিছানায় শুতে দেবে না, এমন কি ঘরেও ঠাঁই দেবে না। আমার কি অতো কাণ্ডজ্ঞান ছিল। আমি ওকে সিঁড়ির নিচে রেখে এলাম, ভাবলাম, কাল হয়তো চলেই যাবে। হঠাৎ, নয়তো তাঁর স্বর শুনে বাচ্চাটা মিঃ আর্ণ-শর দরজায় গিয়ে হাজির। তিনি ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে ওকে দেখলেন। কি করে ও এখানে এল' এই নিয়ে তদন্ত শুরু হোল। স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। আমার এই ভীরুতা আর মায়া-মমতার অভাব বলে আমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলা হোল।

হিথক্লিফ এমনিভাবেই পরিচিত হোল পরিবারে। ক'দিন পরে ফিরে এসে দেখলাম (আমার এই নির্বাসন যে চিরস্থায়ী তা আমি মনে করি নি) ওঁরা ওঁর নাম রেখেছেন হিথক্লিফ। ছোট বয়সে ওঁদের এক ছেলে মারা যায় তারই নামে এই নাম। সেই থেকে এই হোল ওর নাম আর পদবী দুই-ই। ক্যাথি আর ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো ; কিন্তু হিণ্ডলে ওকে ঘৃণা করতো। আর সত্যি বলতে কি আমিও করতাম। আমরা ওকে জ্বালাতন করতাম, ওর সঙ্গে নির্মম ব্যবহারও করা হোত ; ওর উপর যে অবিচার হচ্ছে সে বোধ তখন আমার জাগে নি, আর বাড়ির গৃহিণীও ওর উপর অবিচার করলে ওর পক্ষ হয়ে একটা কথাও বলতেন না। মুখ গোমড়া ছেলে ছিল সে, বুঝি বা ধীর। হয়তো বা খারাপ ব্যবহার পেয়ে পেয়ে অনুভূতি আর ছিল না। একটু মুখ বিকৃত না করে, চোখের জল না ফেলে হিণ্ডলের কিল্-চড় ও সহ্য করতো ; আমার চিমটিতে ও শুধু নিশ্বাসই টানতো—মনে হোত হঠাৎ বুঝি ব্যথা পেয়েছে, এর জন্যে কেউ দায়ী নয়। বৃদ্ধ আর্ণ-শ দেখলেন তার ছেলে এই পিতৃহীন অনাথ ছেলেটার উপর অত্যাচার করছে।

তিনি হিথ্‌ক্লিফের সহনশক্তি দেখে আরো রেগে উঠলেন। অদ্ভুত ভালবেসেছিলেন তিনি হিথক্লিফকে, ও যা বলতো বিশ্বাস করতেন (ও বলত খুবই কম কথা, আর তা ছিল সত্য) আর তাকে ক্যাথির চেয়েও বেশি আদর করতেন। ক্যাথি তো ছিল তাঁর আদরের দুলালী।

তাই শুরু থেকেই ও বাড়িতে একটা মন্দ হাওয়া বইয়ে দিলে। তার বছর দুয়েকের ভিতরেই মিসেস আর্ন-শ মারা গেলেন। হিণ্ডলে বাবাকে অত্যাচারী শাসক বলে মনে করতো, বন্ধু তিনি তার ছিলেন না। আর হিথক্লিফ ছিল তার বাপ-মার স্নেহের আর আদরের অংশীদার। এই আঘাত পেয়ে পেয়ে সে তখন ভাবতে শুরু করেছে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। আমি প্রথমটায় তাকে দরদ দেখাতাম; কিন্তু একবার যখন বাচ্চাদের হাম হোল ওদের সেবা শুশ্রূষা আমাকেই করতে হোল। আমি নারীর সেবা আর স্নেহ উজাড় করে দিলাম ওদেরই জন্যে। আমার মতও বদলে গেল। হিথক্লিফ তখন অত্যন্ত অসুস্থ, যখন তার অসুখের বাড়াবাড়ি, সে আমাকে তার শিয়রে বসিয়ে রাখতে চাইত। ওর মনে হোত, আমি ওর জন্যে খুবই করছি; বাধ্য হয়ে যে করছি একথা ও বুঝতো না। যা হোক, একথা বলবো, রোগে ওর মতো এমন শান্ত শিশু কোন সেবিকা দেখেনি। ওদের মধ্যে এই প্রভেদ দেখেই একটু বা গলেই গেলাম। ক্যাথি আর তার ভাই তো আমাকে বড়ই জ্বালাতো, কিন্তু ও ছিল মেষের মতই অভিযোগবিহীন। কিন্তু নম্র তো ছিল না, ওর ঐ কঠোরতাই বুঝি ওকে অতিষ্ঠ করে তুলতে দেয়নি।

ও সেরে উঠলো; ডাক্তার বললেন, আমার সেবায়ই ও সেরে উঠেছে। আমাকে প্রশংসাও করলেন। একটু বা গর্বই হয়েছিল। যার জন্যে এই গর্ব তার উপর বুঝি একটু সদয়ই হয়ে পড়লাম, তাই হিণ্ডলে হারালো তার সর্বশেষ মিত্রকে। কিন্তু তবু হিথক্লিফকে নিবিড় করে পেতে তো চাইনি। মাঝে মাঝে অবাক লাগতো, মনিব ঐ গোমড়া-মুখো ছেলের মধ্যে কি দেখেছিলেন! আমার তো মনে পড়ে না, ও কখনো তাঁর ঐ স্নেহের

প্রতিদানে কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। তবে উপকারীর প্রতি সে উদ্ধত হয়ে ওঠেনি, বরং ও ছিল অচেতন। কিন্তু এওতো জানতো, ও তাঁর মন জুড়ে আছে—ও একটা কথা বললে; সমস্ত বাড়ির লোক শুনতে বাধ্য। এই তো মনে পড়ছে সেই ঘটনা, মেলা থেকে মিঃ আর্ণ-শ কিনে এনেছেন ক'টা ঘোড়ার বাচ্চা। প্রতি ছেলেমেয়েকে একটা করে দিয়েছেন। হিথক্লিফ পেল সবচেয়ে সুন্দরটি, কিন্তু ঘোড়ার একখানা পা খোঁড়া হয়ে গেল দুদিনে। সে হিণ্ডলেকে বললে, এস, তোমার সঙ্গে বদলাবদলি করি। আমারটা ভাল নয়। যদি না দাও তো বাবাকে বলে দেব, এই হপ্তায় তুমি আমাকে তিন তিনবার পিটুনি দিয়েছ, আমার হাতখানাও দেখিয়ে দেব কেমন কালশিরে পড়ে গেছে। হিণ্ডলে জিভ বার করে ভেংচালে, তারপরে ওর কানে ঘুষি মেরে বললে, যা—এখুনি বলে দেগে! এই বলে সে ছুটে খিড়কিতে এল। ও আবার বললে, 'তোমাকে দিতেই হবে! আমি যদি মারের কথা বলি, তুমি সুদসুদ্ধ সেই মার খাবে।' 'ভাগ—কুত্তা।' হিণ্ডলে 'আলু আর খড় ওজন করবার একটা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে তেড়ে এল। কিন্তু হিথক্লিফ দাঁড়িয়ে রইল। সে বললে, ফেলে দাও বলছি! আমি বলে দেব, উনি মারা গেলে তুমি আমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে সে-কথাও বলেছ! দেখি, উনি এখুনি তোমাকে দূর করে দেন কি না!' হিণ্ডলে সেটা ছুঁড়ে মারতেই ওর বুকে গিয়ে লাগলো। ও তখুনি পড়ে গেল বটে, কিন্তু টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। সাদা হয়ে গেছে মুখখানা, নিশ্বাসরুদ্ধ। আমি বাধা না দিলে ও ঠিক মনিবের কাছে যেত, ওর এই চেহারা দেখিয়ে প্রতিশোধ নিত।

নে, নে বেদের বাচ্চা আমার ঘোড়াটা নিয়ে যা—হিণ্ডলে বলে উঠলো, আমি মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছি, পড়ে গিয়ে তোর যেন ঘাড় মটকে যায়। যা-ভাগ বেটা ভিখিরী, তুই তো আমার বাবার সব কিছু লুটপাট করে নিবি, তারপর তাঁকে কলা দেখাবি। ওরে শয়তানের বাচ্চা শয়তান! নে, নে—নিয়ে নে—ও যেন লাথি মেরে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়।

হিথক্লিফ ঘোড়াটাকে খুলে নিতে চললো। সে গিয়ে ঘোড়াটার কাছ দাঁড়াতেই হিণ্ডলে পিছন থেকে এসে ঘোড়ার পায়ের তলায় ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। নিজের আশা পূর্ণ হোল কিনা একবারও তাকিয়ে দেখলো না। সে ছুটে পালিয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ছেলেটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। সে ঘোড়ার সাজ, লাগাম পালটে ফেললে। এবার সে বসলো গিয়ে খড়ের গাদায়। ঐ প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথা পেয়েছে, তারই ধকল সামলে নিলে। যাতে ওর শরীরের ঐ ক্ষতগুলি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পেয়েছে বলে, তার জন্যে পেড়াপিড়ি করতে লাগলাম। ওর তখন সেদিকে মন নেই, যা চেয়েছিল তা পেয়ে গেছে। এমনি ব্যাপারে ও খুব কমই নালিশ করতো, তাই তো ওকে ঠিক প্রতিহিংসা নিতে চায় বলে মনে হোত না। কিন্তু আমি যে প্রতারিত হয়েছিলাম, সে-কথা আপনি ক্রমে শুনতে পাবেন!

পাঁচ

মিঃ আর্ণ-শর শরীরের ভাঙন ধরলো। তিনি ছিলেন সুস্থ, কাজ করতেন, হঠাৎ যেন তাঁর শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। যখন ঘরে থাকতেন তখন তো অতিরিক্ত মাত্রায় খিটখিটে হয়ে উঠতেন। একটুতেই চটে উঠতেন, আর নিজের হুকুমের এক চুল এদিক-ওদিক হলে তো পাগল হয়ে যেতেন। এমনি হোত, যখন কেউ তাঁর উপর কথা কইত; অথবা তাঁর প্রিয়পাত্রকে শাসন করতে চাইত। ওকে কেউ একটি কথা বলবে না এই ছিল তাঁর আদেশ। কি করে যেন তাঁর মনে হয়েছিল যে, তিনি হিথক্লিফকে ভালবাসেন বলে আর সবাই' তাঁকে ঘৃণা করে, তার মন্দ করতে চায়। ছেলেটির পক্ষে এ হোল এক মস্ত অসুবিধে। আমাদের মধ্যে যারা ওর উপর সদয় ছিলাম, তারা তো কখনো মনিবকে চটাতে চাইতাম না। তাঁর এই পক্ষপাতিত্বে আমরা ধুয়ো ধরতাম; আর সেই ধুয়ো ধরায় ছেলেটির অহঙ্কার আর মেজাজ দিনদিন বিশ্রী হ'য়ে

উঠছিল। দু-তিনবার বাবার সুমুখেই হিণ্ডলের ঘৃণার প্রকাশ দেখা গেছে, তিনিও চটে উঠেছেন। নিজের লাঠি তুলেছেন ওকে মারতে, পারেন নি বলে রাগে থরথর করে কেঁপে উঠেছেন। অবশেষে আমাদের অঞ্চলের পাদ্রীর এক সহকারী (হাঁ, সহকারী ছিলেন বই কি! তিনি খুদে লিণ্টন আর আর্ণ-শদের পড়িয়ে আর নিজের জমিতে নিজে চাষ করে খেয়ে-পরে থাকতেন) পরামর্শ দিলেন, হিণ্ডলেকে কলেজে পাঠানো হোক। মিঃ আর্ণ-শ রাজি হলেন, কিন্তু মনের উষ্মা তখনো যায়নি। বললেন, হিণ্ডলেটা অপদার্থ, ও যেখানেই যাক জীবনে ওর কিছু হবে না।"

আশা ছিল, এবার শান্তি ফিরে আসবে, মনিব যে একটা সৎকাজ করে এমন হাঙ্গামা পোয়াবেন একথা কে ভেবেছিল! বার্ধক্যের অসন্তোষ তাঁকে পেয়ে বসলো, তার উপরে পারিবারিক বিরোধে তিনি কাবু হয়ে পড়লেন। কিন্তু তবুও এক রকম দিন কাটতো, কিন্তু ক্যাথি আর জোসেফ তাতে বাধ সাধলে। জোসেফকে আপনি বোধ হয় দেখেছেন, তাকে দেখে একেবারে বিরক্তি ধরে যায়, বাইবেল ঘেঁটে সে চলে, পড়শীকে গালাগাল দেয়। মিঃ আর্ণ-শর উপরে তার ছিল বেশ প্রভাব। মনিব যত দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন, ততই তার প্রতিপত্তি বাড়তে লাগলো। আত্মার মঙ্গল নিয়ে সে তাঁকে নির্মমভাবে বলতে লাগলো, তিনি উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠলেন। আবার ছেলেমেয়েদের শাসন-ব্যাপারেও আরো কড়া হবার পরামর্শ দিলে হিণ্ডলে যে একেবারে বয়ে গেছে একথা সেই তাঁকে বোঝালে, রাতের পর রাত ধরে হিথক্লিফ আর ক্যাথেরিনের বিরুদ্ধে কত কথাই নিয়মিত বলে গেল; সব সময়েই সে ক্যাথেরিনের উপর বেশি দোষ চাপিয়ে আর্ণ-শর দুর্বলতায় ইন্ধন যোগাতে লাগলো।

হাঁ, একথা বলবো যে ক্যাথেরিনের মতো কোনো খুদে মেয়ের এমন ভাবভঙ্গী আমি আর কোথাও দেখিনি। দিনে অন্তত পঞ্চাশবার কি তারও বেশি ও আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতো। সেই যখন নীচে নেমে আসতো সেই থেকে ঘুমতে যাওয়া পর্যন্ত আমরা এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম

না। সব সময়েই ওর মন ছিল খুশিতে একেবারে টৈটুম্বুর আর জিভ তো সব সময়েই চলতো—গান গাইতো, হাসতো, সবাই ওর সুরে সুর না মেশালে জ্বালিয়ে মারতো। একেবারে বুনো মেয়ে ছিল ও, দুষ্ট মেয়ে—কিন্তু কি তার দুটি চোখ—অমন চোখ ও অমন হাসি আর অমন হাল্কা চলন ভঙ্গী এ অঞ্চলে মিলতো না। ও যে কারো ক্ষতি করতে চাইতো তা নয়; যখন সে সত্যিই কাঁদাত সে আবার সান্ত্বনা দিতে বসে যেত। হিথক্লিফ ছিল ওর সবচেয়ে প্রিয়। ওকে হিথক্লিফের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেই আমরা ওর চরম শাস্তি দিতাম। অথচ ওর জন্যে ও আমাদের সকলের চেয়ে বেশি গালাগালই খেত। খেলায় ওর বড় সাধ ছিল গৃহিণী হয়; হাত যেমন চটপট চলতো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মুখে হুকুম করতো। আমাকেও ও হুকুম করতো, কিন্তু আমার ফাইফরমায়েস খাটা বা হুকুম মানা সহ্য হোতনা তা ওকে সেকথা জানিয়ে দিয়েছিলাম।

কর্তা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসি-তামাসা কখনো করতেন না। তিনি ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ; গম্ভীর। ক্যাথেরিন বুঝতো না ওর বাবা অসুস্থ অবস্থায় আগের চেয়ে আরো তিরিক্ষি মেজাজের হয়ে উঠেছেন। তাঁর বক্র ভৎর্সনায় ওর দুষ্টামি আরো বেড়ে যেত, ও তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলে আনন্দ পেত।

আমরা যখন সবাই মিলে ওকে গাল দিতাম, ও সবচেয়ে খুশি হোত। উদ্ধত দৃষ্টি মেলে ও আমাদের তুচ্ছ করতো। ওর বাবা যা সবচেয়ে ঘৃণা করতেন—তাই ও করে বসতো। ওর ঐ ঔদ্ধত্যের ভান তিনি সত্য বলেই মনে করতেন। তাঁর মনে হোত, তাঁর দয়া মায়ার থেকে ওরই প্রভাব হিথক্লিফের উপর ঢের বেশী। ছেলেটা ওর কথায় না করতে পারতো হেন কাজ নেই, আর তাঁর কথা শুনতো তাঁর খেয়াল-খুশি মতো। ক্যাথি সারাদিন বাপের সঙ্গে এমনি দুর্ব্যবহার করে মাঝে মাঝে রাতে আসতো আদর আবদারে তার ক্ষতিপূরণ করতে। বুড়ো তখন বলতেন, না ক্যাথি, আমি তো তোকে ভালবাসিনা। তুই তোর ঐ ভাইটার চেয়েও খারাপ। যা, ঈশ্বরের

কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নে। তোকে যে আমরা মানুষ করেছি এর জন্যে আমাকে আর তোর মাকে ভুগতে হবে বইকি। প্রথমে তো ক্যাথি একথা শুনে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলতো, তারপর বার বার আক্রমণে সে কঠোর হয়ে উঠলো। সে যে অপরাধী একথা স্বীকার করতে বললে সে হেসেই উড়িয়ে দিত, ক্ষমা চাইতেও সে যেত না।

সবশেষে এল সেই প্রহর, যখন আর্ণ-শর পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশার পালা সাঙ্গ হয়ে গেল। আগুনের ধারে বসে অক্টোবরের এক সন্ধ্যেয় তিনি নিঃশব্দে মারা গেলেন। বাড়ির চারদিকে শোঁ শোঁ করে সেদিন বইছিল প্রবল বাতাস, চিমনির ভিতরে তুলেছিল তর্জন-গর্জন। সে এক বুনো হাওয়া, ঝোড়ো হাওয়া, তবু ঠাণ্ডার স্রোত নামলো না। আমরা সবাই সেদিন এক জায়গায় জড়ো হয়ে ছিলাম। আমি দূরে বসে বুনছিলাম, জোসেফ পড়ছিল বাইবেল; ক্যাথির অসুখ, তাই সে চুপ করে বাপের হাঁটুর উপর মাথা রেখে বসেছিল, আর হিথক্লিফ মেঝেয় শুয়ে ছিল ওর কোলেই মাথা রেখে। তন্দ্রার আগে মনিবের কথা আমার মনে পড়ে। তিনি ক্যাথির সুন্দর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন—ওকে শান্ত দেখলে তাঁর ভারী ভাল লাগতো। বললেন, 'ক্যাথি, সব সময়ে এমনি লক্ষ্মী মেয়েটি হতে পার না কেন? ক্যাথি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হেসে বললে, 'বাবা' তুমিই বা সব সময়ে ভাল মানুষটি হতে পার না কেন?' তাঁকে চটে উঠতে দেখে সে অমনি হাতে চুমু খেলে, গান গেয়ে বাপকে ঘুম পাড়াতে বসে গেল। খুব আস্তে ও গাইছিল গান, বাপের আঙুল ওর হাতের মুঠো থেকে খসে পড়লো, মাথাটা তাঁর ঝুলে পড়লো বুকের উপর। আমি ক্যাথিকে চুপ করতে বললাম, নড়লে-চড়লে উনি হয়তো জেগে উঠবেন। পুরো আধঘণ্টা কেটে গেল চুপচাপ করে, আরো কতক্ষণ কাটতো কে জানে, এমন সময় জোসেফ তার পড়া শেষ করে বললে মনিবকে সে জাগিয়ে দেবে। শুতে যাবার সময় হয়ে গেছে। সে এগিয়ে গিয়ে ডাকলে, কাঁধে হাত দিলে, কিন্তু উনি তো জেগে উঠলেন না। ও মোমখানা নিয়ে তাঁর মুখের দিকে ভাল করে তাকালে। আলো নামিয়ে

রাখলে এবার, আমার মনে হোল, কি যেন একটা ঘটে গেছে। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে কানে কানে বললাম, যাও, উপরে যাও, গোলমাল কোরোনা—

ক্যাথি বললে, 'বাবার কাছে বলে তবে তো যাব।' আমরা বাধা দেবার আগেই সে তার গলা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। বেচারী অমনি বুঝতে পারলে তিনি আর বেঁচে নেই। সে চেঁচিয়ে উঠলো, দেখ, দেখ হিথক্লিফ বাবা আর নেই-নেই! তারপর দুজনের সে কি বুক ফাটা কান্না।

ওদের কান্নায় আমিও যোগ দিলাম; জোসেফ বললে, যিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর জন্যে কেঁদে কি হবে। সে জোব্বাটা গায়ে চাপিয়ে গিমারটনে ডাক্তার আর পাদ্রীর জন্যে ছুটতে বললে। বুঝতে পারলাম না, এখন ওদের ডেকে কি হবে। যাহোক ঝড় বাদলার ভিতরেই ছুটে গেলাম, শুধু ডাক্তারকে নিয়ে ফিরলাম, পাদ্রী বললেন ভোরে আসবেন। জোসেফকে সব কথা খুলে বলতে বলে ছুটলাম ছেলেমেয়ের ঘরে। ওদের দরজা তখনও খোলা। রাত দুপুর কখন পার হয়ে গেছে, এখনো ওরা শোয়নি। কিন্তু এখন একটু শান্ত, আমার আর সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই। আমার চেয়ে ভাল করেই ওরা দুজনে দুজনের সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেয়েছে। নিষ্পাপ মনের কথা দিয়ে ওরা যে স্বর্গ রচনা করলো, কোন পাদ্রী কি তার চেয়ে ভাল করে সেই স্বর্গের ছবি আঁকতে পারবেন? ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলাম আর ওদের কথা শুনছিলাম। মনের কামনা উৎসারিত হয়ে পড়লো, আহা, আমরা সবাই যেন সেখানে সেই স্বর্গে একদিন নির্বিঘ্নে পৌছতে পারি।

ছয়

অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় এল হিণ্ডলে। সে অবাক করে দিলে—এক বৌ নিয়ে এসে হাজির। পাড়া-পড়শীদের গল্প শুরু হয়ে গেল। সে কে, কোথায় বাড়ি, বৌ সে-কথা আমাদের কিছুই বললে না। হয়তো বৌয়ের টাকাকড়ি বা এমন বংশ পরিচয় নয় যে, বলতে পারে। তা না হলে হিণ্ডলে কি বিয়ের কথা বাপের কাছে গোপন করতো।

সে এমন কেউ নয় যে তার জন্যে বাড়িসুদ্ধ সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠবে। বরং বাড়িতে পা দিয়ে যা দেখলে, তাতেই সে খুশি, যা ঘটলো চারদিকে তাতেই তার আনন্দ ; শুধু নিরানন্দ নিয়ে এল অন্ত্যেষ্টির আয়োজন আর শবযাত্রীরা। ওর ভাব দেখে মনে হতো, ও বেহদ্দ বোকা ; নিজের ঘরে একা যাবেনা, আমাকে সঙ্গে যেতে হোত, তা সে ছেলেমেয়েদের পোষাক পরাতে বা যে-কোন কাজে ব্যস্ত থাকি না কেন। নিজের ঘরে গিয়ে বসে বসে কাঁদতো, আর শুধাতো, 'ওরা কি চলে গেছে?' তারপরে নিজের এই আবেগের ব্যাখ্যা করতে বসতো। কালো রং দেখলে নাক ওর এমনি হয়। কাঁপুনি, চমকানি, তারপরে তো কান্না। আমি কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বললে, ও নিজেই জানে না, কিন্তু মরতে ওর ভারী ভয়। আমারই মতো আর কি! বড় রোগা মেয়ে কিন্তু বড় ছেলেমানুষ ; রঙ ওর ফর্সা, চোখ দুটো ঝলমলে যেন একখানা হীরে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ও ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলতো ; হঠাৎ সামান্য শব্দ শুনলেও কেঁপে কেঁপে উঠতো ; আবার মাঝে মাঝে উঠতো কাশির দমক। কিন্তু লক্ষণগুলির মানে কি জানতাম না বলেই ওর উপর দরদ দেখাব এমন প্রবৃত্তি আমার হয় নি। মিঃ লকউড, আমরা এখানে বিদেশীদের সাধারণত অন্তরঙ্গ হতে দিইনা— ওরা অন্তরঙ্গ হলে অবশ্য আলাদা কথা।

ছোট আর্ণ-শ এই তিন বছরের অনুপস্থিতিতে বেশ বদলে গিছলো। সেও রোগা হয়ে গেছে, জৌলুস গেছে, পোষাক-আষাকও অন্যধরণের। ফিরে আসার দিনই জোসেফ আর আমাকে সে ডেকে বললে, আমরা যেন এখন থেকে পিছনের রান্নাঘরে গিয়ে থাকি, বাড়িটা ওর জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। বৈঠকখানার জন্যে ও একটা ছোট্টঘরে কাগজ লাগিয়ে গালচে পেতে নিতে পারতো, কিন্তু ওর বৌয়ের ঐ ঘরের সাদা মেঝে আর আগুনের কুণ্ডটার চেহারা দেখে ভাল লেগেছে। তাদের চাই মস্ত পায়চারি করবার জায়গা।

নতুন আলাপীদের ভিতরে ননদকে পেয়ে বৌ খুশি হয়ে গেল।

ক্যাথেরিনের কাছে গিয়ে আলাপ করল, তাকে চুমু খেলে, তাকে নিয়ে ঘুর্-ঘুর করে বেড়ালে, প্রথমে তাকে এককাঁড়ি উপহারও দিয়েছিল। কিন্তু স্নেহের ধারা শীঘ্রই এল ক্ষীণ হয়ে, ক্লান্তি এসে দেখা দিল। তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে এল। হিণ্ডলেও অত্যাচারী হয়ে উঠলো। ওর সামান্ত কথায় হিথক্লিফকে যে ওর অপছন্দ তা বোঝা যেত, ওর সেই পুরানো দিনের ঘৃণাই মনে পড়িয়ে দিত। সে নিজেদের থেকে আলাদা করে ওকে চাকর-চাকরাণীর দলে ঠেলে দিলে; গৃহশিক্ষকের কাছে তার পড়াশুনা বন্ধ হোল; ও তার চেয়ে বাইরে খাটতে যাবে, এই হুকুমই জারি করলে! আর সবার মতোই কঠোর পরিশ্রম করতে তাকে বাধ্য করলো।

হিথক্লিফ প্রথমে তার এই অবনতি মেনে নিয়েছিল। ক্যাথি তাকে সে-শিক্ষা দিয়েছিল। সে তার সঙ্গে মাঠে কাজ আর খেলা দুই-ই করতে যেত। আদিম মানুষের মতোই কঠোর দুর্দাম জীবন কাটাবে এই ছিল ওদের দুজনের কথা। ছোকরা মনিব ওদের সম্বন্ধে উদাসীন, তাই ওরাও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। রোববারে ওরা গীর্জ্জায় যায় কিনা তাও সে দেখতো না। শুধু গৃহ-শিক্ষক আর জোসেফ ওদের এই গরহাজিরি নিয়ে ওকে মন্দ বলতো। আর তখুনি ওর মনে পড়ে যেত—হিথক্লিফকে বেত মারার হুকুম দিতে হবে; আর ক্যাথেরিনের বিকেল, কি রাতে খাওয়া বন্ধ হবে। কিন্তু ওদের পরম আনন্দ তখন ভোরে জলায় চলে আসায়, আর সারাদিন সেখানে কাটানোয়। তারপরে শাস্তি হয়ে যাবে হালকা, সে তো হাসিরই ব্যাপার হবে। গৃহ-শিক্ষক ক্যাথেরিনকে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ মুখস্ত করতে বললেন, জোসেফের হিথক্লিককে মারতে মারতে হাতে ব্যথা ধরে যেত; কিন্তু ওরা এক সঙ্গে হলেই সে-কথা ভুলে যেত—অথবা যখন ওরা প্রতিশোধের ফন্দি আঁটতো, তখন কতবার ওদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা দিনে দিনে বাড়তে দেখে আমি আপন মনে কেঁদেছি, কিন্তু ওই দুটি বাধা বন্ধহীন জীবের উপর আমার যতটুকু অধিকার আছে, তাও হারাব বলে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি। সেদিনটা রোববার।

সন্ধ্যেবেলা ওদের বসবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল। হয়তো গোলমাল বা সামান্য দুষ্টামি করেছিল। ওদের যখন খেতে ডাকতে গেলাম, দেখি ওরা কোথাও নেই। বাড়িখানার উপর নীচ তন্নতন্ন করে তল্লাশ করলাম আমরা, আস্তাবল উঠোন বাদ পড়লো না, কিন্তু ওরা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। হিণ্ডলে এবার চটে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিতে বললে, আর সবাইকে শাসালে, কেউ যেন সে-রাতে ওদের বাড়ির ভিতর ঢুকতে না দেয়। বাড়ির সবাই গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। আমি ভাবনায় শুতে পারলাম না, নিজের কামরার জানালা খুলে ঝুঁকে পড়ে কান পেতে রইলাম। বৃষ্টি পড়ছিল। নিষেধ থাক, তবু ফিরে এলে ওদের আমি বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসবো। কিছুক্ষণের ভিতরেই পথে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফটকের ভিতর দিয়ে লণ্ঠনের আলোর রেখা ঝিকিমিকি দিয়ে গেল। মাথায় শাল জড়িয়ে ছুটে গেলাম। আর কেউ যাতে না জেগে ওঠে তাই সাবধান করে দিতে হবে ওদের। ওকে একা দেখে চমকে উঠলাম।

ক্যাথেরিন কোথায়? তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম। কোন বিপদ আপদ হয় নি তো? ও জবাব দিলে, থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জে আছে। আমিও গিছলাম, কিন্তু আমাকে থাকতে দেবার মতো তাদের ভদ্রতায় কুলোল না। বললাম, ঠিক হয়েছে! কি জন্যে থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জে গিছলে? 'নেলি, দাঁড়াও, ভিজে পোষাক বদলে নিই, তার পর বললে। ওকে বার বার সাবধান করে দিলাম, ও যেন মনিবকে না জাগায়। ও যখন পোষাক ছাড়ছিল, আমি বাতিটা নিবিয়ে দেবার অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও বলতে লাগলো।

কাপড়-কাচা থেকে রেহাই পেতেই আমি আর ক্যাথি বেরিয়ে পড়েছিলাম, দূর থেকে গ্রেঞ্জের আলো দেখতে পেলাম। ভাবলাম, যাই দেখে আসি লিণ্টনরা রোববারে সন্ধ্যেটা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কেমন কাটাচ্ছে, আর ওদের বাপ-মা কেমন খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, হাসছেন আর গান গাইছেন আগুনের ধারে বসে। ওরা কি তাই করে ভাবছ নাকি? ওরা কি ধর্মের

উপদেশ পড়ে আর চাকরের হাতে পিটুনি খায়, আর বাইবেলের ঝুড়ি ঝুড়ি নাম মুখস্ত করে?

বললাম, তা হবে কেন? ওরা ভাল ছেলেমেয়ে। তোমাদের মন্দ স্বভাবের জন্যই তো ঐ ব্যবহার পাও। 'দেখ নেলি, আর ও বুলি আওড়াবে না—ও আমি ঢের ঢের শুনেছি। তারপরে শোন হাইটস্ থেকে পার্কে আমরা না থেমেই ছুটে গেলাম—ক্যাথেরিন কিন্তু ছুটে একেবারে কাবু হয়ে পড়লো; ওর খালি পা ছিল কিনা। কাল ঐ হাওড়ের ভিতর গিয়ে তোমাকে ওর জুতো খুঁজে নিয়ে আসতে হবে। ভাঙা বেড়ার উপর দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে আমরা তো চললাম, তারপর এসে একেবারে বসবার ঘরের জানালায় বসানো একটা ফুলের টবের ভিতরে পা রেখে দাঁড়ালাম। আলো আসছিল। শার্সি ওরা বন্ধ করে নি, পর্দাও আধ-তোলা। ওখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। আহা চমৎকার! লাল গালচে পাতা ঘরে, লাল-গদি আঁটা চেয়ার, লাল বনাত মোড়া টেবিল, আর ছাদ তো একেবারে ঝকঝকে শাদা, তাতে সোনালী পাড় টানা। মাঝখানে ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন, সেখানে কাঁপছে সারি সারি বাতি। বুড়ো বুড়ি ঘরে নেই; এডগার আর ওর বোন জাঁকিয়ে বসেছে। ওরা কিন্তু সুখী নয়! তোমার ভাল ছেলেমেয়েরা কি করছিল ভাবতো? ইসাবেলার বয়েস বোধ হয় এগারো হবে, ক্যাথির চেয়ে বছরখানেকের ছোট—ঘরের একপাশে পড়ে পড়ে কাঁদছিল—মনে হচ্ছিল ডাইনীরা যেন গন্‌গনে লাল ছুঁচ ওর পায়ে বিঁধিয়ে দিয়েছে। এডগার আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, আর টেবিলের মাঝখানে বসে এক খুদে কুকুর থাবা দিয়ে আঁচড়াচ্ছে আর কেঁউ কেঁউ করছে। ওদের দুজনের কথা থেকে জানলাম, ঐ কুকুর নিয়ে ঝগড়া। হাঁদার দল। এতেই নাকি ওদের আনন্দ! কে কুকুরটার লোম গোছা করে বেশী ধরতে পারে। কিন্তু এত ঝগড়ার পর এখন দুজনেই আর ধরতে চাইছে না—তাই এই কান্না। আমরা দুজনে তো এমন তুচ্ছ ব্যাপারে হেসেই উঠলাম। ওদের আমরা ঘেন্না করি। কখনো দেখেছ, ক্যাথেরিন যা চায়, তার উপর আমার লোভ পড়েছে? আর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে কঁকিয়ে কখনো আমাদের খেলা

করতে দেখেছো? থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জে এডগাররা যেভাবে আছে, আমি তো ওভাবে থাকতে রাজি নই—জোসেফকে যদি একেবারে উঁচু থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারতাম, বা হিণ্ডলের রক্তে যদি বাড়ির সামনেটা রাঙিয়ে দিতে পারতাম—তাহলেও রাজি হতাম না।

চুপ চুপ! ওকে বাধা দিলাম, হিথক্লিফ এখনো তো বললে না, ক্যাথেরিন কেন ওখানে রয়েছে?

সে উত্তর দিলে, আমরা হেসে উঠলাম, সে কথা তো বলেছি। লিণ্টনরা আমাদের হাসি শুনতে পেল। আর একই সঙ্গে তীরের মতো ওরা 'দরজার দিকে ছুটে চলে গেল। সে কি চেঁচানি ওদের, মাগো, বাবা গো, এস গো! ওরা সত্যিই হাউমাউ করে উঠলো। ওদের ভয় দেখাবার জন্যে আমরা দুজনে বিদ্‌কুটে শব্দ করতে লাগলাম। কারা যেন দরজা খুলছে। তাড়াতাড়ি জানালা থেকে লাফিয়ে পড়লাম। মনে হোল, পালাই! ক্যাথির হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছি, হঠাৎ ও পড়ে গেল। ও ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, হিথক্লিফ, তুমি পালাও! ওরা ডালকুত্তা ছেড়ে দিয়েছে, দেখছ না আমাকে ধরেছে! সত্যিই নেলি, ঐ শয়তানটা ওর হাঁটু কামড়ে ধরেছে, ওর গজরানি শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু ক্যাথি চেঁচায়নি। পাগলা ষাঁড়ের শিঙের সামনে পড়লেও ও চেঁচাবে না—তেমন মেয়ে ও নয়। আমি কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলাম। এমন গালাগাল দিলাম যে, পৃথিবীর যে কোন শয়তানও কাবু হয়ে পড়ে। একটা পাথর নিয়ে শয়তানটার গলায় পুরে দিলাম। এমন সময় জানোয়ারের মতো একটা শয়তান লণ্ঠন নিয়ে ছুটে এল চেঁচাতে-চেঁচাতে—লে-লে! কিন্তু শয়তানটা কি করছে দেখে লোকটা সুর বদলালে। কুকুরটার গলা টিপে ধরা হোল, ওর মস্ত, লাল জিভখানা আধফুটখানেক মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো, ঠোঁট দিয়ে ঝরলো লালা। লোকটা ক্যাথিকে তুলে নিলে। ক্যাথি তখন বিবশ, ভয়ে নয়, ব্যথায়। সে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। আমি এর শোধ নেব বলতে বলতে পেছু পেছু চললাম। লিণ্টন ফটক থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'কি হে রবার্ট, কি শিকার জুটলো'? 'স্কালকার (কুকুরটার

নাম) এক খুদে ছুঁড়িকে বাগিয়েছে কর্ত্তা একটা বাচ্চা ছোঁড়াও আছে। ডাকাতরা তো অমনি করে। এমনি বাচ্চাদের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে নামিয়ে দেয়, তারপর সবাই ঘুমুলে দরজা খুলে দিতেই ওরা আমাদের সহজেই মেরে ফেলতে পারবে। এই বেটা চোর, ডাকু ! চুপ কর্ ! এর জন্যে ফাঁসি কাঠে ঝুলবি ! কর্ত্তা, আপনার বন্দুকটা ফেলে রাখবেন না ! আচ্ছা হাঁদারাম বুড়োটা ! বললে, না, না রবার্ট—ঐ পাজিগুলো জানে কাল আমার খাজনা তারিখ। ওরা তাই আমাকে কায়দা করতে এসেছিল। নিয়ে এস, ভিতরে নিয়ে এস, ওদের একটু আদর-অভ্যর্থনা করি। জন, শেকলটা খুলে দাও ! কুকুরটাকে একটু জল খাওয়াও। হাকিমের বাড়িতে চড়াও করার মজা দেখাচ্ছি ! স্পর্দ্ধা দেখ তো ! মেরী—এদিকে এস, আরে ভয় পেও না—একরত্তি এক বাচ্চা—অথচ মুখে যেন শয়তানি মার্কা মারা—ওকে এখনি ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিলে দেশের উপকার হয় কি না বলতো ? ঝাড়লণ্ঠনটার কাছে ও আমাকে টেনে নিয়ে এল। মিসেস লিণ্টন চশমা নাকে লাগিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠলেন। ঐ ভীতু ছেলেমেয়েগুলোও কাছে এল। ইসাবেল তো-তো করে বললে—উ-কি-ভয়ানক ! বাপি, ওকে সেলারে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখ। ঐ যে বেদেটা আমার পাখীটা চুরি করে নিয়ে গেল, ঠিক তার বাচ্চাটার মতো দেখতে। তাই না এড্গার ?

ওরা যখন আমাকে দেখছে, এরই মধ্যে ক্যাথি সুস্থ হয়ে উঠলো। ওর শেষ কথাটা শুনেছিল, তাই ও হেসে উঠলো। এড্গার লিণ্টন ভাল করে দেখে ওকে চিনতে পারলে—হাঁ সে আক্কেলটুকু ওর শেষটায় হোল। গীর্জেয় তো ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তবে আর কোথাও বড় একটা ওদের দেখা যায় না। সে মাকে বললে, এ যে আমাদের মিস আর্ন-শ ! দেখ, দেখ, স্কালকার ওকে কামড়ে কি করেছে—ইস পা দিয়ে কত রক্ত ঝরছে !

মিস, আর্ন-শ ! কি বাজে বকছিস ? মা চেঁচিয়ে উঠলেন। একটা বেদের বাচ্চার সঙ্গে মিস আর্ন-শ ঘুর ঘুর করে বেড়াবে ! কিন্তু বাছা মেয়েটার যে জন্মের মতো পা খানা খোঁড়া হয়ে গেল !

এ ওর ভাইয়ের অন্যায়, ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে মিঃ লিণ্টন বলে উঠলেন, লিণ্ডারের (পাদ্রীর সহকারী—ক্যাথেরিনের গৃহশিক্ষক) কাছ থেকে শুনেছি, একেবারে মেয়েটা বয়ে যাচ্ছে? কিন্তু এটা কে? এমন সঙ্গী ও কোথা থেকে জোটালে। ওঃ হো, এবার বুঝতে পেরেছি। আমার প্রতিবেশী সেই যে, যেটিকে লিভারপুল-ফেরৎ নিয়ে এসেছিলেন সেই খুদে লস্কর আর কি—মার্কিনী কি স্পানিশই হবে।

বৃদ্ধা মন্তব্য করলেন, যাই হোক, বদ ছেলে, একটা ভদ্র পরিবারের পক্ষে একেবারে যোগ্য নয়! ওর কথাগুলো শুনেছ লিণ্টন? আমার ছেলেমেয়েরা ঐ কথা শুনেছে বলে আমি তো ঘাবড়ে যাচ্ছি।

নেলি, রাগ কোরো না—আমি তখন গাল পাড়ছি তো পাড়ছিই। রবার্ট আমাকে নিয়ে গেল। আমি তো ক্যাথিকে ফেলে যাব না। রবার্ট আমাকে বাগানে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে আমার হাতে লণ্ঠনটা দিয়ে বললে, মিঃ আর্ণ-শকে আমার কথা জানাতে হবে তার পরে চলে যেতে বললে। দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেল। পর্দা তখনো সরানো রয়েছে, আমি গোয়েন্দার মত নজর রাখলাম। যদি ক্যাথেরিন ফিরে আসতে চায় আর ওরা না দেয়, তাহলে ঐ বড় বড় কাঁচের শার্সি ভেঙে চুরমার করে দেব। দেখি, ওরা ওকে ছেড়ে দেয় কিনা! ক্যাথেরিন তো চুপ করে সোফায় বসে আছে, গয়লা-বৌ-এর ধূসর রাঙা জোব্বাটা খুলে দিয়েছেন মিসেস লিণ্টন, মাথা নাড়ছেন, বোধহয় ওকে ভৎর্সনাই করছেন। ও তরুণী ভদ্রমহিলা, তাই আমার আর ওর উপরে ব্যবহারে এত তফাৎ। এবার পরিচারিকা নিয়ে এল গরম জলের পাত্র, ওর পা ধুইয়ে দিল। মিঃ লিণ্টন খানিকটা মিষ্টি মদে জল মিশিয়ে গেলাসে করে এনে দিলেন, ইসাবেলা এক থালা মিষ্টি এনে ওর কোলের উপর উজাড় করে দিলে। এডগার তো হাঁ করে দেখছে। ওরা এবার গা মুছিয়ে, ওর সুন্দর চুল আঁচড়ে ফিটফাট করে দিলে, এক জোড়া মস্ত চটি জুতো পরিয়ে এবার ওকে আগুনের ধারে নিয়ে এল, ওকে বেশ হাসিখুশীই দেখলাম। বাচ্চা কুকুর আর স্কালকারকে ভাগ করে দিচ্ছে মিষ্টি, আর ওর নাক ধরে টেনে দিচ্ছে—

লিণ্টনদের অর্থহীন নীল চোখে জ্বালিয়ে তুলেছে উৎসাহ—ওর নিজের সুন্দর মুখের অস্পষ্ট ছায়াই বুঝি পড়েছে। ওরা যেন ওকে তারিফ করতে গিয়ে বোকা হয়ে গেছে—ওদের চেয়ে ও কত উঁচুতে—সকলের চেয়ে—তাই না নেলি?

ওর গায়ে চাপা দিয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি তো বোঝ না, ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে। হিথক্লিফ, তোমার আর শিক্ষা হবে না। হিণ্ডলে তো এক কাণ্ডই করে বসবে। ভাবতেও পারিনি আমার কথা এত বেশি করে ফলে যাবে। এই অভিযানে আর্ণ-শ রেগে আগুন হয়ে উঠলো। মিঃ লিণ্টন পরের দিন এলেন। তিনি নিজের পরিবারকে কোন পথে পরিচালনা করছেন, তার এমন ব্যাখ্যা করলেন যে, হিণ্ডলেকেও সচকিত হয়ে উঠতে হোল। হিথক্লিফ পিটুনি খেল না, কিন্তু তাকে বলা হোল, ক্যাথেরিনের সঙ্গে কথা বললে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর মিসেস আর্ণ-শ তাঁর ননদ বাড়ি ফিরলে তার ভার নেবেন বলে কথা দিলেন। তবে জোর করে নয়, কৌশলে। জোর করলে সে তো অসম্ভবই হবে।

৭

ক্যাথি থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জে পাঁচ সপ্তাহ রইল। তা বড়দিন অবধি তো বটেই। এর মধ্যে হাঁটু একেবারে সেরে গেছে, স্বভাবেও উন্নতি হয়েছে। মনিবানী এর মধ্যে যাচ্ছেন আসছেন, সংস্কারের পরিকল্পনা কাজে খাটাতে শুরু করলেন। সুন্দর পোষাক আর তোষামদে তার আত্মমর্যাদা বাড়াতেও চেষ্টা করলেন। সেও পোষাক নিতে দ্বিধা করলো না। সেই বুনো, মাথায় টুপী নেই, শুধু বাড়িময় লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, এমনি জংলী মেয়ের বদলে সুন্দর কালো টাট্টুঘোড়া থেকে নামলো এক মহিলা। পালকওলা টুপীর আড়াল থেকে সোনালী চুল গোছা গোছা বেরিয়ে আছে, আর লুটিয়ে পড়া তার পোষাক হাত দিয়ে তুলে তুলে নিচ্ছে, যাতে ঘরে স্বচ্ছন্দ গতিতে আসতে পারে। হিণ্ডলে ওকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, আরে ক্যাথি, তুমি তো ভারি সুন্দর হয়েছ!

আমি তো চিনতেই পারিনি—একেবারে একটা ভদ্রমহিলা। ফ্রান্সেস, ইসাবেলা লিণ্টনের সঙ্গে তো ওর তুলনাই হয় না—তাই না? ওর স্ত্রী বললে, ক্যাথেরিনের পোষাক খুলে দাও। না-না তোমাকে কিছু করতে হবে না—তোমার চুলের গোছা নষ্ট হয়ে যাবে—আমিই টুপীটা খুলে দিচ্ছি।

আমি পোষাক খুলে নিলাম, চমৎকার বোনা রেশমের ফ্রক নীচে, সাদা পাজামা, আর বার্ণিস করা জুতো। কুকুরগুলো যখন ওকে দেখে লাফিয়ে ছুটে এল, চোখ ওর ঝলমল করে উঠলো খুশিতে, ও ওদের ছুঁলে না, কি জানি ওরা যদি সোহাগ করে ওর পোষাক নষ্ট করে দেয়। আমাকেও আলতো করে চুমু খেল। বড়দিনের পিঠে তৈরী করতে গিয়ে আমার গা তো ময়দায় মাখামাখি। আমাকে জড়িয়ে ধরা তো ঠিক নয়। এবার ও হিথক্লিফকে খুঁজলো। মিঃ আর মিসেস্ হিথক্লিফ প্রতীক্ষায় রইলেন উদগ্রীব হয়ে। দুই বন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে কি না এতেই ওঁরা বুঝতে পারবেন।

প্রথমে হিথক্লিফকে আবিষ্কার করাই দায় হোল। আগে যদি ও অবহেলা পেত, ক্যাথেরিনের অনুপস্থিতিতে ওর সে অবহেলা এখন দশগুণ বেড়ে গেছে। আমি ছাড়া ওকে সপ্তাহে একদিনও স্নান করতে বলার মানুষ নেই। ওর এই বয়সে সাবান জলের উপর বিতৃষ্ণা তো থাকবেই। ওর কাপড় চোপড় ধুলোকাদায় মাখা—তিনমাস ধোপিখানায় যায় নি, ওর ঘন চুলে পড়েনি চিরুণী, মুখ আর হাত তো একেবারে নোংরা। অমন এক সুন্দরীকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে ও হয়তো বেঞ্চির নীচেই লুকালো। ওতো আশাই করতে পারবে না যে সুন্দরী ওরই শয়তানির সঙ্গিনী। দস্তানা খুলতে খুলতে ও জিজ্ঞেস করলে—হিথক্লিফ এখানে নেই নাকি? ওর আঙুলগুলো কিছু না করে, বাড়ির ভিতরে থেকে থেকে কি সাদা হয়ে গেছে!

অস্বস্তি বোধ করছিলেন মিঃ হিণ্ডলে, আবার বদমায়েস ছোঁড়া যে কিম্ভুত কিমাকার আকৃতি নিয়ে দেখা দেবে তাতেও তাঁর তৃপ্তি। তিনি হাঁক পাড়লেন, হিথক্লিফ, তুমি এবার আসতে পার। আর আর চাকর-বাকরদের মতো তুমিও মিস ক্যাথিকে অভ্যর্থনা কর!

ক্যাথি তার বন্ধুকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরতে ছুটে গেল ; এক নিমিষে ওর গালে সাত-আটটা চুমু খেলে, তারপর সরে এসে হেসে উঠলো, আরে অমন কালো হয়ে গেছ কেন, মুখই বা অমন গোমড়া কেন ! উঃ কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমাকে ! হিথক্লিফ, তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ ?

এই প্রশ্নের কারণও ছিল। লজ্জা আর গর্বে হিথক্লিফের মুখখানা তখন দ্বিগুণ গম্ভীর, সে স্থির।

হিথক্লিফ, হাত ধরো, মিঃ আর্ণ-শ বলে উঠলেন, শুধু আজকের জন্যই তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি !

না, ও জবাব দিলে, যেন ও খুঁজে পেলে ভাষা, আমি ঠাট্টার পাত্র হতে চাই না, ও আমার সইবে না।

ও সেই ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে যেত, কিন্তু ক্যাথি ওর হাত ধরলে।

ও বললে, তোমাকে দেখে হাসতে আমি চাইনি, কিন্তু হাসিতো চাপতে পারলাম না। হিথক্লিফ এস, আমার হাত ধরো। অতো গোমরা কেন গো ? তোমাকে বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তা যাকগে, মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নিলেই আবার খাসা দেখাবে ! কিন্তু এখন তো তুমি ভারী নোংরা !

হাতে ধরে আছে ওর নোংরা আঙুল, সেই দিকেই তাকালো ক্যাথি, নিজের পোষাকের দিকেও চোখ পড়লো। ওর আঙুলের স্পর্শে সে তো কলঙ্কিত না হয় এই ওর ভয়।

না, আমাকে ছুঁতে হবে না, সে জবাব দিলে। ওর চোখ অনুসরণ করলো ক্যাথির চোখকে, এবার হাত ছাড়িয়ে নিলে এক ঝটকায়, আমার খুশি আমি নোংরা থাকবো। আমার ভাল লাগে। থাকবো-নোংরা থাকবো !

এই বলে ও একছুটে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। মনিব মনিবানীর উল্লাস, আর ক্যাথেরিন তো বিব্রত। ও তো ভাবতেও পারেনি ওর কথায় অমনি করে চটে উঠবে।

পরিচারিকার কর্তব্য সেরে পিঠেগুলো সেঁকতে দিয়ে বাড়ি আর রান্নাঘর ধোয়ামোছা সারলাম, আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। বড়দিনের মতো

সাজানো গোছানো হোল। এবার বসে একা একা গাইতে লাগলাম বড়দিনের গান।

জোসেফ তার কামরায়, কর্তা আর কর্ত্রী লিণ্টনের বাড়িতে কি কি উপহার পাবে ক্যাথিকে তাই দেখাতে ব্যস্ত—ওদের সহৃদয়তার পাল্টা উপহার। কাল ওয়াদারিং হাইটস্-এ ওঁদের নিমন্ত্রণও হয়েছে, কিন্তু এক সর্তে রাজি হয়েছেন মিসেস লিণ্টন—ঐ পাজি ছেলেটাকে ওঁর বাছাদের কাছেও ঘেঁসতে দেওয়া হবে না।

আমি একাই ছিলাম। ভাজা মসলার উগ্র গন্ধ নাকে এসে লাগছিল, মনে মনে তারিফ করছিলাম রান্নাঘরের ঝকঝকে বাসন-কোসনের—এ কৃতিত্ব আমারই। মনে পড়লো, সব সাফ-সুত্‌রো হয়ে গেলে বুড়ো আর্ণ-শ এসে ঘরে ঢুকতেন, তারপর আমার হাতে গুঁজে দিতেন একটা টাকা। ভাবনা চলে গেল হিথক্লিফের প্রতি তাঁর ভালবাসায়। তাঁর ভয় ছিল তিনি মারা যাবার পর হিথক্লিফ অনাদরই পাবে! সে ভয় তো সত্যি হোল। আহা বেচারীর কি অবস্থা। গান গাইছিলাম, কান্না ঝরে পড়লো। চট করে মনে পড়লো, কান্নার চেয়ে ওর উপর এই অবিচার যদি কিছুটা লাঘব করতে পারি—সেই তো হবে কাজের মতো কাজ। উঠে পড়ে আঙিনায় ওর খোঁজে গেলাম। বেশি দূরে ও যায় নি। আস্তাবলে নতুন টাট্টু ঘোড়াটার মসৃণ লোমেও হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, আর সবাইকে দিচ্ছিল দানা। বললাম, হিথক্লিফ জলদি এস। রান্নাঘরখানায় এলে খুব আরাম পাবে। জোসেফ উপরে আছে। তাড়াতাড়ি এস! ক্যাথি বেরুবার আগে এস তোমাকে একটু ফিটফাট করে দিই—তারপরে দুজনে রান্নাঘরে বসে শোবার আগে অবধি গল্প করতে পারবে।

সে কাজ করে যাচ্ছিল, একবার পিছন ফিরেও তাকালে না।

এস—আসবে না? তোমাদের জন্যে পিঠে গড়ে রেখেছি। তোমাকে সাজাতে-গোজাতে আধঘণ্টা চলে যাবে।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল, উত্তর না পেয়ে ফিরে এলাম। ক্যাথেরিন ভাই আর ভাইয়ের বৌয়ের সঙ্গে খেতে বসলো; জোসেফ আর আমিও বসে

গেলাম। ওর খাবার পড়ে রইল টেবিলে। ও ন'টা অবধি কাজ করে চুপ করে ওর কামরায় চলে গেল। ক্যাথি অনেক রাত অবধি জেগে ওর নতুন বন্ধুদের অভ্যর্থনার জন্য কি কি করতে হবে তারই ফরমায়েস দিলে। পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে একবার রান্নাঘরে এল, কিন্তু ওতো চলে গেছে। ক্যাথি শুধু জিজ্ঞেস করলে, ওর কি হয়েছে, তারপর চলে গেল। হিথক্লিফ খুব ভোরে উঠলো, ছুটির দিন বলেই সে চলে গেল জলার দিকে। সবাই গীর্জেয় যাওয়ার আগে সে ফিরলো না। উপোস আর ভাবনায় তখন মাথাটা একটু বোধ হয় চাঙা, সে আমার কাছে খানিকটা বসলো, তারপরে সাহস করে বললে, নেলি, আমাকে সাফ্-সুতরো করে দাও না, আমি ভাল হব।

বললাম, হিথক্লিফ, তুমি ক্যাথেরিনকে দুঃখ দিয়েছ। ও যে কেন বাড়ি এল, এই ওর আফসোস। ও বেশী আদর পাচ্ছে বলে ওর উপর তোমার হিংসে।

ক্যাথেরিনকে ঈর্ষা করবে এ তো ওর কাছে দুর্বোধ্য, কিন্তু তাকে ব্যথা দিয়েছে একথা তো ওর কাছে স্পষ্ট।

ওকি তা বলেছে? গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

তুমি ভোরে বেরিয়ে গেছ বলেছিলাম, শুনে ও কাঁদলে।

আমিও তো কাল রাতে কেঁদেছি। সে বললে, ওর চেয়ে আমার কান্নার ঢের কারণ আছে।

বললাম, হাঁ, বুকে গর্ব আর পেটে খিদে নিয়ে তোমার শুতে যাবার কারণ ছিল বইকি। যাদের গর্ব আছে, তাঁরা তো নিজের দুঃখ সৃষ্টি করে। কিন্তু তুমি যদি তোমার ব্যবহারে লজ্জা পেয়ে থাক, ও এলেই ক্ষমা চাইবে। কাছে গিয়ে চুমু খাবে—বলবে—কি বলতে হবে, তুমি তা জান। কিন্তু মনে যেন থাকে, আবার মনে করে বোসো না যে, ও ঝলমলে পোষাক পরেছে বলেই একেবারে অচেনা হয়ে গেছে। আমাকে খাবার তৈরী করতে হবে, তাহলেও তোমাকে আমি এমন সাজিয়ে দেব যে, এডগার লিণ্টনকে তোমার পাশে দেখাবে যেন

এক পুতুল। তুমি ছোট হলে কি হবে, ঢ্যাঙা আছ, আর কাঁধও ওর থেকে দ্বিগুণ চওড়া—ওকে এক নিমিষে ধাক্কা মেরে পেড়ে ফেলতেও পার—তোমার তা মনে হয় না গো।

নিমেষের জন্য ওর চোখে দীপ্তি দেখা দিল, আবার ঢেকে গেল অন্ধকারে। ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, নেলি, ওকে বিশ বার পেড়ে ফেলতে পারি, কিন্তু তাতে তো ওর সৌন্দর্য কমবে না, আমারও বাড়বে না। আমার কি ইচ্ছে হয় জানো, আমার মাথায় হোক পাতলা চুল, আমার রং হোক ফর্সা, পোষাক পরি তেমনি সুন্দর, ব্যবহার ও হোক ভদ্র—ওরই মতো বড় মানুষ হই। বললাম, আর সবসময়েই মা-মা বলে কেঁদে উঠবে, আর কোনো একটা গেঁয়ো ছেলে ঘুসি তুললে কেঁপে সারা হয়ে যাবে। এক পশলা বৃষ্টি হলেও বাড়িতে বসে থাকবে। হিথক্লিফ, তুমি কিন্তু ঠিক বলছনা। আরসীর সামনে এস, তুমি যা চাও আমি তোমাকে তাই করে দেব, তোমার দুই চোখের মাঝখানের ঐ রেখাটি দেখছ—এই যে ঘন ভ্রূ বেঁকে না গিয়ে মাঝখানে বসে গেছে। তোমার ঐ রেখাগুলো মুছে ফেলতে শেখ, চোখ তুলতে শেখ, ঐ কালো খুদে দুই শয়তানি চোখকে নিষ্পাপ দেবদূত করে তোল, ওরা যেন বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে ওঠে—সন্দেহ সংশয় ঠিক না করে—শত্রু সম্বন্ধে যখন নিশ্চিত নয়, সবাকেই যেন বন্ধুভাবে দেখে। লাথিই প্রাপ্য এমন মার খাওয়া কুকুর হোয়োনা, সে তো যে লাথি মারে তাকে ঘৃণা করে—সারা পৃথিবীকে ঘৃণা করে।

তার মানে, এড্গার লিণ্টনের ঐ দুটি বড় বড় নীল চোখ আর নিভাঁজ কপালের কামনাই আমার হবে, কিন্তু আমি কামনা করলেও তা তো মিলবে না।

বললাম, সুন্দর মন হলেই মুখও সুন্দর হয়। তুমি যদি পাজি হও, তাহলে তোমার সুন্দর মুখও বিশ্রী হয়ে যাবে। এই তো ধোয়ামোছা, চুল আঁচড়ানো হোল—এবার বলতো নিজেকে সুন্দর লাগছে কিনা? তুমি তো ছদ্মবেশী রাজপুত্র, কে জানে তোমার বাবা হয়তো ছিলেন চীনের সম্রাট

আর মা ভারতের রাণী—তাঁর যে কেউ এক সপ্তাহের আয়ে ওয়াদারিং হাইটস আর থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জ দুটোই কিনে নিতে পারেন? লস্কররা তোমাকে হরণ করে এনে ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রি করে যায়। আমি যদি হতাম, আমার জন্ম সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই আমার থাকতো, আর সেই ধারণাই আমাকে যোগাত সাহস আর আত্মমর্যাদা—এই খুদে চাষার উৎপীড়ন সইবার শক্তি পেতাম!

বকবক্ করে বলে গেলাম, ওর ভ্রূকুটি মুছে গেল, মুখখানা সুন্দর হয়ে উঠলো। হঠাৎ আমাদের আলাপ বাধা পেল ঘড়ঘড় শব্দে। শব্দ পথ বেয়ে এল উঠোনে। ও জানালায় ছুটে গেল, আমি দরজায়। দেখি, দুই লিণ্টন বাড়ির গাড়ি থেকে নামছেন, জোব্বা আর ফারে একেবারে তাঁরা রুদ্ধশ্বাস; আর্ণ-শরা নামলো ঘোড়া থেকে। ক্যাথি ছেলেমেয়ে দুটিকে হাত ধরে নামিয়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এল। আগুনের কুণ্ডের ধারে বসতেই ওদের বিবর্ণ মুখ রক্তিম হয়ে উঠলো।

আমার সঙ্গীটিকে এবার তাড়াতাড়ি গিয়ে একটু সৌজন্য দেখাতে বললাম; সে রাজিও হয়ে গেল। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে সে রান্নাঘরের দরজা খুলতেই হিণ্ডলে আর একদিকের দরজা খুলে ফেললে, ওদের দেখা হোল। বাড়ির কর্ত্তা ওকে ফিটফাট আর হাসিখুসি দেখে বিরক্ত হোল। অথবা মিসেস লিণ্টনের কাছে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই সে তখন উদগ্রীব, ওকে সে ঠেলে দিলে ভিতরে, তারপর জোসেফকে রেগে হুকুম দিলে—ঐ ছোকরাটা যেন ঘরে না ঢোকে। ওকে খাওয়া শেষ হওয়া অবধি চিলে কোঠায় থাকতে বল। ঘরে থাকলে ও চাটনিতে হাত দেবে, ফল চুরি করবে।

আমি না বলে পারলাম না, না মশাই, ও কিছুই ছোঁবেনা। বরং এত ভাল খাবার-দাবার তৈরী হয়েছে, ও একটু ভাগ পাবে।

ওকে যদি সন্ধ্যের আগে নীচে দেখি, ও আমার হাতের কিলচড়ের ভাগ পাবেখন। হিণ্ডলে চেঁচিয়ে উঠলো, এই উড়নচণ্ডি ছোঁড়া—পালা! ও আবার ফুলবাবু হবার সখ দেখনা! দাঁড়া তো তোর ঐ চুলের কেয়ারী একবার মুঠোয় ধরতে পাইতো দেখিয়ে দেব, ওগুলো টেনে কত লম্বা করা যায়।

খুদে লিণ্টন দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বললে, আর কত করবে, এমনিই তো বেশ লম্বা। আচ্ছা, অতলম্বা চুলে ওর মাথা ধরেনা? ওর চোখের কোণের চুল তো নয় যেন ঘোড়ার ঝুঁটি।

অপমান করবার জন্তে সে একথা বলেনি, কিন্তু হিথক্লিফের উগ্রস্বভাব। সে যাকে তখন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে, যাকে ঘৃণা করে, তার কাছ থেকে এই উক্তি শোনার জন্ত রাজি নয়। সে আপেলের চাটনির পাত্রটা ধরে (ঐটেই হাতের কাছে পেল) চাটনি ছুঁড়ে মারলো তার মুখে আর গলায়। অমনি কান্না শুরু হয়ে গেল। ছুটে এল ইসাবেলা আর ক্যাথি। মিঃ আর্ণ-শ দোষীর ঘাড় ধরে তাকে তার কামরায় নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি এই ক্রোধের নায্য ঔষধের ব্যবস্থাই করলেন—কেননা হাঁফাতে হাঁফাতেই তিনি ফিরে এলেন। আমি ঝাড়ন দিয়ে এড্‌গারের নাক মুখ মুছে দিলাম, একটু বা রাগই হোল। তাকে বার বার জানিয়ে দিলাম, সে যেমন নাক গলাতে এসেছিল, তেমনি সাজাই তার হয়েছে। ওর বোন বাড়ি ফেরার জন্ত কান্না জুড়ে দিলে। ক্যাথিতো তখন বিভ্রান্ত, লজ্জিত।

খুদে লিণ্টনকে সে ভৎ`সনা করলে, ওর সঙ্গে কথা বলা তোমার উচিত হয় নি। ওর রাগীস্বভাব। দেখলে তো আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল, ও বেত খাবে। ওকে বেত খেতে দেখলে আমার খারাপ লাগে। খেতে পারিনা, এড্‌গার, তুমি ওর সঙ্গে কেন কথা কইতে গেলে?

ছেলেটি আমার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাকি মোছাটুকু নিজের ক্যাম্ব্রিকের রুমাল দিয়ে সেরে নিতে নিতে ফুঁপিয়ে উঠলো, আমিতো যাইনি। মার কাছে কথা দিয়েছিলাম, ওর সঙ্গে একটা কথাও বলবনা, আর বলিওনি।

থাক, কাঁদেনা! ক্যাথেরিন ঘৃণাভরে উত্তর দিলে। তুমিতো আর খুন হওনি। আর লাগতে যেওনা, ঐ ভাই আসছে, একটু চুপ করো। ইসাবেলা—চুপ, চুপ! কেউকি তোমাকে মেরেছে যে অমন ফুঁফিয়ে উঠছ!

হিণ্ডলে ব্যস্ত হয়ে ঢুকে বললে, এই যে তোমরা, বোসো বোসো! ঐ ছোঁড়াটা আমাকে বেশ রাগিয়ে দিয়েছিল। এড্গার, পরের বারে নিজেই ওকে শাস্তি দেবে ওতে খিদে বাড়বে।

ভোজ্যবস্তু দেখে আর সুগন্ধ পেয়ে সবার মন আবার শান্ত হোল। ঘোড়া দাবড়িয়ে এসে ওদের তখন খিধে পেয়েছে। কোন অনিষ্ট হয় নি বলেই তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা পেল। মিঃ আর্ণ-শ কেটে কেটে প্লেটে দিচ্ছেন, কর্ত্রী আলাপে খুশি করছেন। আমি চেয়ারের পিছনে আছি। ক্যাথেরিনের বড় কালো চোখ আর উদাসীন ভাবভঙ্গী দেখে ব্যথাই পেলাম। মনে মনে ভাবলাম, নিষ্ঠুর মেয়ে, দেখতো পুরানো সাথীর দুঃখ একেবারে ভুলে গেল! ওকে এমন স্বার্থপর তো ভাবিনি! হঠাৎ সে মুখে খাবার পুরে দিতে গিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল। গাল দুখানা লাল, চোখে জল এল। কাঁটাখানা পড়ে গেল মেঝেয়, ও নিজের ভাবাবেগ লুকিয়ে রাখবার জন্তেই মুখ লুকালো। না— নিষ্ঠুর বলা তো ঠিক হয় নি। বুঝলাম, সারাদিন ধরে এই নরক ভোগ সে করেছে, নিজেকে একা পাবার প্রত্যাশায় উদগ্রীব হয়ে কাটিয়েছে, একটিবার দেখা করতে চেয়েছে বন্দী হিথক্লিফের সঙ্গে। তাঁকে খাবার দিয়ে আসতেও চেয়েছে।

সন্ধ্যেয় নাচের আসর। ইসাবেলার নাচের জুড়ি নেই দেখে ও ওর মুক্তির জন্তে মিনতি করলে। নিষ্ফল এ মিনতি, আমি শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এলাম। অঙ্গচালনে মনের আঁধার দূর হোল। আমাদের আনন্দ আরো বেড়ে গেল যখন এল গিমারটনের বাজিয়ের দল। পনেরো জন তো হবে—ঢাক আছে, তানপুরা, ক্লারিওনেট, ফরাসী সিঙ্গে সব আছে, তাছাড়া গাইয়েও আছে ক'জন। ওরা প্রতি বছর বড়দিনে বনেদী বাড়ি ঘুরে ঘুরেই ইনাম আদায় করে। ওদের বাজনা তো আমাদের কাছে সেরা। বড়দিনের গানের পর অন্য গান গাওয়া হোল। মিসেস আর্ণ-শ গান ভালবাসেন, তাই বহু গানই ওরা গাইল।

ক্যাথিও ভালবাসে। ও বললে, সিঁড়ির একেবারে উঁচু ধাপে দাঁড়িয়ে ভারি মিষ্টি শোনায়, তাই ও আঁধারে উপরে চলে গেল। আমি গেলাম পিছনে।

লোক অনেক বলে, ওরা আমাদের চলে-আসা লক্ষ্য করেনি, নীচের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ও কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে থামলো না, আরো উঠতে লাগলো। সেখানে চিলে কোঠায় হিথক্লিফ বন্দী। ও তাকে ডাকলো।

সে তো গোঁ ধরে রা-ই কাড়ে না; কিন্তু ক্যাথির ধৈর্যকে বলিহারি! সে পেড়াপীড়ি শুরু করে দিলে শেষে হিথক্লিফ কাঠের দেওয়ালের ও পাশ দিয়ে ওর সঙ্গে দেখাশোনা করতে বাধ্য হোল। ওদের নির্বিঘ্নে আলাপ করবার সুযোগ দিয়ে চলে এলাম। যতখন না গাইয়েরা গান থামিয়ে জলপান করে, ততখন তো চলুক। বহুক্ষণ পরে ক্যাথিকে সতর্ক করে দিতে মই বেয়ে উঠে এলাম। বাইরে তো ওকে পেলামনা, ঘরের ভিতরে স্বর শুনলাম। খুদে বাঁদর এক স্কাইলাইট আর ছাদ বেয়ে অন্য কামরার স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়েছে। বহু সাধ্যসাধনা করে ওকে বাইরে আনতে হোল। ওর সঙ্গে সঙ্গে হিথক্লিফও বেরিয়ে এল। ক্যাথি এবার আবদার শুরু করলে, হিথক্লিফকে রান্নাঘরে নিয়ে যেতে হবে। রান্নাঘরের অন্য পরিচারিকাটি তো নেই, সে তো ঐ গান না শয়তানের কালোয়াতি থেকে রেহাই পাবার জন্যে পড়শীর বাড়িতে লুকিয়েছে। ওদের জানিয়ে দিলাম, ওদের ফন্দিফিকির আমার কাছে খাটবে না; কিন্তু বন্দী যখন কাল থেকে উপোস করে আছে। চুরি করে খেলে, আমি চোখ বুজে থাকবো। হিথক্লিফ নেমে এল। আগুনের ধারে একটা টুল এনে ওকে কিছু ভাল ভাল জিনিষ খেতে দিলাম। ছেলেটা অসুস্থ, কিছু খেলেনা। ওকে খাওয়াবার চেষ্টা বৃথা হোল। ও কনুয়ের উপর ভর দিয়ে কি এক মূক ভাবনায় ডুবে গেল। ওকে জিজ্ঞেস করতে গম্ভীর স্বরে বললে, মনে মনে ঠিক করছি, হিণ্ডলের উপর কি করে এর শোধ তুলবো। যতদিন সবুর করতে হয় করবো, তবু শোধ তুলতেই হবে। তার আগে ও অক্কা পায়!

বললাম, ছিঃ ছিঃ ছিঃ হিথক্লিফ! মন্দ লোকদের ভগবান শাস্তি দেবেন; আমাদের তো ক্ষমা করাই উচিত।

ও জবাব দিলে, না, আমি যেমন খুশি হব, ভগবান তো তেমনি খুশি হবেন না। শুধু যদি উপায়টা জানতে পারতাম! আমাকে একা থাকতে দাও, ঠিক ফন্দিটা বার করবো। ফন্দির কথা ভাবলে ব্যথাও আর থাকবেনা।

কর্তা, আপনার এ গল্পে মন নেই গো। কি করে যে এমন বক্‌বক্ করে গেলাম তাই ভাবছি। আহা আপনার পথ্যি যে জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল, আপনিও তো ঢুলছেন, এই বলে পরিচারিকা উঠে পড়ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বললাম, আর একটু বোসো। গল্পটা শুরু করেছ চমৎকার, এমনি করে আস্তে আস্তে বলে যাবে। তোমার প্রতিটি চরিত্রের সম্বন্ধেই আমার কৌতূহল আছে।

কিন্তু ঘড়ীতে যে এগারটা বাজে কর্তা।

তাতে কি—যে বেলা দশটায় ওঠে তার পক্ষে একটা কি দুটো তো সবে সন্ধ্যে।

কিন্তু অমন করে দশটা অবধি শুয়ে থাকবেন না। ভোর তো ঢের আগেই চলে যায়। বেলা দশটার ভিতরে যে তার কাজের অর্ধেক শেষ না করতে পারে আর অর্ধেক তো তার শেষই হবে না।

তবু বোসো, কাল আমি রাতকে বিকাল অবধি টেনে নিয়ে যাব। ভীষণ সর্দি লাগবেই।

না কর্তা, তা বোধ হয় লাগবে না। যাহোক, আমি তিন বছর পরেই শুরু করি। এরই মধ্যে মিসেস আর্ণ-শ—

না, না, তা হবে না। এমন কি কখনো মনের অবস্থা হয়েছে, যখন একা বসে বসে দেখছ, গালচের উপর বেড়াল ছানাগুলোকে চাটছে, তুমি যদি বেড়ালের কিছুমাত্র তখন অবহেলা দেখ, সত্যিসত্যিই চটে যাবে।

সে তো ভীষণ কুঁড়েমি।

না, তা নয়, সব তার উল্টো। এ এক ক্লান্তিকর কর্মপ্রবণতা। আমাকেও যেন সেই অবস্থা পেয়ে বসেছে। এই অঞ্চলের মানুষের শহুরে মানুষের চেয়ে মূল্য যে বেশী একথা যেন আমি বুঝতে পারছি। বাড়ির মাকড়সার সঙ্গে জেল মাকড়সার যা তফাৎ এও যেন তাই। কিন্তু এই যে মূল্য এতো শুধু দর্শকের

জন্তই নয়। ওরা বাঁচে একান্তভাবে, ওরা আত্মস্থ, উপর উপর বাঁচা ওরা পছন্দ করে না, পছন্দ করে না পরিবর্তন আর বাইরের উচ্ছৃঙ্খলতা। আমার তো মনে হয়, এখানে চিরদিনের ভালবাসাও বুঝি সম্ভব—অথচ আমি তো এক বছরের বেশী স্থায়ী প্রেম সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। একটা অবস্থা যেন ক্ষুধার্ত মানুষকে একখানা থালার সামনে এনে ছেড়ে দেয়, তার সমস্ত ক্ষুধা কেন্দ্রীভূত করে থালার প্রতি সুবিচার করতে বলে, আর অন্য অবস্থা তাকে টেনে নিয়ে যায় ফরাসী রাঁধুনীর চব্যচোষ্যের সমুখে ; সে সবগুলি চেখে হয় তো খানিকটা বেশীই পরিতৃপ্তি পেতে পারে, কিন্তু প্রতিটি জিনিষ সম্বন্ধে তার তো চুনিয়ে উপভোগ করবার স্মৃতি থাকে না।

আমার বক্তৃতা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে ডিন জবাব দিলে, কর্তা, এখানে আমরা তো অন্য পাঁচ জায়গার মানুষের মতোই রয়েছি।

বললাম, কিন্তু তুমিই তো তার উল্টোটি। সামান্য প্রাদেশিকতা ছাড়া তোমার নিজের শ্রেণীর কোনো কিছুই তোমার ভিতরে দেখছিনে। অন্যদের চেয়ে তুমি বেশী করেই ভাব।

মিসেস ডিন হাসলো,

এই পাহাড়ী জায়গায় শুধু একই মুখ দেখে, একই ধরনের কাজ করে সময় কাটাইনি কর্তা, আমার কিছু জ্ঞানগম্যিও হয়েছে। তাছাড়া কিছু পড়াশুনোও করেছি। এই ঘরে হেন বই নেই যা একবার খুলে না দেখেছি—শুধু কি দেখা, পড়েছিও। তবে লাতিন, গ্রীক আর ফরাসী হলে সে আর বিদ্যেয় কুলোয়নি। গরীব-গুরবোর মেয়ে অতশত কোথায় শিখবো গো! যাক, তিন বছর লাফিয়ে পার না হয়ে, আমি পরের বছরের গ্রীষ্ম থেকেই তাহলে শুরু করি। সেটা ছিল ১৭৭৮ সন—তা এখন থেকে তো প্রায় তেইশ বছর আগেই হবে।

আট

জুনের এক ভোরে এল বনেদী আর্ণ-শ পরিবারের শেষ বংশধর। দূরে মাঠে আমরা খড় কাটতে ব্যস্ত, যে মেয়েটি রোজ খাবার নিয়ে আসতো, সে ঘণ্টাখানেক আগেই সেদিন মাঠ ভেঙে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। ছুটছিল আর আমাকে চীৎকার করে ডাকছিল মেয়েটা।

হাঁফাতে হাঁফাতে সে এসে বললে, আহা, কি খোকা হয়েছে গো! এমনটি তো আর দেখি নি-গা! কিন্তু ডাক্তার বললে, গিন্নী আর বাঁচবেন না, আজ ক'মাস ধরেই শুকিয়ে পাত হয়ে যাচ্ছিলেন—ক্ষয় রোগে ধরেছে কিনা! হিণ্ডলেকে তো একথা বললে। এখন আর আশাই নেই, শীতও কাটবে না। তুমি ছুটে এস গো। নেলি তোমাকেই তো বাচ্চাকে যত্ন-আত্তি করতে হবে, দুধ খাওয়াতে হবে, রাতদিন রাখতে হবে। আহা, তোমার মতো যদি হতাম গো—গিন্নী গেলে বাচ্ছা তো হবে তোমার।

গিন্নীর কি খুবই অসুখ। কাস্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, টুপীটার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললাম।

মনে তো হোল গো, কিন্তু ধক্ বটে, মেয়েটি বললে। একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেছে। তা হবে না, কি সুন্দর হয়েছে খোকা। আমিই যদি হতাম, মরতে কি এখনি চাইতাম গো! ওকে দেখেই সেরে উঠতাম। দেখে তো পাগলই হয়ে গেলাম। আর্চারের বৌ ওকে কর্তার কাছে নিয়ে গেল। তাঁর মুখখানাও সবে ঝলমল করে উঠেছে, এমন সময় ডাক্তারটা কু-ডাক ডেকে উঠলো। কি বললে জানো, আর্ণ-শ, তোমার বৌ যে তোমাকে খোকা দিয়ে যেতে পারলেন, এইটেই তো ভগবানের দয়া। যখন উনি এলেন, আমরা তো ভাবতেই পারিনি, বেশিদিন রাখতে পারব। শীতকালেই উনি বোধ হয় মারা যাবেন। তুমি আবার

এই নিয়ে হৈচৈ বাধিয়ো না। তাছাড়া তোমারও বাপু এমন রোগা বৌ বে করা ঠিক হয়নি।

মনিব কি বললেন, জিজ্ঞেস করলাম।

গজরাতে লাগলো বোধহয়। তেনার দিকে তখন কে দেখেগো, বাচ্চার দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে আছি। মেয়েটা আবার তন্ময় হয়ে গেল বর্ণনায়! ওর চেয়ে আমার উৎসাহ কম নয়। ছুটলাম বাড়ির দিকে, চোখ ভরে দেখতে হবে তো। কিন্তু হিগুলের জন্যে দুঃখ হোল। তার বুকে তো দুটি দেবতার আসন—এক সে নিজে ; আর তার বৌ ; দুজনকেই সে ভালবাসে, আবার একজনকে করে পূজা। কি করে ও এ ধকল সইবে গো!

বাড়ি এসে দেখি, সদর দরজায় কর্তা দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, বাচ্চা কেমন আছে।

নেলি, ও এখুনি উঠে ছুটতে শুরু করবে এমনি ওর ভাবখানা, হেসে বললে।

আর গিন্নী? সাহস করে আবার জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তার নাকি বলেছে—

জাহান্নামে যাক ডাক্তার! মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো তাঁর, ফ্রান্সেস ঠিকই বলেছে, ও আসছে হপ্তায়ই সেরে উঠবে। উপরে যাচ্ছ নাকি! ওকে বোলো, ও যদি কথা দেয়, বকবক্ ও করবে না, তাহলেই আমি আসবো ; চলে এলাম কেন জানো, ও আর নিজকে চেপে রাখতে পারছে না। খালি কথা বলছে। বোলো, মিঃ কেনেথ বলেছেন, ওকে চুপ করে থাকতে হবে।

গিন্নীকে এ খবর দিলাম। তিনি তো তখন আনন্দে বিভোর, খুশিতে উপছে পড়ে বললেন, এলেন, সত্যি বলছি, একটা কথাও বলি নি, আর ও এরই মধ্যে, দু-দুবার কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওকে বল, আমি কথা দিচ্ছি, চুপ করে থাকবো : কিন্তু হাসতে তো বারণ নেই তা বলে!

আহা বেচারী! মৃত্যুর আগেও ওঁর আনন্দ তেমনি বজায় ছিল। ওঁর স্বামী তো বলতেন, ওঁর স্বাস্থ্য ফিরছে। কেনেথ যখন রোগের শেষ অবস্থায় জবাব দিয়ে বললেন, ওর চিকিৎসা করে আর টাকা খরচ করে লাভ নেই, তখন

তো তিনি ক্ষেপে গেলেন। বললেন, জানি—ওর আর চিকিৎসা দরকার নেই। ও তো সেরে গেছে—আপনার চিকিৎসা ওর না হলেও চলবে। ক্ষয়রোগ ওর জন্মে ছিল না। শুধু জ্বরে ভুগছিল, এখন তো তাও নেই—আমার মতোই স্বাভাবিক ভাবে চলছে ওর নাড়ি, ওর গাল দুখানাও আমারই মতো ঠাণ্ডা।

বৌকেও সেকথা বললেন ; ও বুঝি বিশ্বাসও করলে, কিন্তু একদিন রাতে, ওঁর কাঁধের উপর মাথা এলিয়ে দিয়ে যখন বলছিল, কাল হয়তো ও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে এমনি সময় কাসির দমক এল—তেমন জোরও নয়। কর্তা তাকে কোলে তুলে নিলেন, বৌ দুহাত দিয়ে ধরলো তাঁর গলা জড়িয়ে—মুখের চেহারা, তখন বদলে গেছে। কর্তার কোলেই মারা গেলেন।

মেয়েটা যা বলেছিল, তাই-ই ফললো। বাচ্চার ভার নিলাম আমি। মিঃ আর্ণ-শ (হিণ্ডলে) ওকে সুস্থ দেখতে পেলেই খুশি, ওর কথা না শুনলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তিনি নিজে তখন ক্ষেপে গেছেন ; ওঁর এমন দুঃখ, যাতে চোখের জল ঝরেনা, হা-হা করে কাঁদায় না। তিনি কাঁদলেন না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন না। বরং ভগবানকে গাল দিলেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেন। মানুষ আর ভগবান—দুই-ই তখন তাঁর শত্রু। তারপর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ভাসিয়ে দিলেন। চাকর-চাকরাণীরা ওর এই অত্যাচার বেশীদিন সইতে পারলে না। জোসেফ আর আমিই শুধু রয়ে গেলাম। বাচ্চাকে ছেড়ে যেতে মন চাইল না; তাছাড়া আপনি জানেন না তো, আমি ওর সতাতো বোন হই। একজন অচেনা মানুষ ওঁকে ক্ষমা করতে না পারুক, আমি তো করবই। জোসেফ রইল জনমজুর খাটাবার কাজ নিয়ে।

মনিব তখন বদঅভ্যেস আর কুসঙ্গীতে বুঁদ হয়ে আছেন। হিথক্লিফ তো খুবই খুশি, হিণ্ডলে সর্বনাশের পথে ছুটে চলছে, ফেরানো তাঁকে আর যাবে না। সে যে কি একখানা বাড়ি হয়ে উঠলো গো ! পাদ্রীর সহকারী সেই গৃহশিক্ষক আর আসেন না, শেষে তো ভদ্র বলতে কেউ আর এধার মাড়াত না। অবশ্য এডগার লিণ্টন যে ক্যাথির কাছে আসতো তা বাদ দিয়েই বলছি। পনেরো বছর তখন তার বয়েস, সে তো তখন এ তল্লাটের রাণী। তার জুড়ি কেউ

ছিল না। যেমন তার গর্ব, তেমন সে আবেগময়ী। ছেলেবেলায় ওকে ভাল লাগত বটে, কিন্তু পরে আর ওকে তেমন পছন্দ হোত না। ওর গুমোর ভাঙবার জন্যে বার বার চেষ্টা করতাম, কিন্তু আমার উপর ও কখনো চটেনি। পুরানো বন্ধুদের প্রতি ওর একনিষ্ঠা ছিল অদ্ভুত; হিথক্লিফ তখনও ওর স্নেহের তেমনি অধিকারী। আর এডগার লিণ্টন যতই ওদের থেকে সরেশ হোক, ওর মনে সে তো অমন গভীর দাগ কেটে দিতে পারলে না। ঐতো আমার আগের মনিব! ঐ তো আগুনের কুণ্ডের ধারে ওঁর ছবি। এক সময়ে ওঁর ছবি একপাশে, আর একপাশে ছিল ওঁর স্ত্রীর ছবি। কিন্তু স্ত্রীর ছবিখানা সরিয়ে নিয়ে গেছে, নইলে আপনি দেখে বুঝতে পারেন তিনি কেমন ছিলেন। দেখুন তো, ঠাহর করতে পারছেন কিনা।

ডিন মোমখানা তুলে ধরলো, আমি একখানা সুন্দর মুখ দেখতে পেলাম। একেবারে হাইটস্-এর ঐ যুবতীটির মতো, কিন্তু কেমন যেন ভাবে বিভোর, বিনম্র তার অভিব্যক্তি।

সুন্দর ছবি। দীর্ঘ কেশ কপালের উপর এসে কুঞ্চিত হয়ে গেছে, চোখদুটি আয়ত, গম্ভীর, দেহও সুন্দর। ক্যাথি কি করে তার পুরানো বন্ধুকে ভুলে গেল, ভেবেতো অবাক হলাম না। বড় চমৎকার ছবি তো, বললাম, কিন্তু ছবিখানা ঠিক তো?

অবিকল, ও জবাব দিলে, কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠলে এর চেয়েও ওঁকে ভাল দেখাত। এতো ওঁর নিত্য-তিরিশ দিনের চেহারা। এমনি তো ওঁর উৎসাহ বলে কিছু ছিলনা। যাহোক এড্‌গার প্রকাশ্যে ওয়াদারিং হাইটস্-এ আসতে খুব কমই সাহস পেত। আর্ণ-শ পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে সে ছিল ভীত; হিথক্লিফের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার এই ভয়। তবু এলেই আমরা যথাসাধ্য ভদ্রতা করতাম। সে কেন আসে মনিব জানতেন, তাই ওকে কখনো চটাতেন না; নিজে ভদ্রতা দেখাতে না পারুন, দূরে সরে যেতেন। আমার মনে হয় উনি থাকলে ক্যাথেরিনের বিশ্রী লাগতো, ও মোটে ছলাকলা জানত না, কিছুই বুঝত না, আবার তার দুই বন্ধুতে মুখোমুখি দেখা হয়

এ আপত্তিও তার ছিল। যেমন হিথক্লিফ লিণ্টনের সামনে তার নিন্দে করলে, সে ঠিক সায় দিতে পারত না, সে সায় দিত তার অনুপস্থিতিতে। আবার লিণ্টন যখন হিথক্লিফের প্রতি বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা দেখাত, সে তার এই আবেগ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকতে পারত না। ভাব দেখাতো যেন তার খেলার সাথীর এই নিন্দা তার কাছে কিছুই নয়। ওর এই বিভ্রান্তি, এই দ্বিধা দেখে আমি হাসতাম, আমার কাছ থেকে ও এগুলো আড়াল করে রাখতে চাইত। কিন্তু সে তো বৃথা চেষ্টা।

সেদিন বিকেলে মিঃ হিণ্ডলে বাড়ি নেই, হিথক্লিফ সেই সুযোগে কাজ থেকে ছুটি নিয়ে নিলে। তার তখন বছর ষোল বয়েস, বুদ্ধিও কাঁচা। ভিতরে বাইরে তাকে দেখে তখন মেজাজটা খিঁচিয়ে উঠতো, আজকাল অবশ্য তার চিহ্নও নেই। তখন তার শিক্ষা বন্ধ, অবিরাম কঠোর পরিশ্রমে তার আর জ্ঞানার্জনের কৌতূহলও নেই। বৃদ্ধ আর্ণ-শ তার মনে ছেলেবেলায় যে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাও আর নেই। সে কিছুদিন ক্যাথেরিনের সঙ্গে পড়াশুনোয় পাল্লা দিয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার পর নিঃশব্দে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করলে। যখন উপরে ওঠার আর পথ নেই, তখন নিচেই সে নেমে এল। তার চেহারাও মানসিক এই অবনতির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। কুঁজিয়ে হাঁটে, মাথা নীচু করে থাকে। ওর স্বাভাবিক গম্ভীরভাব তখন অন্তর্হিত, কেমন এক নির্বুদ্ধিতা দেখা দিয়েছে। আর ও তখন পরিচিতদের শ্রদ্ধা চাইত না, তাদের ঘৃণা আর বিরক্তি উদ্রেক করেই খুশি হোত।

ক্যাথেরিন আর সে তখনও বন্ধু, অবসর পেলেই সে আসতো ছুটে। কথায় সে আর প্রকাশ করতে পারত না ভালবাসা, ক্যাথির কিশোরী-সুলভ সোহাগে সে তখন সন্দেহাকুল, ওতে যে তৃপ্তি নেই একথা সে জানতো। আমি সেদিন ক্যাথিকে তার পোষাক পরতে সাহায্য করছি, এমন সময় সে এসে জানালে সে আজ কাজ করবে না। ওযে আজ কুঁড়ে হয়ে বসে কাটাবে একথা ক্যাথি ভাবে নি। বাড়িটা নিজের দখলে পাবে ভেবে সে এরই মধ্যে

ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে এডগারকে খবর পাঠিয়েছিল। আর তারই তোড়জোড়ও চলছিল তখন।

হিথক্লিফ এসেই বললে, ক্যাথি, আজ বিকেলে ব্যস্ত থাকবে নাকি? কোথাও যাবে?

না বৃষ্টি পড়ছে।

তাহলে সিল্কের পোষাকটা পরলে কেন? সে বললে, কেউ আসছে নাকি?

কে আসছে-না-আসছে জানি না, ক্যাথি বললে, কিন্তু তোমার তো এখন মাঠে যাবার কথা হিথক্লিফ। আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি চলে গেছ। ছেলেটা বললে, হিণ্ডলে তো সহজে নড়ে না। আমাদের রেহাইও দেয় না। আজ আর কাজ করবো না, তোমার কাছে কাছে থাকবো।

কিন্তু জোসেফ যে বলে দেবে, ক্যাথি বললে, তুমি তার চেয়ে চলে যাও। ও এখন বস্তায় চুন পুরছে, শেষ করতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ও জানতেও পারবে না।

এই বলেই ও আগুনের ধারে গিয়ে বসে পড়লো। ভ্রূ কুঁচকে ক্যাথেরিন এক মুহূর্তে কি ভেবে নিলে। বাধা সে পেয়েছে, সে-বাধা সে দূর করে দিতে চায়। মুহূর্তের নীরবতার পর সে বললে, ইসাবেলা আর এড্‌গার লিণ্টন আজ বিকেলে আসবে বলেছে। যা বৃষ্টি পড়ছে, আসবে বলে তো মনে হয় না। তবে আসতেও পারে। যদি আসে তুমি মিছি মিছি গালাগাল খাবে।

ও তবু নাছোড়, পেড়াপীড়ি শুরু করলো, ক্যাথি, তুমি এলেনকে বলে দিও, তুমি ব্যস্ত। তোমার এই বাজে কাজের জন্যে আমাকে এমনি করে তাড়িয়ে দিও না। মাঝে মাঝে তো আমার নালিশ করতে ইচ্ছে হয় যে, ওরা, না আমি— না, না, তা আমি বলতে চাই না—

ওরা কি? ওর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে ক্যাথেরিন চীৎকার করে উঠলো। আমার হাত থেকে এক ঝাঁকুনিতে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে সে

আড়ষ্ট স্বরে বললে, দেখ তো নেলি, কি করেছ, আমার চুলের কেয়ারী নষ্ট করে দিয়েছ! না, না, আর দরকার নেই; আমাকে একটু একা থাকতে দাও। তারপর হিথক্লিফ, তোমার নালিশটা কি?

কিছু না—শুধু দেয়ালের দেয়ালপঞ্জীটার দিকে তাকিয়ে দেখ! সে জানালার ধারে ফ্রেমে বাঁধানো একখানা কাগজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। লিণ্টনদের সঙ্গে যতগুলো সন্ধ্যে কাটিয়েছ সব ঢ্যারা কাটা রয়েছে, আর আমার সঙ্গে যতগুলো কাটিয়েছ, সবগুলোতে রয়েছে ফুটকি দেয়া। দেখতে পাচ্ছ তো? প্রতিটা দিন আমি এমনি করে দাগ দিয়ে গেছি।

হাঁ—দেখেছি। এ তো তোমার বোকামি! আমার বয়ে গেছে দেখতে! ক্যাথেরিন চটে উঠলো। ওগুলো করবার মানে কি?

মানে হচ্ছে, আমি যে দেখি সে কথা বুঝিয়ে দেওয়া, হিথক্লিফ বললে।

তার মানে সব সময়েই তোমার কাছে বসে থাকবো, এই তো? ক্যাথি আরো চটে গেল। কি আমার লাভ? তুমি কি নিয়ে কথা বলতে পার বল তো? তুমি তো হাবা, নয়তো একেবারে বাচ্চার মতো। মাথামুণ্ডু কি সব বল!

ক্যাথি, তুমি তো আগে কখনো এসব কথা বলনি! হিথক্লিফ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

যে মানুষ কিছু জানে না, কিছু বলতে পারে না, তার সঙ্গ তো সঙ্গই নয়, ক্যাথি অস্ফুট স্বরে বললে।

তার সাথী উঠে পড়লো, কিন্তু আর অনুভূতি প্রকাশের সময় রইল না। বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ; মৃদু করাঘাত করে ঘরে এসে ঢুকলো তরুণ লিণ্টন। অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দদীপ্ত ওর মুখ। একজন এল, আর একজন গেল চলে।—দুই বন্ধুর ভিতরে প্রভেদটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো ক্যাথির কাছে। কয়লার খনির কুশ্রী পাহাড়ী অঞ্চলের বদলে যদি চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে সুন্দর উর্বরা উপত্যকা—সে কেমন লাগে! ঠিক তেমনি

বিপরীত যেন এই দুই সাথী। একজনের স্বর, সম্ভাষণ তার চেহারার মতোই। কথা বলার ধরনটি ও কত মিষ্টি।

আমার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, তাড়াতাড়িই এসে পড়েছি, তাই না? আমি দূরে গিয়ে বাসন-কোসন, টেবিলের টানা ঝাড়পোঁছ করতে লেগে গেলাম।

না, ক্যাথেরিন উত্তর দিলে। নেলি, ওখানে কি করছ?

কাজ করছি গো, জবাব দিলাম। (মিঃ হিণ্ডলে আমাকে বলে রেখেছিলেন, ওদের আলাপের সময় আমি যেন হাজির থাকি) ও আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো। বেশ উষ্মা ওর স্বরে; নেলি, তোমার ঐ ঝাড়ন নিয়ে তুমি ভাগতো এখান থেকে! যখন বাড়িতে লোক আসে, তখন চাকর-চাকরাণীরা সেই ঘরে ঝাড়পোঁছ করে না—এইটেই তো রীতি!

জোরেই বললাম, কর্তা বাড়ি নেই, এখনই তো সাফ করার সুবিধে। উনি তো আবার জিনিষপত্তর হাঁটকালে চটে যান। মিঃ এডগার কিছু ভাববেন না—তা আমি জানি।

আমার সামনে জিনিষপত্র হাঁটকানো আমি পছন্দ করিনে নেলি! উদ্ধত স্বরে সে বলে উঠলো। অতিথিকে কিছু বলার সময় দিলে না। হিথক্লিফের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে, তার জের তখনো চলছে। সে তো প্রকৃতিস্থ হয় নি।

আমি উত্তর দিলাম, কি করবো বল, উপায় যে নেই। নিজের কাজ করে চললাম। এডগার দেখতে না পায় এমনিভাবে ও আমার হাত থেকে ঝাড়ন-কেড়ে নিয়ে হাতে জোর চিমটি কাটলে। বলেছি তো, আমি ওকে কখনো ভালবাসতাম না, ওর গর্বে আঘাত করে আনন্দ পেতাম। তাছাড়া ব্যাথাও পেয়েছিলাম, তাই চেঁচিয়ে উঠলাম, দেখগো, এ তোমার কি স্বভাব! আমাকে খুবলে নিলে যে গো! কিন্তু এ তো আমি সইব না!

মিথ্যাবাদী কোথাকার! আমি তো তোমাকে ছুঁই-নি। ওর হাতের আঙুল তখন আবার চিমটি কাটার জন্ত সুড়সুড় করছে, আর কান তো রাগে

গন্‌গনে গরম। ও কথনো রাগ চাপতে পারত না, চটলে সঙ্গে সঙ্গে ওর রং-এ যেন আগুন ধরে যেত।

তাহলে এটা কি এমনি এমনি হোল? আমি রক্তমুখী দাগটার দিকে দেখিয়ে দিলাম। এই তো ওকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চূড়ান্ত সাক্ষ্য।

পা দাপাতে লাগলো ক্যাথি। এক মুহূর্ত বুঝি বা দ্বিধাই এল, তারপর দুষ্টবুদ্ধির তাড়নায় সে আমার গালে এক চড় মেরে বসলো। এক নিদারুণ চড়! আমার দুই চোখ জলে ভরে গেল।

ক্যাথেরিন, ক্যাথেরিন, কি করছ! লিণ্টন বাধা দিলে। ও তো ওর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মিথ্যা কথা আর এই হিংস্র আক্রমণে বিভ্রান্ত।

এলেন, ক্যাথি কাঁপতে কাঁপতে বললে, এখুনি এই ঘর থেকে চলে যাও!

খুদে হেয়ারটন সব সময়েই আমার পিছনে পিছনে ঘুরতো। সে তখন মেঝেয় আমার কাছে বসেছিল। আমার চোখে জল দেখে সে কাঁদতে শুরু করলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে ক্যাথি-পিসী ভারী দুষ্টু! এবার ওরই উপর পড়লো আক্রোশ। ওর ঘাড় ধরে এমন ঝাঁকুনি দিতে শুরু করলে যে, ও তো নীল হয়ে গেল। এড্‌গার অবিবেচকের মতো ক্যাথির দুহাত ধরে ওকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল। মুহূর্তে একখানা হাত সে ছাড়িয়ে নিলে। অবাক হয়ে যুবকটি অনুভব করলে, সে হাত গিয়ে পড়েছে তারই কানের উপরে। সে তো আর ঠাট্টা বলে ভুল হবার কথা নয়। বিভ্রান্ত হয়ে পিছিয়ে গেল সে। আমি হেয়ারটনকে কোলে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এলাম। দরজাটা খোলাই রইল। ওরা কি করে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে আমি দেখতে চাই—আমার এ এক কৌতূহল। যেখানে টুপীটা রেখেছিল, লাঞ্ছিত অতিথি সেখানে ফিরে গেল। তার মুখ ম্লান, ঠোঁট কাঁপছে।

মনে মনে বললাম, ঠিক হয়েছে! হোল তো, মানে মানে এবার বাড়ি যাও! ওর শরিফ মেজাজের একটু যে পরিচয় পেলে এতে তো কৃতার্থ হওয়াই তোমার উচিত।

কোথায় যাচ্ছ? দরজার কাছে এগিয়ে এসে ক্যাথেরিন জিজ্ঞেস করলে। এ যেন জিজ্ঞাসা নয়, দাবি।

সে একপাশে সরে গেল।

তুমি চলে যেও না! চেঁচিয়ে উঠলো।

না, আমি যাব, আমার যাওয়াই উচিত, চাপা স্বরে এল উত্তর।

দরজার হাতল চেপে ধরে পেড়াপীড়ি করতে লাগলো ক্যাথি। না, না, এখনও যাবার সময় হয় নি লিণ্টন। বসো, বসো! আমাকে এমনভাবে ফেলে রেখে যেও না! সারারাত বিশ্রী কাটবে। তুমি থাকলে তা হবে না।

তুমি আমাকে মারলে, তারপরে কি থাকতে পারি—তুমিই বল? লিণ্টন জিজ্ঞেস করলে।

ক্যাথেরিন চুপ।

তুমি তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ, আমার লজ্জা করছে! সে বলে গেল। আর তো আমি এখানে আসবো না।

ক্যাথির চোখে জল চকচক করছে, চোখের পাতা কাঁপছে।

এড্‌গার বললে, তুমি ভেবে চিন্তে মিথ্যে বলেছ!

না, বলিনি! ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠলো, বাকশক্তি যেন সে ফিরে পেয়েছে। ভেবে চিন্তে আমি কিছু করি না! যদি যেতে মন চায়, চলে যাও। আমি কাঁদবো—কেঁদে কেঁদে আমার অসুখ করবে!

চেয়ারের উপর মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো ক্যাথি। সত্যিই কাঁদছে। এডগার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে উঠোন পর্যন্ত চলে গেল; তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো। আমি ওকে খানিকটা উৎসাহ দিলাম। হেঁকে বললাম, আমাদের খুদে কর্ত্রীটি ভারী একগুঁয়ে। আদুরে দুলালী—আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটি খেয়ে দিয়েছে। আপনি তার চেয়ে বাছা ঘোড়সওয়ার হয়ে বাড়ি যাও। নইলে অনর্থ করবে!

জানালা দিয়ে তখনও তাকিয়ে আছে ক্যাথি। বেড়ালের যেমন আধ-মরা ইঁদুর কি আধা-খাওয়া পাখী ফেলে যাবার ক্ষমতা নেই, ওরও নেই তেমনি চলে

যাবার শক্তি। ভাবলাম, ওকে আর রক্ষা করা গেল না। ওর হয়ে গেছে, নিয়তির দিকে ও ছুটবে। আর ছুটলোও তাই। হঠাৎ ও ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলো বাড়ির দিকে। ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। আমি যখন খবর দিতে গেলাম, পাঁড় মাতাল হয়ে হিণ্ডলে ফিরেছেন, সমস্ত বাড়ি তিনি ওলট-পালট করে দেবেন (এমনিই তো তাঁর মারমুর্ত্তি), দেখলাম বিবাদের ফলে নিবিড়তম সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে—যৌবনের প্রথম ভীরুতার ভেঙে গেছে বাঁধ, ওরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মিতালির ছদ্মবেশ। এখন ওরা আর বন্ধু নয়, ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা। সে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে গেছে।

মিঃ হিণ্ডলে এসেছেন শুনে লিণ্টন গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘোড়-সওয়ার হয়ে বসলো, ক্যাথি চলে গেল তার ঘরে। আমি খুদে হেয়ারটনকে লুকিয়ে রাখতে চললাম। মনিব তো এমনি মুহূর্তের উত্তেজনায় কাণ্ডাকাণ্ড হারিয়ে ফেলেন, তখন পাখী মারার গাদা বন্দুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। তখন কেউ তাঁকে চটালে, বা তার নজরে পড়লে সে গুলী খাবেই! আমি ঠিক করলাম, ওটা সরিয়ে রাখবো, কি জানি যদি গুলিই চালিয়ে বসেন!

নয়

মনিব ঢুকলেন, এমন গাল দিচ্ছিলেন যে শুনলে ভয় লাগে। রান্নাঘরে ওঁর ছেলেকে আলমারীর পিছনে লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছিলাম, উনি দেখে ফেললেন। খুদে হেয়ারটন তো ওঁর ঐ হিংস্র শাপদের মতো ভালবাসা বা উন্মাদের মতো ক্রোধ দুটোকেই ভয় পায়। একটিতে তো আছে আলিঙ্গনে নিপীড়নে চুম্বনে মৃত্যুর দুর্ঘটনা; অপরটিতে আছে আগুনে নিক্ষেপ আর দেয়ালে আছড়ে ফেলার ভয়। তাইত বেচারীর মুখে রা'টি নেই।

কুকুরকে যেমনি করে টুটি টিপে ধরে তেমনি করে আমার ঘাড় ধরে টেনে এনে হিণ্ডলে বলে উঠলেন, এইবার তো পেয়েছি! তুই ছেলেটাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছিস্! ওকে কেন আমার কাছ থেকে দূরে দূরে রাখিস

তাও বুঝেছি! কিন্তু আমার সঙ্গে শয়তানিতে পারবি, আমি তোকে ছুরি গিলিয়ে টেরটি পাইয়ে ছাড়ব নেলি! না, না, হাসি নয়; এই তো এই মাত্র কেনেথটাকে মাথা নিচুদিকে দিয়ে হাওরের পাঁকে পুঁতে রেখে এলাম। একজনকে খুন করাও যা—দুজনকে করাও তাই। তোদের খুন করে তবে আমার শান্তি।

বললাম, ছোট কর্তা, তোমার ছুরি গেলাতে হবে না। বরং গাদা বন্দুকটা এনে গুলী করেই নিকেশ করে দাও!

তুই গোল্লায় যা, তিনি বলে উঠলেন। ইংলণ্ডে এমন কোনো আইন নেই যে, নিজের বাড়ি সামলে রাখা যাবে না। কিন্তু আমার বাড়িখানা তো এক নরক! নে, হাঁ কর তো!

ছোট কর্তা ছুরিখানা নিয়ে তার ডগাটা আমার দাঁতের ভিতর পুরে দিলেন। আমি থুথু ফেলে জানালাম, ওর স্বাদটা মোটেই ভাল নয়। ও আমার চলবেনা। ওঁর রকম-সকম দেখে এত ভয় কখনো পাইনি।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, দেখছি, ওটা হেয়ারটন নয়। নেলি, ও যদি হেয়ারটনই হোত, আমাকে দেখে ছুটে না এলে, ওর ছাল জ্যান্ত ছাড়িয়ে নিতাম না! কিন্তু এটা তো ভূতের বাচ্চার মতো শুধু চেঁচায়। এই বেজন্মা, এদিকে আয়! ভাল বাপ পেয়ে তার উপর এমনি করার মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি! আচ্ছা নেলি, তোর কি মনে হয় ওর চুল ছেঁটে দিলে ওকে আরও সুন্দর দেখাবে? কুকুরের লোম ছাঁটলে তো ভীষণ দেখায়, আমার ভালও লাগে। কাঁচিটা দে তো—একেবারে ভয়ংকর করে ওকে ছাড়ব। তাছাড়া এত বড় কানই বা রাখা কেন—ও দুটো ছাড়াও তো আমরা আস্ত এক-একটা গাধা। এই বাচ্চা, চুপ, চুপ! বাহারে, আয় কাছে আয়—চোখ মুছে ফেল—আমাকে একটা হামি দে! কি রে দিবি নে! দে—হামি দে! তবে রে, তোর আমি ঘাড় মটকে তবে ছাড়ব।

বেচারী হেয়ারটন তখন বাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য হাত পা ছুঁড়ছে, চেঁচাচ্ছে। উনি যখন ওকে দোতালায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন চীৎকার আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। তিনি রেলিঙের ওপর ওকে তুলে বসিয়ে দিলেন।

চেঁচিয়ে বললাম, ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে যে ফিট হয়ে পড়বে গো। ওকে উদ্ধার করতেই ছুটলাম। ওদের কাছে এসে পৌছেছি, দেখি, হিণ্ডলে রেলিঙের উপর কান পেতে আছেন। নীচে গোলমাল। হাতে কি আছে ভুলে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ও কে? সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, উঠে আসছে শব্দ। আমিও ঝুঁকে পড়লাম। ও পায়ের শব্দ আমি চিনি, হিথক্লিফ আসছে। ওকে ইসারায় উঠে আসতে বারণ করে দেব। হেয়ারটনের দিক থেকে নজর সরে গেছে। ও হঠাৎ লাফ দিলে, অসতর্ক হাতের বাধন থেকে মুক্তি পেয়ে পড়ে গেল নীচে।

আশঙ্কার শিহরণ অনুভব করবার সময়ও পেলাম না, দেখলাম খুদে শিশু নিরাপদেই আছে। এই সংকট মুহূর্তে হিথক্লিফ এসে পড়েছিল ঠিক নীচে, স্বাভাবিক ভাবেই সে পতন নিবারণ করে ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এবার তাকালে মুখ তুলে, এই দুর্ঘটনার স্রষ্টাকে সে খুঁজছে। এ যেন এক কৃপণ—সুরতি খেলার একখানা টিকিট পাঁচ শিলিঙে বিক্রি করে দিলে, পরদিন দেখলে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের দাঁও তার ফসকে গেছে—আর্ণ-শকে দেখে ওর মুখখানা বুঝি সেই হতভাগ্য কৃপণের চেয়েও বিবর্ণ হয়ে গেল। নিজের প্রতিশোধকে ব্যর্থ করে দেয়ার উপলক্ষ্য সে হোল, এতে তার মনে ঘনিয়ে এল তীব্র ব্যথা—তারই ব্যঞ্জনা তো কথার চেয়ে আরো তীব্রভাবে ফুটে উঠলো মুখে। আমি বলতে পারি, যদি অন্ধকার হোত, সে খুদে হেয়ারটনের মাথার খুলি সিঁড়িতে আছড়ে ভেঙে ফেলে এ ভুল সংশোধন করতো; কিন্তু খুদে হেয়ারটনের উদ্ধারের যে জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী ছিলাম আমরা। আমি গিয়ে তাড়াতাড়ি বাছাকে কোলে তুলে নিলাম। হিণ্ডলে আস্তে আস্তে নেমে এলেন। নেশা কেটেছে, বুঝি বা তিনি লজ্জিত।

বললেন, তোমারই দোষ এলেন, ওকে আমার চোখের আড়ালে রাখতে পার না! আমার কোল থেকে ওকে নিয়েও তো যেতে পারতে! ওর কি কোথাও চোট লেগেছে?

চোট লেগেছে! রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম, ও যদি মারা না যায় তো, অমনি চোট পেয়ে হাবা হয়ে থাকবে। তুমি ওর সঙ্গে যা করছ, তাতে ওর মা

গোর থেকে উঠে না আসেন! যে ধর্মকর্ম মানেনা, তারও বাড়া তুমি—নিজের রক্তমাংসের বাছাকে কেউ এমন করে গা!

তিনি হাত দিয়ে ছেলেকে একটু ছুঁতে গেলেন, অমনি ও কঁকিয়ে উঠলো। এমন হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো মনে হোল যেন তড়কা হয়েছে।

বললাম, ওকে নিয়ে আদর-আহ্লাদ তোমাকে করতে হবে না, ও, তোমাকে ঘেন্না করে—সবাই করে। হাঁ এতো সাঁচ্চা কথা। কি সুখের সংসার ছিল তোমার—আর দেখ কি তাকে করে তুলেছ!

নেলি, এখনি কি; আরো কি করি দেখবি! বিপথগামী মানুষটি বলে উঠলো, ওর সেই কাঠিন্য আবার ফিরে এসেছে, এখন এখান থেকে ওকে নিয়ে চলে যাও। আর হিথক্লিফ, তুমি শোন, আমার ছায়াও আর মাড়িয়ো না। হয় আজ আমি তোমাকে খুন করবো, নয়তো বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে দেব। কি জানি কখন কি মনে হয়।

এই বলে তিনি ব্র্যাণ্ডির একটা পাইট বোতল আলমারী থেকে বার করে নিয়ে খানিকটা গেলাসে ঢাললেন।

আমি কত কাকুতি-মিনতি করে বললাম, না, না, কর্তা গো, ওসব ছাই ভস্ম খেয়ো না। একটু সাবধান হও। নিজের উপর না হয় মায়া নাই হোল, এই বাচ্চাটার উপর কি মায়া হবে না।

তিনি জবাব দিলেন, আমার চেয়ে তুমিই তো বেশি মায়া দয়া দেখাতে পারবে। নিজের আত্মার উপর একটু মায়া হয় না গা? ওঁর গেলাসটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করলাম। না, না! বরং ওকে নরকে পাঠিয়েই আমার আনন্দ, এমনি করেই আমার সৃষ্টিকর্তাকে আমি শাস্তি দিতে চাই। নাস্তিকটা ঐ কথা বললে। এইবার জাহান্নমে যাক আত্মা!

উনি মদ গিলে অসহিষ্ণু হয়ে আমাদের চলে যেতে বললেন। শেষে তো গালিগালাজ দিতেই শুরু করলেন। সেগুলো অকথ্য তো বটেই, মনে করেও রাখা উচিত নয়।

হিথক্লিফ দরজা বন্ধ হতে বিড়বিড় করে ওঁর গালাগালের প্রতিধ্বনি তুলে বললে, ও যে মদ খেয়ে আত্মহত্যা করে না কেন তাই ভাবি। চেষ্টার তো ত্রুটি নেই, কিন্তু ওর জানটা কড়া। কেনেথ তো বলেন, ও গিমারটনের সকলের চেয়ে বেশী বাঁচবে। এর জন্যে তিনি নিজের ঘোড়াটা বাজি রাখতেও পারেন। ও বুড়ো হয়ে কবরে সেধোঁবে ; অবশ্য যদি একটা অস্বাভাবিক কিছু না ঘটে যায়।

রান্না ঘরে চলে এলাম। ঘুম পাড়াতে বসলাম বাচ্চাকে। হিথক্লিফ খামার বাড়ির দিকে চলে গেল বলেই মনে হোল। ও কিন্তু বেশী দূর যায় নি, দেয়ালের কাছে একটা বেঞ্চির উপর চুপচাপ শুয়েছিল।

হেয়ারটনকে কোলে নিয়ে দোলাতে লাগলাম, আর গুন গুন করে গাইছিলাম গান।

ক্যাথি নিজের কামরা থেকে গোলমাল শুনতে পেয়েছিল, সে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিসিয়ে ডাকলে, নেলি একা আছ ?

হাঁ গো, উত্তর দিলাম।

ও ঘরে এসে আগুনের কাছে দাঁড়ালো। ও কিছু বলতে চায় ভেবে মুখ তুলে তাকালাম। ওর মুখের অভিব্যক্তি উদ্বিগ্ন, বিভ্রান্ত। ঠোঁট আধ-খোলা, যেন সে কি বলতে চায় ; একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো। দীর্ঘশ্বাসে পর্যবসিত হোল কথা। আমি আবার ঘুম পাড়ানি গান শুরু করলাম। ওর ব্যবহার তো ভুলতে পারি নি।

বাধা দিয়ে বললে, হিথক্লিফ কোথায় ?

জবাব দিলাম, আস্তাবলে কাজ করছে।

হিথক্লিফ হয়তো তখন ঘুমিয়ে গেছে, তাই আমার কথায় বাধা দিলে না। আবার দীর্ঘ বিরতি। দেখলাম, ক্যাথেরিনের গাল বেয়ে দু-এক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো মেঝের উপর। ওর এই নির্লজ্জ ব্যবহারের জন্য ও কি দুঃখিত ? নিজেকেই জিজ্ঞেস করে বসলাম। এতো এক নতুন জিনিষ। কি বলতে চায় ও বলুক—আমি তো ওকে সাহায্য করব না ! হয়তো নিজের ব্যাপারে নয়, অন্য ব্যাপারেই ও উদ্বিগ্ন।

অবশেষে ও বললে, উঃ কি দুঃখ যে আমি সইছি আমিই জানি।

বললাম, কথা শোন না মেয়ের! তোমাকে খুশি করাই শক্ত। এত বন্ধুবান্ধব, আর ভাবনা-চিন্তারও বালাই নেই। এতে খুশি হতে পারছ না বুঝি!

নেলি, আমার একটা কথা গোপন রাখবে? আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওর ঐ বিজয়ী চোখ দুটি আমার মুখের উপর রাখলে। সে এমনি দৃষ্টি, রাগ বুঝি উবে যায়, অথচ রাগে শরীর জ্বলে যাওয়াই হয়তো উচিত।

কথাটা কি গোপন রাখবার মতো? গোমড়া মুখে জিজ্ঞেস করলাম।

হাঁ গো, হাঁ, উদ্বেগে আছি, বলে ফেলতে চাই। তোমাকে জিজ্ঞেস করি, আমি কি করবো? আজ এড্গার লিণ্টন আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। ওকে একটা জবাব ও দিয়েছি। সেটা সম্মতি কি অসম্মতি বলার আগে তোমাকে বলতে হবে, কোন্টা হওয়া উচিত।

ওকে বললাম, তাইত ক্যাথি, আমি কি জানি! আজ বিকেলে ওর সামনে যে কাণ্ডটা করলে, তাতে তো মনে হয় ওকে কথা না দেওয়াই ভাল; এত কাণ্ডের পরেও যখন বিয়ের প্রস্তাব করেছে, তখন ছেলেটা নিশ্চয়ই অতি বোকা, নয়তো অতি তার সাহস!

যদি মান করে কথা বল, তাহলে আর কথাটি কইব না, সে রেগে-মেগে উঠে পড়লো। আমি ওকে কথা দিয়েছি নেলি। চটপট বলতো, আমি কি ভুল করলাম!

ওকে কথা দিয়েছ! তাহলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ কি? কথা যখন দিয়েছ, তখন তো আর ফেরানো চলে না।

ও-কিন্তু একথা তো বলতে পারে, আমার উচিত হয়েছে কি হয়নি, বিরক্ত হয়েই সে উঠলো। হাত মোচড়াচ্ছে, ভ্রূকুটি তার মুখে।

ওকথার ঠিক ঠিক জবাব দেয়ার আগে আর একটা জিনিব ভেবে দেখা উচিত। প্রথম আর আসল কথাটা হচ্ছে, তুমি এড্গারকে ভালবাস কি না?

কে ওকে ভাল না বেসে পারে বল? নিশ্চয়ই ভালবাসি। ও জবাব দিলে।

ওকে এবার কথার প্যাঁচে ফেলে বুঝিয়ে দিতে চাইলাম। বাইশ বছরের মেয়ের পক্ষে সে তো বেমানান নয়। প্রশ্ন আর উত্তরে এমনি ভাবে চললো শিক্ষা। বললাম, ক্যাথি, তুমি ওকে কেন ভালবাস ?

কি বাজে বকছ—ভালবাসি—সেইটেই তো যথেষ্ট।

না, তা তো হতে পারে না। তোমাকে বলতে হবে কেন ভালবাস ?

বেশ তো, ও সুন্দর, ওর সঙ্গ ভাল লাগে তাই।

কথাটা কিন্তু ভাল নয়, মন্তব্য করলাম।

ও তরুণ, সজীব—তাই।

এটাও ভাল ঠেকছে না।

ও আমাকে ভালবাসে।

এটায়ও ঠিক বোঝা গেল না, তবে প্রায় কাছে গিয়ে পৌঁছেছ।

ও বড় লোক, আমি এই অঞ্চলের সবার চেয়ে বড় হব, স্বামী-গর্বে আমি হব গর্বিত।

এটা তো আরো খারাপ ঠেকছে। এবার বলতো, ওকে তুমি কেমন ভালবাস ?

সবাই যেমন ভালবাসে। নেলি, তুমি বড় বাজে বকছ !

না, মোটেও নয়—আমার কথার উত্তর দাও।

ও-যে মাটিতে পা ফেলে চলে, সেই মাটিকে আমি ভালবাসি, ওর মাথার উপর দিয়ে যে বাতাস বয়ে যায়, যে জিনিষ ও ছোঁয়, ও যে কথা বলে—সব আমি ভালবাসি ! ওর সমস্ত কাজ, ওর চেহারা সবকিছু আমার ভাল লাগে। ওকে আমি ভালবাসি—ভালবাসি। কি, হোল তো !

কিন্তু কেন ?

না ! তুমি ঠাট্টা শুরু করেছ। কিন্তু নেলি, এতো অতি খারাপ কথা। আমার কাছে এতো তামাসা নয়, যুবতী মুখ বিকৃত করে আগুনের দিকে ফিরে বসলো।

[illegible]লাম, ক্যাথি, আমি একটুও তামাসা করছি না, তুমি এড্‌গারকে সে সুন্দর, সে তরুণ, সজীব, আর বড় মানুষ বলে ভালবাস, সে তোমাকে ভালবাসে

বলেই ভালবাস। কিন্তু শেষটার দাম কি বলতো? ও ছাড়াও তো তুমি তাকে ভালবাসতে, বোধহয় আগের চারটে গুণ ওর না থেকে শুধু যদি ঐটে থাকত তাহলে নিশ্চয়ই ভালবাসতে না?

না, নিশ্চয়ই নয়! ওকে দেখে শুধু করুণাই হোত—ও যদি কুৎসিৎ হোত, একটা সং হোত, ওকে দেখে ঘৃণাই করতাম।

কিন্তু পৃথিবীতে তো আরও অনেক সুন্দর, টাকাকড়িওয়ালা ছেলে আছে; ওর চেয়ে তারা হয়তো দেখতেও সুশ্রী, পয়সাকড়ি ও তাদের বেশী। ওদের ভালবাসতে পারলে না কেন? কোথায় বাধা পেলে।

যদি থেকে থাকে, আমার তারা নাগালের বাইরে! এড্গারের মত আর কাউকে তো আমি দেখিনি।

এমন কাউকে হয়তো দেখতেও পার। আর ওতো চিরদিন এমনি সুন্দর, এমনি কম বয়েসী থাকবে না; তাছাড়া টাকাকড়ি তো চিরদিন ওর নাও থাকতে পারে।

ও—এখন তো ওর টাকাকড়ি আছে; আমার বর্তমান নিয়েই কারবার। তুমি একটু ভেবে কথা বল তো নেলি।

তাহলেই গেল, যদি বর্তমান নিয়েই তোমার শুধু কারবার হয় তাহলে লিণ্টনকে বিয়ে করে ফেল।

তার জন্যে তোমার দরকার হবে না—ওকে আমি বিয়ে করবোই; কিন্তু এখনো তো বললে না, আমি ঠিক কাজ করছি কি না।

ঠিক বলে ঠিক! অবশ্য যদি শুধু বর্তমান দেখে বিয়ে করাই মানুষের ঠিক হয়—কিন্তু এখন শুনি তো, কি নিয়ে আবার মন খারাপ হোল? তোমার ভাই খুশিই হবেন, বুড়োবুড়ীও আপত্তি করবেন না বোধহয়। তুমি এমন এলোমেলো অগোছালো বাড়ি থেকে বনেদী বড় মানুষের ঘরে যাবে। তুমি এড্গারকে ভালবাস, এড্গার তোমাকে ভালবাসে—আর কি চাই! একেবারে সবকিছু তো এখন সোজা—এতে আবার বাধাটা কোথায়?

এইখানে, এইখানে—বাধা! ক্যাথেরিন এক হাত দিয়ে কপাল আর এক হাত দিয়ে বুক চাপড়ে বলে উঠলো, যেখানে আত্মা থাকে, সেইখানেই তো বাধা। আমার আত্মা আর আমার মন তো বলছে, আমি ভুল করছি।

এতো বড় অদ্ভুত কথা! আমি তো মাথামুণ্ডু বুঝে উঠতে পারছি না।

এই তো আমার গোপন কথা নেলি। তুমি যদি ঠাট্টা না কর, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারি। স্পষ্ট করে হয়তো বোঝাতে পারব না, শুধু আমার মনে কি হচ্ছে তা হয়তো বলতে পারব।

আবার আমার পাশে এসে ও বসলো, ওর মুখ এখন বিষণ্ণ, আরো গম্ভীর, ওর হাত দুখানি কাঁপছে।

নেলি, তোমার কি কোন অদ্ভুত স্বপ্ন মনে পড়ে? কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে ও হঠাৎ বলে উঠলো। হাঁ, মাঝে মাঝে দেখি বটে! আমি বললাম।

আমিও দেখি। জীবনে এমন স্বপ্ন দেখেছি, যা চিরদিনের জন্য আমার সঙ্গী হয়ে আছে। আমার মনই বদলে গেছে। জলের ভিতরে যেমন মদ মিশে মিশে যায়, তেমনি আমার ভিতরে মিশে গেছে সেই স্বপ্নগুলি। আমার মনের রং বদলে দিয়েছে। এও তেমনি এক স্বপ্ন—আমি এ স্বপ্নের কথা তোমাকে বলব—কিন্তু খবর্দার—তুমি হাসবে না নেলি!

না গো না, ক্যাথি! চেঁচিয়ে উঠলাম। ভূত-প্রেত-দানো ছাড়াই তো আমরা মুখ গোমড়া করে থাকে। খুশি হও দেখ গো, খুদে হেয়ারটনের দিকে তাকিয়ে দেখ কেমন ঘুমিয়েছে! ও স্বপ্ন দেখে, কিন্তু অদ্ভুত স্বপ্ন তো নয়। দেখ, দেখ, কেমন মিষ্টি হাসি হাসছে স্বপ্নে!

হাঁ, ও মিষ্টি হাসি হাসে ঘুমে, আর ওর বাবা তার অবসর মুহূর্ত্তে আপন মনে গাল দেয়। ও যখন এমনি নাদুস নুদুস খোকাটি ছিল তখনকার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ে। এমনি নিষ্পাপ শিশু ছিল ও। যাহোক, নেলি—তোমাকে শুনতেই হবে। এমন কিছু বড় স্বপ্ন নয়। আজ রাত্তে খুশি হবার মতো মন তো আমি হারিয়ে ফেলেছি নেলি!

না, আমি তোমার কথা শুনব না, শুনব না! তাড়াতাড়ি বললাম।

তখন স্বপ্ন সম্বন্ধে আমার ছিল কুসংস্কার। এখনো আছে। ক্যাথির মুখখানা সেদিন ছিল বড় গম্ভীর। দেখে ভয়ই হচ্ছিল, হয়তো তার থেকে একটা ভবিষ্যদ্‌বাণীই করে ফেলব, এক মহা সর্বনাশই দেখতে পাব। ও বিরক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু শুরু করলে না ওর কথা। অন্য বিষয়েই বুঝি চলে গেল। সে কিছুক্ষণ পরে বললে, নেলি, এখন যদি স্বর্গেও যাই, মনে সুখ পাব না, বরং খুবই খারাপ লাগবে।

তার মানে তুমি স্বর্গে যাবার উপযুক্ত নও। পাপীরাই স্বর্গে গিয়েও দুঃখ পায়।

না, তা তো নয়। একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি স্বর্গে গেছি।

বলেছি তো ক্যাথি, তোমার স্বপ্নের কথা আমি শুনবো না! আমি এখন শুতে যাব, ওকে বাধাই দিলাম।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, ও হেসে বাধা দিলে, বসিয়ে রাখলে।

বললে, এমন কিছু নয় সে স্বপ্ন। আমি শুধু বলতে যাচ্ছিলাম, স্বর্গে আমার স্থান হতে পারে না। তাই সেদিন পৃথিবীতে আমার জন্যে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। দেবদূতরা তো এমন চটে গেলেন, ওঁরা আমাকে ওয়াদারিং হাইটস্‌-এর জলায় ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। আমি জেগে উঠলাম। তখন খুশিতে ফোঁপাচ্ছি। এতেই আমার গোপন কথা বুঝতে পারবে। আমার স্বর্গে থাকার যেমন ইচ্ছে, এড্‌গার লিন্টনকে বিয়ে করার ইচ্ছেও তেমনি। ঐ হিণ্ডলে যদি আজ হিথক্লিফের এই দশা না করতো, আমি তো বিয়ের কথা ভাবতামই না। হিথক্লিফকে তো এখন বিয়ে করা যায় না, ও কত নীচে নেমে গেছে তা তো দেখছই। ও তো কখনো বুঝতেই পারবে না, ওকে আমি কত ভালবাসি। নেলি, ও সুশ্রী কিনা সে কথা কে ভাবে! আমার সম্পূর্ণ আমিকে ওর ভিতরে যত দেখতে পাই, আমার নিজের ভিতরেও তো ততখানি দেখতে পাইনে। আমাদের আত্মা যা দিয়েই গড়া হোক নেলি, ওর আর আমার আত্মা তো এক; আর

লিন্টন তো তার চেয়ে কত আলাদা—যেমন আলাদা বিদ্যুতের চেয়ে চাঁদের আলো—যেমন আলাদা বরফ আর আগুন।

কথা শেষ হবার আগেই, আমি টের পেলাম, হিথক্লিফ সেখানে হাজির। একটু শব্দ শুনে, মুখ ফিরিয়ে দেখি, ও বেঞ্চিখানা থেকে উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ও এতক্ষণ শুনছিল, কিন্তু ক্যাথেরিন যখন বললে, ওকে বিয়ে করলে মাথা হেঁট হয়ে যাবে, তখন আর শোনার জন্যে বসে রইল না। আমার সাথী মেঝেয় বসেছিল, তাই ওর উপস্থিতে আর চলে যাওয়া দেখতে পেলে না। আমি কিন্তু চমকে উঠে ওকে চুপ করতে বললাম। কেন? ও চারদিকে শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে বললে।

জোসেফ আসছে, এই সময়ে ওর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম পথে তাই বললাম, ওর সঙ্গে হিথক্লিফও এসে পড়বে। এতক্ষণে দোর-অবধি এসে গেছে কিনা জানি না। দরজা থেকে শুনতে পাবে না, ও বললে। আমার কাছে বাচ্চাকে দাও, তুমি খাবার যোগাড় দেখ। যখন সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে, আমাকে ডেকো, আমি তোমার সঙ্গে বসে খাব। আমার এই অস্থির বিবেককে আমি ভুলিয়ে রাখতে চাই নেলি, তাকে বোঝাতে চাই যে, হিথক্লিফ এ ভালবাসার বিন্দুবিসর্গও জানে না—বোঝে না। ও কি সত্যিই জানে নেলি—সত্যিই বোঝে? ও কি জানে ভালবাসলে মানুষের কি হয়?

বললাম, তুমি বুঝতে পারছ, আর সে পারবেনা কেন, আমি তো কারণ খুঁজে পাইনে। তোমাকে পছন্দ করলে, ওর তো আর দুঃখের অবধি থাকবে না। তুমি যেই লিন্টন-গিন্নী, হবে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্ব, ভালবাসা সব হারাবে। একবার ভেবে দেখছ কি, কি করে সে এই বিচ্ছেদ সইবে গো, সমস্ত পৃথিবী যে তাকে ছেড়ে যাবে, তখন কি উপায় হবে? ক্যাথি বলতো।

কি বলছ তুমি! ওকে সমস্ত পৃথিবী ছেড়ে যাবে, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো? রাগে সে জ্বলে উঠলো। কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে শুনি? এলেন যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, কে আমাদের আলাদা করে দেবে—কোনো মানুষ তো পারবে না। পৃথিবী থেকে লিন্টনদের সবকিছু মুছে যেতে পারে, কিন্তু

হিথক্লিফকে তো আমি ছাড়তে পারব না। না-না আমি তা চাই না। এত দাম দিতে হলে আমি লিণ্টন-গিন্নী হতে চাইনা। ও যা ছিল, আমার কাছে তাই-ই আছে। এড্‌গারের ওর প্রতি বিদ্বেষ আছে, সে বিদ্বেষ দূর করে দিতে হবে। ওকে সহ্য করতে শিখতে হবে। আমার মনের ভাব টের পেলে ও তা করবেও! নেলি, এখন আমি বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ঘোর স্বার্থপর বলে ভাব, কিন্তু একথা কি একবার ভেবেছ যে, হিথক্লিফ আর আমাতে বিয়ে হলে, আমরা ভিখারী হয়ে থাকব? আর যদি লিণ্টনকে বিয়ে করি, হিথক্লিফকে আমি জীবনে উন্নতি করতে সাহায্য করতে পারব, আমার ভাইয়ের শাসন থেকে ওকে আমি মুক্ত করব।

শুধালাম, ক্যাথি, কি বললে, তোমার স্বামীর টাকায় ওর ভালোই করবে? যত সোজা লোক ভাবছ, তত সোজা লোক ও নয়। আমার অবশ্য তেমন বুদ্ধি নেই, তাহলেও বলবো, তোমার লিণ্টন-গিন্নী হবার উদ্দেশ্যটাও খুব সুবিধে বলে মনে হচ্ছেনা।

কেন নয়, এইটেই আমার সেরা উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যগুলো তো খেয়াল-খুশির ব্যাপার। এ তো তারই জন্য—এড্‌গার আর নিজের প্রতি আমার যে ভালবাসা আছে তাকে সে এক করে মিলিয়ে নিয়েছে নিজের সত্তায়। আমি তো তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না; কিন্তু আমরা সবাই তো মনে করি আমাদের শুধু বেঁচে থাকা ছাড়াও আর একটা জীবন আছে। আমি যদি এখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইলাম তাহলে আমার এই জীবনের মূল্যটা কি? হিথক্লিফের দুঃখই আমার দুঃখ, আর সে-দুঃখ তো আমি তিলেতিলে ভোগ করছি, আমার বাঁচার সমস্ত কামনা ওকে ঘিরে আছে। যদি সবাই ধ্বংস হয়ে যায়, আর ও বেঁচে থাকে; আমিও বেঁচে থাকব, আর যদি সবাই বেঁচে থাকে, ও ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তো পৃথিবী আমার কাছে অচেনা ঠেকবে। আমি যে পৃথিবীরই একজন একথা তো মনে হবে না। লিণ্টনের প্রতি আমার ভালবাসা তো বনের গাছের পাতার মতো, সময় তাকে বদলে দেবে। শীতে যেমন গাছের চেহারা হয়, তেমনি হবে তার দশা। আর হিথক্লিফের প্রতি

আমার ভালবাসা সেই চিরন্তন পাথরের মতো। মাটির বুকে থাকে পাথর, দেখে চোখ জুড়োয় না, কিন্তু তবু তো তার প্রয়োজন আছে। নেলি, আমিই তো হিথক্লিফ। ওতো সব সময়ে আছে আমার মনে। শুধু সুখ স্মৃতি হয়েই জেগে নেই, ও আমার সত্তা হয়েই আছে। তাই আমাদের বিচ্ছেদের কথা বোলো না—সে তো অসম্ভব। আর—

একটু থামলো ক্যাথি, আমার পোষাকের ভিতরে মুখ লুকালো। আমি ওকে সরিয়ে দিলাম। ওর নির্বুদ্ধিতায় তখন আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে।

বললাম, তোমার কথা যদি ছাই বুঝতাম! আমার শুধু মনে হচ্ছে, বিয়ের দায়-দায়িত্ব কি তুমি জান না; নয় তো তুমি খারাপ মেয়ে। যাহোক বাপু, আমাকে আর তোমার গোপন কথা বলে জ্বালাতে এস না। আমি ওসব কথার কি ধার ধারি বল! আমি কোনো কথা দিতে পারব না।

তুমি তো এই গোপন কথাটা রাখবে?

না, আমি কথা দেব না।

ও পেড়াপীড়ি করতে যাবে এমন সময় জোসেফ এসে আমাদের আলাপে ছেদ টেনে দিলে। ক্যাথেরিন এককোণে সরে গিয়ে হেয়ারটনকে নিয়ে আদর করতে শুরু করলে। আমি রাতের খাবার তৈরী করতে লাগলাম। রান্না হয়ে গেলে এবার রান্নাঘরের অপর দাসীটির সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলাম, মনিবকে কে খাবার দিয়ে আসবে। খাবার তো জুড়িয়ে প্রায় হিম, তবু ঝগড়া থামলো না। এবার ঠিক হোল, আগে জিজ্ঞেস করা যাক, উনি খাবেন কিনা। উনি একা থাকলে আমরা তো কখনো কাছে ঘেঁষি না।

বুড়োটা চারদিক তাকিয়ে হিথক্লিফকে দেখতে না পেয়ে বললে, ও কি এখনো মাঠ থেকে ফেরেনি। কি করছে? একেবারে কুঁড়ের ধাড়ী।

বললাম, ওকে ডেকে আনছি। ও নিশ্চয়ই খামারে আছে।

বেরিয়ে গিয়ে ডাকলাম, কোনো উত্তর নেই। ফিরে এসে ক্যাথির কানে কানে বললাম, ওর কথার প্রায় সবখানিই হিথক্লিফ শুনে ফেলেছে। ও যখন ওর উপর ভাইয়ের দুর্ব্যবহারের কথা বলছিল, তখন আমি ওকে নিঃশব্দে

রান্নাঘর ছেড়ে চলে যেতে দেখেছি। ক্যাথি তো ভয়ে লাফিয়ে উঠে খুদে হেয়ারটনকে একরকম ছুঁড়ে ফেলে দিলে; তারপর নিজেই ছুটলো বন্ধুর খোঁজে। কেন যে এত বিভ্রান্ত সেকথা বিচার করলে না, একবার ভেবে দেখলেনা ওর কথা শুনে হিথক্লিফের এখন কি অবস্থা। ওর দেরী হচ্ছে দেখে, জোসেফ বললে, আমাদের আর বসে থাকলে চলবে না। ভাবলাম ওরা ওর দেড়গজি-দুগজি আশীর্ব্বাদ শুনতে রাজি নয় বলেই পালিয়েছে। ও রাতে আবার প্রার্থনার তোড়জোড় করবে। এখানে ভাবছি, হঠাৎ ক্যাথি ছুটে এসে হুকুম দিলে, হিথক্লিফকে খুঁজে আনতে হবে।

ও বললে, ওর সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই, উপরে যাবার আগেই আমাকে বলতে হবে। ফটক খোলা, ও নিশ্চয়ই এখন অনেক দূরে।

জোসেফ প্রথমে আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু ও তখন এত উদগ্রীব যে ওজর-আপত্তি ভেসে গেল। জোসেফ শেষে টুপীটা মাথায় দিয়ে গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে পড়ল। ক্যাথেরিন পায়চারি করতে লাগলো ঘরময়। সে এবার বলে উঠলো :

কোথায় গেল—কোথায় যেতে পারে? নেলি, বলতো আমি কি বলেছিলাম? আমি তো ভুলে গেছি। আজ বিকেলে ও কি আমার উপর চটে গিছলো। ওকে কি আমি ব্যথা দিয়েছিলাম। ও আসুক, ফিরে আসুক!

আমিও তখন অস্বস্তি পোহাচ্ছি, তবু বললাম, একটুতেই যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে! হিথক্লিফ এখন চাঁদের আলোয় বেড়াতে বেরিয়েছে, তাতে অতো ভয় পাবার কি আছে বলতো, নয়তো খড়ের গাদায় মুখ গোমড়া করে শুয়ে আছে। আমার তো মনে হয় ওকে খড়ের গাদায়ই পাবে। তুমি দেখ, আমি ওকে খুঁজে বার করে দিচ্ছি।

আবার খুঁজতে বেরুলাম। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হোল। জোসেফেরও একই দশা। জোসেফ ফিরে এসে বললে, একেবারে ফটক খোলা রেখে গেছে গো, আর মিসিবাবার টাট্টুটা ক্ষেতের ফসল মাড়িয়ে একশা করে দিয়েছে,

ক্যাথেরিন তাকে বাধা দিয়ে বললে, এই গাধা, হিথক্লিফকে দেখতে পেলে? আমার হুকুম-মতো ওকে খুঁজেছিলে?

আমার তো টাট্টু ঘোড়াটা খোঁজাই উচিত ছিল, জোসেফ জবাব দিলে। তাতে তবু খানিকটা আক্কেল ছিল কিন্তু এমন কালো আঁধার রাত যে ঘোড়া আর মানুষ কোনটাই চেনা যায় না—বাবাঃ কালো যেন ঝুল! আর হিথক্লিফ কি তেমনি ছেলে যে শিস দেব আর ছুটে আসবে। তোমার ডাক শুনলে তবে ওর কান খাড়া হয়।

গ্রীষ্মের রাত! তবু অন্ধকার যেন আরো ঘন আর কালো। বজ্রগর্ভ মেঘ জমেছে। তাই বললাম, আমরা তার চেয়ে অপেক্ষা করি। বৃষ্টি আসন্ন। ওকে বাড়ি ফিরে আসতেই হবে। কিন্তু ক্যাথিকে তো শান্ত করা গেল না। সে পায়চারি করছে, একবার ফটক অবধি যাচ্ছে, আবার ফিরে ফিরে আসছে। সে উত্তেজিত। বিশ্রাম নেই তার। এবার পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে রইল। বাজ হাঁকছে আকাশে, ওর আশেপাশে পড়ছে বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি, তবু আমার কাকুতি-মিনতি শুনলে না। ঠায় রইল! মাঝে মাঝে ডাকছিল, আবার কান পেতে কি শুনছিল। এবার কেঁদে উঠলো। সে কি কান্না—খুদে হেয়ারটন, কি যে-কোনো শিশুর কান্নাকেও হার মানায়।

রাত দুপুর হোল, তখনো আমরা বসে। ঝড় বয়ে চলেছে প্রচণ্ড বেগে, হাইটস্-এর উপর দিয়ে দুর্দম হাওয়া. আর আছে বাজ, বাড়ির কোণের একটা গাছ ভেঙে পড়লো ঝোড়ো হাওয়ায়, কি বাজ পড়ে। একটা প্রকাণ্ড ডাল এসে পড়লো ছাদে। চিমনির একটা কোণ ধ্বসিয়ে দিয়ে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো সশব্দে পাথর; চিমনির ঝুল এসে পড়লো উনুনে। মনে হোল যেন, বাজ পড়েছে আমাদের মাঝখানে। জোসেফ তখন হাঁটু গেড়ে বসে গেছে প্রার্থনায়; সেই প্রলয় কালে গোষ্ঠিপতি নোয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ধার্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকে তো তিনি রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু নাস্তিকদের উপর পড়েছিল তাঁর চরম দণ্ড। আমিও ভাবলাম, আমাদেরই বুঝি

দণ্ডস্বরূপ এল এই ঝড়। ঝড়ের এই তুমুল কলরোল বিশ মিনিটের ভিতরেই থেমে গেল; সবাই আমরা নিরাপদেই আছি। এক ক্যাথিই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে—ও যা একগুঁয়ে কিছুতেই বসে থাকতে চায় না। বারে বারে ছুটছে বাইরে। এবার এসে এলিয়ে পড়লো।

ওর কাঁধে আলতোভাবে ছুঁয়ে দিয়ে বললাম, ক্যাথি, নিজের মরণ চাও নাকি গো? জান, এখন ক'টা বেজেছে? সাড়ে বারোটা! চল, শুতে যাবে চল। ঐ হাঁদা ছেলেটার জন্যে আর বসে থাকতে হবে না। ও হয়তো এতক্ষণে গিমারটনে চলে গেছে, সেখানেই রাত কাটাবে। আমরা যে ওর জন্যে এতক্ষণ বসে থাকবো, তা কি ও জানে! ও শুধু জানে হিণ্ডলে হয়তো জেগে আছেন। মনিব এসে দরজা খুলে দেবে, সেই ভয়েই ও ফিরবেনা।

না, না গিমারটন নয়, জোসেফ বললে, ও এখন কোথায় কোন্ নরকে তলিয়ে গেছে। এই যে তাঁরা এলেন, এতো আর এমনি এমনি নয়!

মেয়েটাকে কত বললাম, ওঠ, ভিজে কাপড়-চোপড় ছাড়, কিন্তু সবই বৃথা হোল। শেষে ওকে ফেলেই খুদে হেয়ারটনকে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম! ওতো শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। শুনতে পেলাম, জোসেফ তখনো কি সব আওড়াচ্ছে। ওর পায়ের শব্দ এবার শোনা গেল কাঠের সিঁড়িতে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

অন্য সব দিনের চেয়ে একটু দেরী করে এলাম নীচে, শার্সির ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছিল, তাতেই দেখলাম ক্যাথি তখনো আগুনের ধারে বসে আছে! ফটক খোলা। খোলা জানালা দিয়ে দিনের আলো এসে পড়ছে। হিণ্ডলেও এসে গেছেন। একেবারে আলুথালু বিশ্রী চেহারা।

ক্যাথি, তোমার কি হোল? ঢুকতে ঢুকতে শুনলাম বলছেন। যেন ভুগন্ত কুকুরের মতো চেহারা হয়েছে। এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

কাল খুব ভিজেছি, সে অনিচ্ছাসত্বে বললে, ঠাণ্ডা লেগেছে।

'কি দুষ্টু মেয়ে জান ছোটকর্তা! মনিবকে একটু স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে বললাম, কাল সারা সন্ধ্যেটা বৃষ্টিতে ভিজেছে, আর সারারাত কাটিয়েছে ঠায় বসে। ওকে সাধ্য—সাধনা করেও নড়াতে পারিনি।

আর্ণ-শ তো অবাক হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন। তিনি কথাটা আউড়ে গেলেন, সারা রাত ঠায় বসে কাটিয়েছে—কেন? বাজের ভয়ে নিশ্চয়ই নয়? সে তো কখন থেমে গিছলো।

আমরা কেউই ওকে হিথক্লিফের অনুপস্থিতির কথা বলতে চাইলাম না। যত গোপন রাখা যায় ততই ভাল। তাই বললাম, কি জানি কেন যে মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপলো। ক্যাথি তো চুপ করেই রইল। স্নিগ্ধ ভোর, শার্সি খুলে দিলাম। বাগান থেকে ঘন সুগন্ধ এসে ঘর ভরে দিল। ক্যাথেরিন যেন বিরক্ত হয়ে বললে, এলেন, জানালাটা বন্ধ করে দাও! বন্ধ করে দাও! দাঁতে দাঁতে লেগে যাচ্ছে, ও ঠক্ ঠক করে কাঁপছে। এবার ও গিয়ে বসলো নিবন্ত আগুনের কাছে।

হিণ্ডলে তার হাতখানা হাতে নিয়ে বললেন, ওর অসুখ করেছে। ঐ জন্যেই ও বোধহয় শুতে যায়নি। না, গোল্লায় যাক সব! আর রোগ নিয়ে হাঙ্গামা পোষায় না? বৃষ্টিতে ভিজতে গিছলে কেন?

জোসেফ বললে, ঐ ছোঁড়াটার জন্যে। ও সুযোগ খুঁজছিল, এবার অভিশপ্ত জিভখানা নড়ে উঠলো, আমি যদি মনিব হতাম গো ছোটকর্তা, ওদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতাম! হেন দিন নেই, চোরের মতো লিণ্টন ছোঁড়া এখানে চুপিসারে এসে হাজির হয় না। আর আমাদের নেলিও চমৎকার মেয়ে! তুমি কখন আসবে দোরে বসে বসে পাহারা দেয়। তুমি এক দরজায় এলে, অমনি সে ছোঁড়া ফুড়ুৎ করে পেলিয়ে যায় গো! আবার আমাদের জাঁদরেল ভদ্দর মহিলা ঐ বেদিয়ার বাচ্চার সঙ্গে পিরীত করতেও ছোটেন। মাঝে মাঝেই পিরীত চলে, রাত্তির দুপুরে পিরীত চলে! ওরা ভাবে আমি কখনো কিছু দেখতে পাইনা—কিন্তু না গো ছোটকর্তা, আমি সব দেখতে পাই (এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললে) এই বেটি ডাইনী, তুই কাল ছোটকর্তার ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ওদের বলিসনি।

ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠলো, এই চুপ, চুপ! তোমার এ স্পর্ধা কি করে হোল জোসেফ? এড্‌গার লিণ্টন কাল হঠাৎ এসে গিয়েছিল হিণ্ডলে, আমিই তাঁকে দূর করে দিয়েছি। তুমি তাকে পছন্দ কর না তা আমি জানি।

ওর ভাই জবাব দিলে, ক্যাথি, তুমি মিছে কথা বলছ! তুমি একটা বোকা! কিন্তু লিণ্টনের কথা এখন থাক; বল তো কাল রাতে তুমি হিথক্লিফের সঙ্গে ছিলে কিনা? সত্যি কথা বল! ওর ক্ষতি হবে সে কথা ভেবো না। ওকে আমি যতই ঘৃণা করি, ও আমার এমন উপকার করেছে যে, ওর ঘাড় মটকাতে চাইলেও আমার বিবেক জল করে দেবে সে-রাগ। তাই আমি ওকে তাড়িয়ে দিতে চাই।

ক্যাথি কাঁপছিল, এবার সে জবাব দিলে, কাল রাতে হিথক্লিফের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আর সত্যিই তুমি যদি ওকে দূর করে দাও, আমিও ওর সঙ্গে চলে যাব। কিন্তু সে সুযোগ আর তোমার হবে না, ও নিজেই চলে গেছে। সে কান্নায় ভেঙে পড়লো, তার শেষ কথাগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেল। হিণ্ডলের গালাগালি বৃষ্টি ধারার মতো ঝরে পড়তে লাগলো। হুকুম জারি করলে ও ওর ঘরে যাক, নইলে···আমি ওকে জোর করে নিয়ে গেলাম। ঘরে গিয়ে ও যে কাণ্ড করলে ভুলতে পারবনা। আমি তো ভয়ে অস্থির। ভাবলাম ক্ষেপেই বুঝি গেল! জোসেফকে ডাক্তার ডাকতে বললাম। মিঃ কেনেথ তো তাকে দেখে বললেন, প্রলাপ বকা শুরু হয়েছে, ভীষণ অসুখ। তিনি খানিকটা রক্ত ওর শরীর থেকে বার করে নিলেন। আর আমাকে সাবধান করে দিলেন, আমি যেন নজর রাখি ও না নিচে যায় বা জানালা দিয়ে ঝাঁপ খেয়ে না পড়ে। ওর পথ্য হোল জাউ। এবার উনি চলে গেলেন। ওঁর কত কাজ! এখানে এক বাড়ি থেকে আর একবাড়ি তো তিন মাইল পথ। ক্যাথি সেরে উঠলো। তার অসুখের সময় বুড়ি লিণ্টন-গিন্নী কয়েকবার এসেছিলেন, এসেই তিনি আমাদের গাল পেড়ে, হুকুম করে এক কাণ্ড বাধাতেন। ক্যাথির যখন অসুখ সেরে গেল, তিনি তাকে থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জেও নিয়ে যাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এতে আমরা যথেষ্টই বাধিত হলাম। কিন্তু

বুড়ী বেচারীর এই মহানুভবতার জন্যে অনুতাপ করতে হোল বইকি। তিনি আর তাঁর স্বামী জ্বরে পড়লেন, আর কয়েক দিনের মাত্র ব্যবধান দুজনে মারাও গেলেন।

আমাদের তরুণী ভদ্রমহিলা ফিরে এলেন। আগের চেয়েও তিনি উদ্ধত আবেগময়ী, বিলাসিনী। সেই ঝড়ের রাত থেকে হিথক্লিফের আর কোনো খবর নেই। একদিন ক্যাথি যখন আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললে, আমার কি দুর্ভাগ্য যে, ওরই উপর তার নিখোঁজ হবার দোষ চাপিয়ে দিলাম, দোষ যে কার ও-ও জানতো বই কি। সেই থেকে কয়েক মাস ও তো আমার সঙ্গে কথাই বন্ধ করে দিলে, যদি বা বলতো, চাকরানীর সঙ্গে যেমন বলে তেমনি করেই বলতো; জোসেফের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হোল। সে হয়তো খুদে মেয়ের উপর বক্তৃতাই ঝাড়তো; কিন্তু সদ্য অসুখ থেকে উঠে আসায় ও রেহাই পেলে। ও তখন নিজেকে নারী আর আমাদের মনিব বলেও ভাবতে শিখেছে। এর উপর ডাক্তার জানালেন, ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা চলবে না; ও ওর নিজের ইচ্ছে মতই চলবে। তাই চলতেও লাগলো, কেউ ওর বিরুদ্ধে কথা বললে ওর মাথায় যেন খুন চেপে যেত। আর্ন-শ আর তার সাথীদের কাছ থেকে সে আলাদা থাকতো; কেনেথের কথা মতো সে রেগে উঠলেই ফিট হয়ে পড়তো। তাই ওর ভাই আবদার রেখেই চলতে লাগলেন; এড়িয়ে চলতে লাগলেন ওর গতিবিধি তিরিক্ষি মেজাজ। বরং ওকে নাই দিতে শুরু করলেন। কিন্তু স্নেহ নয়, গর্বে! লিণ্টনদের সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে ও পারিবারিক আভিজাত্য অক্ষুন্ন রাখুক এই তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু ও তো আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করলে। যেন কেনা বাঁদী পেয়েছে আর কি। আর এডগার লিণ্টন? ওর আগেও অমন হাজারো মানুষ বিমুগ্ধ হয়েছে, আর পরেও অমন হাজারো মানুষ হবে। কিন্তু যেদিন ক্যাথিকে গিমার্টন গীর্জায় নিয়ে গেল, সেদিন নিজেকে ভাবলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী। ওর বাপ মারা যাওয়ার তিন বছর পরে ঘটলো এই ঘটনা।

আমার ইচ্ছে ছিল না। তবু ওয়াদারিং হাইটস্ ছাড়ার জন্যে ও পেড়াপীড়ি শুরু করলে, ওর সাথী হয়ে আসতে হবে এখানে। এলামও। খুদে

হেয়ারটনের বয়েস তখন প্রায় পাঁচ বছর। আমি ওকে তখন অক্ষর পরিচয় করাচ্ছি। বিদায় নিতে কষ্টই হোল, কিন্তু ক্যাথেরিনের চোখের জলের ক্ষমতা তো আমাদের দুজনের চোখের জলের চেয়েও ঢের বেশী। যেতে প্রথমে রাজি হইনি; ও যখন দেখলে ওর কাকুতি-মিনতি বৃথা হয়ে গেল, ওর স্বামী আর ভাইয়ের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো। স্বামী বেশ মোটা মাইনে কবুল করলেন; আর ভাই আমাকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদেয় নিতে হুকুম দিলেন; যখন গিন্নী নেই, বাড়িতে তিনি মেয়েমানুষ রাখতে রাজি নন। ঐ পাদ্রীর সহকারীই খুদে হেয়ারটনের ভার নেবে। তাই আমার তখন এক পথই খোলা; হুকুম তামিল করা ছাড়া গতি নেই। তবু মনিবকে বললাম, তিনি ভালো লোকগুলোকে বিদেয় দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের সর্বনাশ টেনে আনছেন। আমি হেয়ারটনকে চুমু খেয়ে বিদায় নিলাম। সে তখন থেকে আমার অচেনা হয়ে রইল। ভারি অদ্ভুত লাগে কিন্তু, তবু একথা আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে, এলেন ডিন বলে যে কেউ আছে এ কথা ও সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল। অথচ এলেন তো ছিল ওর কাছে সমস্ত পৃথিবী, ও-ওতো তার কাছে তাই ছিল।

আমার পরিচারিকার গল্প এখানে পৌঁছিতেই হঠাৎ চিমনীর ওপরের টাইমপিসটায় ওর চোখ পড়লো। দেখে সে তো অবাক, মিনিটের কাঁটাটা এখন দেড়টার ঘরে। আর এক মুহূর্ত সে দেরী করতে চায় না। আমিও কাহিনী এখানে স্থগিত রাখতে চাইছিলাম। ও গেল বিশ্রাম করতে, এ দু-একঘণ্টা ধরে কত কি ভাবলাম। মাথা আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তখনো ব্যথা; তবু উঠে পড়লাম। শুতে যাব।

দশ

উদাসীন জীবনের এ এক সুন্দর ভূমিকা বটে! চার সপ্তাহ ধরে যন্ত্রণা ভোগ হোল, এপাশ ওপাশ করলাম ব্যথায়, রোগে। ও কি প্রচণ্ড এই হাওয়া, আর কি ভীষণ এই উত্তর অঞ্চলের আকাশ; দুস্তর পথ আর দীর্ঘসূত্রী গ্রাম্য ডাক্তার। আর মানুষের সঙ্গ'র কি অভাব! সবচেয়ে খারাপ, কেনেথের ঐ খবর, বসন্ত অবধি বাইরে বেরুবার আর আশা নেই।

মিঃ হিথক্লিফ একবার দেখা করে আমাকে সম্মানিত করলেন, আমার এই রোগে পড়ার ব্যাপারে তিনি একেবারে নির্দোষ নন সে কথা বলারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হায়! যিনি আমার শিয়রের কাছে একঘণ্টা পুরো কাটিয়ে দিলেন, বড়ি আর আবহাওয়া পুলটিস আর জোঁক ছাড়া অন্য কথাই পাড়লেন তাঁকে কি ক্ষুব্ধ করতে পারি! এ তবু এক সরল সহজ বিরতি। পড়ার তখন ক্ষমতা নেই। তবু মনে হোল, যাতে কৌতূহল জাগে এমন কিছু আমি উপভোগ করতে চাই। মিসেস ডিনকে তার গল্পটা শেষ করতে বললে ক্ষতি কি? ও যতদূর বলেছে, সবগুলো বড় বড় ঘটনাই আমার মনে আছে। হাঁ মনে পড়েছে; ওর গল্পের নায়ক পালিয়ে গেছে, তিন বছরের ভিতরে আর তার খোঁজ খবর নেই। নায়িকার বিয়ে হয়ে গেছে। এবার ঘন্টিটা টিপে দিই— ও খুশিই হবে। মিসেস ডিন এল।

সে এসেই বললে ওষুধ খাবার আর বিশ মিনিট বাকি আছে। বললাম, ওষুধ থাক! আমি—

ডাক্তার বলেছেন, পুরিয়ার ওষুধ আর খাওয়ানো হবে না।

তাতে আমি পুরোপুরি রাজি। আমাকে বাধা দিয়ো না। এস, এখানে বোস। ঐ তেতো ওষুধের শিশি থেকে হাত নামিয়ে রাখ! পকেট থেকে

বার কর সেলাইয়ের সরঞ্জাম। বেশ! বেশ! এবার হিথক্লিফের গল্প যেখানে শেষ করেছিলে, সেখান থেকে শুরু করে দাও। একেবারে আজকের দিনে এসে যাক গল্প। ও কি বিদেশ থেকে লেখাপড়া শিখে মস্ত বিদ্বান হয়ে এল, না পালিয়ে গেল মার্কিন মুলুকে, সেখানে নিজেদের দেশের মানুষের রক্তপাতে নাম কিনলে—না ইংলণ্ডের রাজপথেই লুঠতরাজে পয়সা করে ফেললে?

হয়তো ও ঐসবগুলোই করেছিল কর্তা। কিন্তু কি করে টাকা রোজগার করলে তা তো আমি জানিনা। কি করে যে ও অসভ্য থেকে সভ্য হোল তাও আমার জানা নেই। আপনার হুকুম পেলে, আমি আবার নিজের মতো করে গল্প বলতে শুরু করবো। অবিশ্যি আপনার যদি ভাল লাগে, আর বিরক্ত না হন। আজ সকালে কি একটু ভাল লাগছে কর্তা?

অনেকখানি ভাল আছি।

ভাল, ভাল, এবার তাহলে শুরু করি। আমি আর ক্যাথি এলাম থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জে, আর কি বলবো, আমি যা কল্পনাও করিনি, তাই-ই ঘটলো। মিঃ লিণ্টনের (এডগার) উপর তার সে কি ভালবাসা, এমন কি তাঁর বোনের উপরও কি দরদ দেখাতে লাগলো! আর ওঁরা দুজনেই ওর যাতে আরাম হয় তাই নিয়েই তখন ব্যস্ত। কাঁটা ঝোপ বুনো লতার দিকে নুয়ে পড়লো না, বরং বুনো লতাই কাঁটা ঝোপকে আঁকড়ে ধরলো। পারস্পরিক আদান-প্রদান এ নয়, একজন যোদ্ধা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলো; আর অন্যেরা নুয়ে পড়লো। যদি বিরোধ আর আর ঔদাসীন্যের বাধা না পায়, কেই বা মেজাজ খারাপ করতে পারে! লক্ষ্য করলাম, মিঃ এডগার ওকে ভয় করে চলেন। ওর কড়া হুকুম শুনে আমি চড়া উত্তর দিলে, বা কোনো পরিচারিকার মুখখানা গোমড়া হয়ে উঠলে তিনি বিব্রত হয়ে পড়তেন; মুখে ভ্রুকুটি দেখা দিত—অথচ নিজের জন্যে কখনো তাঁর ভ্রুকুটি দেখিনি। আমার এই বেয়াদপি নিয়ে তিনি আমাকে কত গাল দিতেন; বলতেন, তাঁর স্ত্রীকে চটালে তিনি যত আঘাত পান, কেউ ছুরি মারলেও ততো পান না। এমন ভাল মনিবকে চটাবার ইচ্ছে ছিল না, তাই নিজের নিজের আবেগ দমন করতেই চেষ্টা

করতাম, মাস ছয়েকের ভিতরেই বারুদ বালির মতোই নিস্তেজ হয়ে পড়লো, কেননা তাকে বিস্ফূর্ত করবার জন্যে আগুনের ছোঁয়া তো লাগলো না। ক্যাথেরিনের মাঝে মাঝেই গোমড়া মুখ আর চুপ করে থাকার পালা চলছিল। ওর স্বামী তো চুপ করে সয়ে যেতেন, বলতেন ওর শরীরের গতিকেই এমনি হচ্ছে—নইলে আগে তো কখনো মন এত খারাপ হোত না। যখনি বিষণ্ণ মনের গুমোট কেটে যেত; রোদ দেখা দিত, স্বামীও অমনি পাল্টা রোদ দিয়ে তাকে বরণ করে নিতেন। আমার তো মনে হয়, হলফ করেও বলতে পারি, ওঁরা সত্যিই তখন গভীর ভালবাসায় বিভোর, সুখও তখন বাড়্তির মুখে!

কিন্তু সে তো রইলো না, শেষ হয়ে গেল। আমরা সবাই স্বার্থপর। যে উদার, নম্র—সেও উগ্রপ্রবৃত্তির মানুষের চেয়ে কম স্বার্থপর নয়। আর এই উদারতা তো উবে যায়, যখন মানুষ দেখে যে, অপর মানুষটি তার স্বার্থকেই আর বড় করে দেখছে না। সেদিন সেপ্টেম্বরের মেদুর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল। এক ঝুড়ি আপেল নিয়ে বাগান থেকে ফিরেছি সবে। আঁধার হয়ে এসেছে, উঁচু দেয়ালের উপর দিয়ে চাঁদ উঁকি মারছে। আনাচ্-কানাচের অস্পষ্ট ছায়া কোণে কোণে সরে যাচ্ছে। ভারী ঝুড়িটা রান্না ঘরের আঙ্গিনায় সিঁড়ির উপর রেখে একটু জিরিয়ে নেব ঠিক করলাম। এমন স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়া স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল; চোখ তখন আমার চাঁদের দিকে। পেছন ফিরে আছি। পেছনে হঠাৎ কার স্বর শুনে চম্‌কে উঠলাম।

নেলি, তুমি?

গম্ভীরস্বর, উচ্চারণে বিদেশী টান; কিন্তু নাম ধরে ডাকার ধরনটায় এমন কিছু ছিল, যাতে পরিচিত বলেই মনে হোল। তাড়াতাড়ি ফিরে তাকালাম, ভয়ও করছিল। দরজা তো বন্ধ; আমি তো কাউকে উঠোনে ঢুকতেও দেখিনি। কি একটা যেন বারান্দায় নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, এবার কাছে এল। ঘোর রঙের পোষাক পরা এক লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক, মুখে

আর চুলেও তেমনি ঘোর লেগেছে। তিনি ঝুঁকে পড়ে আছেন তালাটার উপর। ভাবলাম, কে উনি? আর্ণ-শ নাকি! না, না! গলার স্বরে তো মিল নেই।

তাকিয়েই আছি, উনি এবার বললেন, এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। চারদিক তো একেবারে চুপচাপ। বাড়ির ভিতরে ঢোকারও সাহস নেই। কি, আমাকে চিন্‌তে পারলে না? দেখ, দেখ, অচেনা তো নই!

আলো এসে পড়লো ওর উপর; বসা গাল, গালের আধখানা কালো চাপদাড়িতে ভর্তি, ঘন ঝাঁকড়া ভ্রূ—গভীর দুটি চোখ তারই নীচে। ঐ চোখ দুটি দেখেই মনে পড়লো।

কি? তুমি ফিরে এসেছ? সত্যি তুমি—সত্যি? জ্যান্ত মানুষ কিনা তাই তখন ঠাহর করে উঠতে পার্ছি না।

হাঁ, আমি হিথক্লিফ, আমার দিক থেকে এবার ওর নজর সরে গেল উপরে জানালায়, সেখানে কয়েকখানি চাঁদ যেন ঝলমল করছে। কিন্তু ভিতরে এখনো নিষ্প্রদীপ রাত। ও জিজ্ঞেস করলে, ওরা কি বাড়িতে আছে? ও কোথায়? নেলি, তুমি যেন আমার আসায় খুশি হও নি! তোমার অতো ঘাবড়াবার দরকার নেই। ওকি এখানে আছে? থাক, থাক! তোমার কর্তার সঙ্গে আমি দু-একটা কথা বলতে চাই। যাও—গিয়ে বল যে গিমারটন থেকে একজন দেখা করতে এসেছেন।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, উনি কি ভাবে নেবেন, কি করবেন কে জানে। আমিই চমকিয়ে গেছি গো, উনি তো দিশেই হারাবেন। কিন্তু তুমি হিথক্লিফ! চেহারা যে বদলে গেছে। না, চেনাই যায় না। তুমি কি পল্টনে ছিলে নাকি!

ও অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলো, যাও—খবরটা দাও গে! যতক্ষণ না দিচ্ছ, ততক্ষণ তো আমার মনে শান্তি নেই।

দরজায় হুড়কোটা ও নিজেই খুলে দিলে, আমি ভিতরে চলে এলাম। কিন্তু বসবার ঘরের সামনে এসে পা আর চলে না, ওখানে তখন কর্তা আর কর্ত্রী

রয়েছেন। শেষে মোম জ্বালাতে হবে কিনা এই অছিলায় ঢুকবো ঠিক করলাম। দরজাটি খুলে ফেললাম।

ওঁরা তখন জানালার ধারে বসে আছেন, বাইরে বিছিয়ে আছে বাগানের গাছপালা, বুনো ঝোপঝাড়ে ভরা পার্ক, গিমারটনের উপত্যকা আর তারই উপর আঁকাবাঁকা কুয়াশার ঘন রেখা।

এই রূপালি কুয়াশার ভিতরে মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে ওয়াদারিং হাইটস্। কিন্তু আমাদের এই পুরানো বাড়িখানি এখনো অদৃশ্য, যেন সে নীচে, নীচে, অনেক নীচে। দৃশ্য শান্ত, সুন্দর, ঘরের দুটি নরনারীও শান্ত, তাঁরা তাকিয়ে আছেন বিভোর হয়ে। খবর দিতে ইচ্ছে হোল না; না বলেই চলে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ নির্বোধের মতো ফিরে এসে বিড়বিড় করে বলে ফেললাম, ঠাকরুন গো, গিমারটন থেকে কে একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

কি চায় সে? মিসেস লিণ্টন (ক্যাথেরিন) জিজ্ঞেস করলেন।

আমি তো জিজ্ঞেস করিনি, জবাব দিলাম।

বললেন, বেশ, তুমি পর্দাগুলো ফেলে দাও নেলি, চা নিয়ে এস। আমি এখুনি আসছি।

তিনি বেরিয়ে গেলেন; মিঃ এড্গার জিজ্ঞেস করলেন, কে এসেছে?

বললাম, সে এমন একজন, যার কথা ঠাকরুন ভাবতেই পারবেন না! কর্তা, সেই হিথক্লিফকে আপনার মনে আছে—সেই যে আর্ণ-শদের বাড়িতে থাকতো?

কি—সেই বেদের বাচ্চাটা—সেই চাষাটা? তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। তুমি ক্যাথেরিনকে একথা বলনি কেন?

বললাম, চুপ, চুপ কর্তা, ও নামে ডাকবেন না! ঠাকরুন হয়তো এখুনি মনে ব্যাথাই পাবেন। ও চলে যেতে উনি তো মন মরা হয়ে পড়েছিলেন। আমার তো মনে হয়, ওর আসায় উনি আনন্দই পাবেন।

মিঃ লিণ্টন ঘরের ওপাশের জানালার কাছে চলে গেলেন। আঙিনার দিকে মুখিয়ে আছে। জানালা খুলে ফেলে ঝুঁকে পড়লেন, ওরা তখন হয়তো

নীচেই ছিল, উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওগো শুনছ, নীচে দাঁড়িয়ে থেকো না। যদি বিশেষ কেউ হন তো উপরে নিয়ে এস।

শীগগীরই দরজার হুড়কো খোলার শব্দ ভেসে এল। ক্যাথেরিন হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল উপরে, এ যেন বন্য, উন্মাদ ক্যাথেরিন! ও তখন এত উত্তেজিত যে আনন্দও চাপা পড়ে গেছে; ওর মুখ দেখলে মনে হবে, এক ভয়ানক সর্বনাশ হয়ে গেছে।

এড্‌গার, এড্‌গার, ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে সে হাঁফাতে লাগলো। আমার এড্‌গার! হিথক্লিফ ফিরে এসেছে! এসেছে! নিবিড় হয়ে এল তার ভুজবন্ধ।

স্বামী ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠলেন, বেশ তো, এর জন্যে আমার গলায় আবার ফাঁস লাগিয়ে বোস না! আমার কাছে ও এমন অমূল্য সম্পদ তো নয়। অতো ক্ষেপে উঠছ কেন।

ও খুশির আবেগ খানিকটা চেপে রেখে বললে, জানি, তুমি ওকে পছন্দ কর না! কিন্তু দোহাই তোমার, আমার খাতিরে অন্তত একটু বন্ধুত্ব কর! ওকে কি উপরে আসতে বলব?

কি?—এখানে—বসবার ঘরে!

আবার কোথায়?

বিরক্ত হলেন এড্‌গার, রান্নাঘরই যে ওর উপযুক্ত স্থান তারই ইঙ্গিত করলেন! মিসেস লিণ্টন ওঁর দিকে তাকালেন—ওঁর এই খুঁত খুঁতে স্বভাব দেখে তিনি একটু বা চটেছেন, একটু বা হাসছেন।

না, তিনি বললেন, আমি বাপু রান্নাঘরে গিয়ে বসতে পারব না! এলেন, এখানেই দুটো টেবিল এনে পেতে দাও! একখানা তোমার মনিব আর ইসাবেলার জন্যে, ওঁরা ভদ্রলোক—ওদের জন্যেই সেখানা আলাদা থাকুক; আর একখানা আমার আর হিথক্লিফের জন্য;—আমরা তো নীচুতলার মানুষ। ওগো ... দাও গিয়ে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে ... য, সেই হুকুমই দাও। আমি

যাব, গিয়ে আমার অতিথিকে ডেকে নিয়ে আসবো। আমার এত আনন্দ হচ্ছে, বিশ্বাসই হয় না যে সত্যি।

ও তীরের মতো ছুটে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু এড্গার ওকে বাধা দিলেন।

আমাকে বললেন, ওকে উপরে নিয়ে এস। ক্যাথেরিন অমন কোরো না, একটু অন্তত বোস। তোমাদের ফেরারী চাকরকে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করছ, সেটা বাড়িসুদ্ধ লোককে না জানালেও চলবে!

নেমে গিয়ে দেখি হিথক্লিফ দাঁড়িয়ে আছে। সে তখন ভিতরে ডাক পড়বার আশায় আছে। কথা না বলে ও আমার পিছনে পিছনে এল। কর্তা আর গিন্নির কাছে ওকে নিয়ে এলাম। ওঁদের গালে রক্তের ছোপ দেখে মনে হোল ওঁদের ভিতরে বচসা চলছে। কিন্তু ক্যাথির গালের ছোপ অন্য অনুভূতিতে রূপান্তরিত হোল বন্ধুকে দরজায় দেখে। সে লাফিয়ে উঠে এসে ওর দুখানা হাত জড়িয়ে ধরলো, তারপর নিয়ে গেল লিণ্টনের কাছে। তারপরে লিণ্টনের অনিচ্ছুক আঙুল ক'টা নিয়ে ওর হাতের মুঠোয় পুরে দিলে। এখন আগুন আর মোমের আলোয় ওকে পুরোপুরি দেখতে পেলাম। কি পরিবর্তনই না ওর হয়েছে! দীর্ঘ ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত দেহ ওর ; ওর কাছে মনিব তো যেন ছিপছিপে ছোকরাটি। ও-যে ফৌজে ছিল তার প্রমাণ ওর উদ্ধত ভঙ্গী। মিঃ লিণ্টনের চেয়ে ওর মুখে ব্যক্তিত্ব আর বয়েসের ছাপ ঢের বেশী। বুদ্ধিদীপ্ত মুখে আগের সে অবনতির চিহ্ন ধুয়ে মুছে গেছে। এখনো ঝাঁকড়া ভ্রূর আড়ালে তবু সেই অর্দ্ধসভ্য ভীষণতা লুকিয়ে আছে, চোখে তেমনি লেলিহ আগুন! কিন্তু তবু সে আগুন যেন স্তিমিত। ভাবভঙ্গীতেও এসেছে মর্যাদার ছাপ, বর্বরতা খসে পড়েছে, কিন্তু কমনীয়তা তো নেই। সে কঠিন-কঠোর। আমার মনিব তো আমার চেয়েও বেশী অবাক হলেন। এই চাষাটাকে কি বলে সম্বোধন করবেন ভেবে পেলেন না। হিথক্লিফ দাঁড়িয়ে রইল। সংযত শান্ত তার দৃষ্টি। এবার এড্গার বললেন,

মশাই বসুন, মিসেস লিণ্টন পুরানো দিনের কথা মনে করেই আপনাকে ভিতরে ডেকে এনেছেন। উনি খুশি হলেই আমি খুশি।

হিথক্লিফ জবাব দিলে, আমারও ঐ এক কথা।

সে ক্যাথেরিনের মুখোমুখি বসে পড়লো। সে তখনো ওর দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে—তার বুঝি মনে হচ্ছে, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেই ও বুঝি চিরদিনের মতো মিলিয়ে যাবে। কিন্তু ঘন ঘন চোখ তুলছেনা; মাঝে মাঝে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এসে পড়ছে ক্যাথিরিনের মুখের উপর, আবার স্তিমিত, অবনমিত হয়ে যাচ্ছে। আবার ঠিকরে পড়ছে। প্রতি বারের চাহনিতেই সে যেন আত্ম-বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে উঠছে, এক নগ্ন আনন্দ উপভোগ করছে। লজ্জা ওদের নেই, আনন্দের আতিশয্যে ওরা বিভোর। কিন্তু মিঃ এড্‌গার তো খুশি নন। রিরক্তিতে তিনি বিবর্ণ। যখন তাঁর স্ত্রী হিথক্লিফের হাত ধরে হেসে উঠলো, তখন তো চরমে উঠল তার বিরক্তি।

ক্যাথি বলে উঠলো, কাল আমি একে হয়তো স্বপ্নই ভাববে', বিশ্বাসই হবে না যে আমি আবার তোমাকে দেখেছি, কথা বলেছি, ছুঁয়েছি। কিন্তু হিথক্লিফ তুমি কি নিষ্ঠুর! তুমি এমন আদর-অভ্যর্থনার উপযুক্ত তো নও। তিন তিন বছর কি করে চুপ করে ছিলে, আমার কথা একবারও না ভেবে কি করে ছিলে তুমি?

সে বিড়বিড় করে কি বললে, না, না, তুমি যতখানি ভেবেছ, তার চেয়ে বোধ হয় একটু বেশীই ভেবেছি। ক্যাথি, তোমার বিয়ের খবর আমি বেশীদিন পেল পাইনি। এই তো উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, তোমার মুখখানা এক নিমিষের জন্যে দেখে চলে যাব। দেখব সেখানে বিস্ময়ের বিকাশ আর হয়তো আনন্দের একটু ছলনা—তারপর গিয়ে হিণ্ডলের সঙ্গে বোঝাপড়া করবো, তারপর আইনের চোখ এড়াবার জন্যে নিজেই আত্মহত্যা করবো। কিন্তু তোমার এই আদর-অভ্যর্থনা তো আমার মন থেকে মুছে দিলে আমার সে ইচ্ছে। কিন্তু যখন আবার দেখা হবে, আমার অন্য রূপই দেখবে ক্যাথি। তুমি আর আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না! সত্যই কি তুমি আমার জন্যে দুঃখ কর? হাঁ, হাঁ একথা জিজ্ঞেস করার মানে আছে ক্যাথি, তোমার সেই শেষ কথা শোনার পরে আমার এক

তিক্ত জীবন কেটেছে। আমাকে ক্ষমা কর, তোমার জন্যেই ছিল আমার এই সংগ্রাম।

লিণ্টন বাধা দিলেন, ভদ্রতা আর স্বাভাবিকতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা তাঁর স্বরে—ক্যাথেরিন, যদি ঠাণ্ডা চা খেতে না চাও তো, টেবিলে চলে এস। আর মিঃ হিথক্লিফ যেখানেই রাত কাটান, অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। তাছাড়া আমারও তো চায়ের তেষ্টা পাচ্ছে।

ইসাবেলা এসে ঢুকলো। ওদের চেয়ারগুলো সাজিয়ে দিয়ে আমি বিদায় নিলাম। দশ মিনিটও লাগলো না। ক্যাথেরিনের পেয়ালায় চা ঢালা হোল না; সে তখন খেতেও পারছে না, পান করতেও না। এড্‌গার পিরীচে ঢেলে নিলেন চা, এক গ্রাস খাবারও খেতে পারলেন না। অতিথি ঘণ্টাখানেকের বেশী রইল না। ও যখন চলে যাচ্ছিল, শুধালাম সে কি গিমারটনে ফিরে যাবে?

সে জবাব দিলে, না—যাব ওয়াদারিং হাইটস্‌-এ। আজ সকালে ওখানে গিছলাম, তখন আর্ন-শ আমাকে নিমন্ত্রণ করেন।

মিঃ আর্ন-শর নিমন্ত্রণ! ও গিছলো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে! ও চলে গেলে নিজের মনেই বারবার আওড়ালাম। ও কি এখানে কোন কুমতলব নিয়ে এসেছে? কেমন যেন একটা অস্বস্তি ঘনিয়ে এল। ও দূরে চলে গিয়েছিল। দূরে থাকলেই তো পারতো!

মাঝ রাতে আমার ঘুম ভাঙালে ক্যাথি। আমার ঘরে এসে আমার বিছানার পাশে বসে চুল ধরে টেনে ঘুম ভাঙালে।

বললে, এলেন, ঘুমতে পারলাম না। আমার এত সুখ, তাইত আমি সঙ্গ চাই। এড্‌গার তো অভিমান করে আছে, আমার যাতে আনন্দ ওর তাতে কিছুমাত্র কৌতূহল নেই; কথাই বলতে চাইলনা, তারপরে কতগুলো আজে-বাজে ছাইপাঁশ কথা বললে; তারপর জানালে, ওর যখন ঘুম পাচ্ছে, তখন আমি স্বার্থপরের মতো বক্‌বক্‌ করতে চাইছি। রাগ করলেই ওর অমনি অসুখ হয়। যেই হিথক্লিফের কথা বলেছি, মাথাধরা কি ঈর্ষার জ্বালায় অমনি কাতরে উঠলো! তাই চলে এলাম তোমার কাছে।

জবাব দিলাম ওর কাছে হিথক্লিফের গুণ ব্যাখ্যান করে তোমার লাভ কি? ওরা যখন ছেলেমানুষ তখন থেকেই তো ওদের রেষারেষি। হিথক্লিফও ওর প্রশংসা শুনলে খুশি হবে না। এ মানুষের স্বভাব। ঝগড়া যদি করতে না চাও, লিণ্টনকে একা থাকতে দাও।

কিন্তু এতে কি দুর্বলতা প্রকাশ পায়না? আমার তো হিংসে হয় না। ইসাবেলার সোনালি চুল, ফরসা রং দেখে আমার মনে তো আঘাত লাগে না। আমি তো ওকে ভালবাসি, বরং ওর মন জুগেয়েই চলি। আমাদের এত ভাব দেখে ওর ভাই তো খুব খুশি। কিন্তু ওরা দুজনেই একরকম। ওদের আদর-আবদারে বুড়োবুড়িরা মাটি করে দিয়ে গেছেন। ওরা ভাবে, পৃথিবীটাই ওদের। দুজনের মন জুগিয়ে চলি বটে, কিন্তু মনে হয়, ওদের বকলে-ঝকলে বোধ হয় ভালই হোত।

বললাম, দেখগো ঠাকরুন, ওঁরাও তোমার মন জুগিয়ে চলেন। তা না হলে কি যে কাণ্ড হোত ভেবে পাইনে। ওঁদের খেয়াল যদি একটু সহ্য না কর তো ওঁরা তোমার সমস্ত কথা মেনে চলেন কি করে? কিন্তু এমন এমন ব্যাপার আছে, যেখানে ওঁরাও তোমার মতো একলষেঁড়ে হয়ে উঠতে পারেন।

তারপরে মারামারি করে আমরা মরে যাব—তাই না নেলি? সে হেসে উঠলো। না গো না, এড্‌গারের ভালবাসার উপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি ওকে খুন করলেও ও প্রতিশোধ নেবে না।

পরামর্শ দিলাম, ওর এই ভালবাসার কদরটাও তো বোঝা চাই।

ও বললে, তা আমি বুঝি। কিন্তু অমন ছাইপাঁশ নিয়ে ও গজরায় কেন? এ তো ছেলেমানষি। চোখের জলে সারা হয়ে না গিয়ে এই মাত্র বলেছিলাম যে, হিথক্লিফ এখন সম্মান পাবার যোগ্য। ওকে তাকে সহ্য করতে হবে। কিন্তু দেখ তো, হিথক্লিফেরও তো ওর উপর রাগ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু ও তো চমৎকার ভদ্র ব্যবহারই করেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ও যে বড় ওয়ারাদারিং হাইটস-এ রাত কাটাতে গেল?

উপরে উপরে তো বেশ বদলে গেছে দেখছি ; একেবারে শান্তশিষ্ট ভদ্র খৃষ্টানটি ; যত শত্রু আছে সবার দিকেই হাত বাড়িয়ে বন্ধুত্ব করতে চাইছে !

ও তো সে কথা আমাকে বুঝিয়ে বলেছে। তোমার মতো আমিও তো অবাক হয়ে গিছছিলাম। ও বলে, ও এসেছিল তোমার কাছ থেকে আমার কথা জানতে। ও ভেবেছিল তুমি বুঝি ওখানেই আছ। জোসেফ তাড়াতাড়ি হিণ্ডলেকে ডেকে আনলে। সে এসেই জেরা শুরু করলে, ও এতদিন কোথায় ছিল, কি করছিল। তারপরে ভিতরে নিয়ে এল। তখন ক'জন বসে তাস খেলছিল। হিথক্লিফও তাদের দলে ভিড়ে গেল। ভাই তখন কিছু টাকা ওর কাছে হেরেছে। এদিকে ওর কাছে যথেষ্ট টাকা দেখে তার লোভও হোল। আবার রাতে আসতে বললে। ও রাজি হয়ে গেল। হিথক্লিফ বলে, তার সেই পুরানো শত্রুর সঙ্গে এই জন্যেই সম্পর্ক রাখতে চায় যে, সে গ্রেঞ্জের কাছে কাছেই থাকবে। তাছাড়া ও ওখানে থাকলে, আমার সঙ্গেও ঘন ঘন দেখা হবার সুযোগ মিলবে। ওর হাইটস্‌-এ থাকার জন্যে যথেষ্ট টাকা হিণ্ডলেকে দিতে রাজি আছে। আর আমার ভাইয়ের যা লোভ, ও নিশ্চয়ই রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু এত লোভ হলে কি হবে, ও এক হাতে যা মুঠোয় পোরে, অন্য হাতে তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বললাম, থাকবার জায়গা বটে। ঠাকরুন, তোমার কি ফলাফল ভেবে ভয় করে না ?

আমার বন্ধুর জন্যে ভয় নেই। ওর মাথাটা শক্ত, বিপদ আপদ থেকে ও নিজেকে আগলে রাখতে পারবে। তাছাড়া দৈহিক বিপদ থেকে আমি ওকে মুক্ত রাখবো। আজকের এই ঘটনায় তো ভগবান আর মানুষে মিলন হোল। ভগবানের বিরুদ্ধে একদিন ফুঁসে উঠেছিলাম—কি দুঃখই যে সেদিন পেয়েছিলাম। ঐ মানুষটা যদি জানতো সে কি দুঃখ, তাহলে, ও তো অমনি শস্তা অভিমান করতে লজ্জাই পেত। ওর ভাগ্য ভাল যে, এতদিন আমি নিজে সে দুঃখ সয়ে এসেছি। যদি দুঃখ প্রকাশ পেত, ও বুঝতো ; হয়তো সে দুঃখ বিমুক্তি করবার চেষ্টা করতেও শিখতো। যাহোক, দুঃখ তো শেষ হয়ে গেছে।

ওর এই নির্বুদ্ধিতার কথা এখন থাক! আমি এখন থেকে মুখবুজে সয়ে যাবো, আরো সয়ে যাব। এডগারের সঙ্গে এখুনি গিয়ে বোঝাপড়া করে ফেলছি। আসি এলেন, আমি যে আজ স্বর্গের দূত বনে গেছি।

ও চলে গেল। ও যে সফল হোল, তা বোঝা গেল পরদিন কর্তার ভাবগতিকে। ও বিকেলে ওয়াদারিং হাইটস্-এ ইসাবেলাকে নিয়ে বেড়াতে গেল, তাতেও তিনি আপত্তি করবার সাহস পেলেন না। তার বদলে ক্যাথি এমন প্রেম আর মাধুর্যের স্নিগ্ধধারা বইয়ে দিল যে ক'দিন বাড়িখানা যেন স্বর্গ হয়ে উঠলো। এই অনাবিল আনন্দে প্রভু-ভৃত্য সবাই তখন খুশি।

হিথক্লিফ, ভবিষ্যতে তাকে মাঝে মাঝে মিঃ হিথক্লিফ বলেই ডাকবো—সে ও থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জে আসতে লাগলো। প্রথমে আসতো ভয়ে ভয়ে, তাঁর এই অনধিকার প্রবেশ গৃহস্বামী কতখানি মেনে নেবেন, সেই তখন তার ভয়। ক্যাথিও তার আনন্দের আতিশয্য একটু কমিয়ে দিলে। তারপরে তো আসা সহজ হয়ে গেল। আমার মনিবের অস্থিরতা তখন ঢিমে-তেতালায়। কতগুলি ঘটনায় সেটা অন্তর্মুখী হয়ে বইতে লাগলো।

তাঁর নতুন বিপদ এল ইসাবেলার অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্যে। সে হঠাৎ এই অতিথির প্রতি এক দুর্দমনীয় আকর্ষণ অনুভব করলে। তখন সে আঠারো বছরের সুন্দরী মহিলা; স্বভাবে শিশু, যদিও তীক্ষ্ণ তার বুদ্ধি। ভীষণ তীব্র তার অনুভূতি আর উগ্র স্বভাব। ওর ভাই ওকে বড় ভালবাসতেন, তাই ওর এই উদ্ভট খেয়ালে ভয় পেলেন। এক নাম-গোত্রহীন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হবার অপমান ছেড়ে দিলেও, পুত্রসন্তান না হলে বিষয় সম্পত্তি অমন একটা লোকের হাতে পড়বে এ তাঁর কাছে অসহ্য। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হিথক্লিফের বাইরেটা বদলালেও ভিতরটা বদলায়নি, বদলাবে না। তাই তখন ওকে ভয়, তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি যদি জানতেন, ইসাবেলার এই আকর্ষণ অকারণে, প্রতিদান না পেয়েই বেড়ে উঠছে তাহলে আরো উতলা হয়ে উঠতেন। তিনি তো এই আকর্ষণ আবিষ্কার করে হিথক্লিফকেই দুষছিলেন।

কিছুদিন ধরেই আমরা দেখছিলাম ইসাবেলা শুকিয়ে যাচ্ছে, খিটখিটে

করে উঠেছে। ক্যাথির উপর যখন তখন খেঁকিয়ে উঠছে, তাকে বিরক্ত করছে। শেষে ওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে আর কি! আমরা খারাপ স্বাস্থ্যের অজুহাতে ওর এই মেজাজ কিছুটা সয়েই ছিলাম। আমাদের চোখের সামনে ও শুকিয়ে যেতে লাগলো। একদিন সে ছোট-হাজিরি খেলে না। বললে চাকর-চাকরানীরা ও যা তৈরী করতে ফরমায়েস করে, তা করে না। বাড়ির গৃহিণীও তাকে চাকর-চাকরানীর সামিল করে রেখেছেন, এড্‌গার আর তাকে আদর করেন না। এই তো দরজা খোলা ছিল ব'লে সর্দি লেগেছে। বসবার ঘরের আগুন নিবিয়ে দিয়ে আমরা ওকে জব্দ করি—তারপরে অরো কতশত খুঁটিনাটি নালিশ। ঠাকরুন ওকে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে বললেন, ধমক দিয়ে বললেন, এখুনি তিনি ডাক্তার ডেকে আনবেন। কেনেথের নাম শুনতেই ও অমনি চেঁচিয়ে উঠলো। ও তো ভালই আছে। শুধু ক্যাথির অত্যাচারেই ওর এই দশা।

ঠাকরুন তো ওর ঐ বাজে কথা কথা শুনে অবাক! চেঁচিয়ে উঠলেন, কি করে বললে, আমি তোমার উপর অত্যাচার করি? তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কখন তোমার উপর অত্যাচার করলাম বলতো?

কাল করেছ, আজ এখন করছ! ইসাবেলা ফুঁপিয়ে উঠলো।

কাল, ওর ভাইয়ের বৌ বললেন, কখন?

যখন হাওরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তুমি বললে না, যখন তুমি হিথক্লিফের সঙ্গে বেড়াবে, তখন আমি যা খুশি করতে পারি।

এই বুঝি তোমার অত্যাচার? ক্যাথেরিন হেসে উঠলো। তোমার সঙ্গ তো তখন আমরা চাই না। তুমি ইচ্ছে করলে থাকতেও পার, যেখেনে খুশি যেতেও পার। হিথক্লিফের কথা শুনে তোমার তো আর ভাল লাগবে না!

না, না, মেয়েটি কেঁদে উঠলো। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে। তুমি জানতে, আমি ওখানে থাকতে চাই—চাই!

আমার দিকে চেয়ে ক্যাথি বললে, মেয়েটার কি মাথার ঠিক আছে। ইসাবেলা, আমাদের কথাবার্তা খুলে বলছি, দেখ তো কোথায় কি মধু খুঁজে পাও।

শুনে আমার কি লাভ—আমি শুধু থাকতে চাই—

বেশ, ক্যাথেরিন ওর দ্বিধা দেখে ব'লে উঠলো।

ওর সঙ্গে আমি থাকতে চাই—ওর সঙ্গ পেতে চাই। আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে চলবে না। সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তুমি তো আমার পথের কাঁটা হয়ে আছ। তুমি ছাড়া ওকে আর কেউ ভালবাসে, তা তুমি চাও না।

ক্যাথি অবাক্ বনে গেল, চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি তো একটা আস্ত বাঁদর। কিন্তু এ নির্বুদ্ধিতা আমি সইব না! হিথক্লিফের ভালবাসা চাও? সে তো অসম্ভব! ওকে কি তুমি খুব ভাল লোক ঠাউরেছ নাকি! ইসাবেলা, বল আমার কি শুনতে ভুল হয়েছে!

না, ভুল তোমার হয়নি, বিমুগ্ধা তরুণী উত্তর দিলে, আমি ওকে যতখানি ভালবাসি, তুমিও এড্গারকে ততখানি ভালবাস না! তুমি যদি ওকে রেহাই দাও, তবেই ও আমাকে ভালবাসতে পারে!

আমি একটা গোটা রাজ্য পেলেও তা দেব না! ক্যাথেরিন জোরে বলে উঠলো, এ তার মনের কথা। নেলি, তুমি ওকে ওর পাগলামিটা কোথায় বুঝিয়ে বল!' বল—হিথক্লিফ কি বস্তু; ওর সভ্যতা, সংস্কৃতির বালাই নেই; ও তো বুনো মানুষ। ঐ খুদে ক্যানারী পাখীটাকে দেখছ, ওটাকে যদি শীতকালে পার্কে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখি, তাহলে ওর যা দশা হবে, হিথক্লিফকে প্রাণ মন সঁপে দিলে তার চেয়েও চরম হবে তোমার দশা! ওর চরিত্র জান না বলেই তোমার মাথায় অমন আজগুবী স্বপ্ন ঢুকেছে। একথা কল্পনাও কোরো না যে শুধু বাইরের এই পাবণের আড়ালে একেবারে উদারতা আর ভালবাসার খনি লুকিয়ে রেখেছে। ও আ-কাটা হীরে নয়—শুক্তির ভিতরের মুক্তাটি নয়—ও একেবারে বর্বর। নির্দয় মানুষ ও, ও মানুষরূপী নেকড়ে বাঘ! আমি তো ওকে কখনো বলি না, শত্রুকে রেহাই দাও, ওদের ক্ষতি করা তো নিষ্ঠুরতা; আমাকে ওর কাছে বলতে হয়, ওদের ক্ষতি কোরো না, ওদের ক্ষতি হবে ভাবতেও আমার

ঘৃণা হয়। ওরা প্রতিশোধের অযোগ্য। যদি ওর মনে হয় যে, তুমি একটা আপদ হয়ে উঠেছ। ও 'পাখার ডিমের মতো তোমাকে ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে দেবে। জানি, ও লিন্টন বংশের কাউকে ভালবাসতে পারে না, তোমার টাকাকড়ি আর সম্পত্তির লোভে তোমাকে' বিয়ে করবে। ওর ভিতরে লোভ বাড়ছে। এই তো আমার ছবি। আমি ওর বন্ধু, এমন বন্ধু যে, সত্যিই ও যদি তোমাকে শিকার করতে চাইত, আমি চুপ করে থাকতাম, ভুলিয়ে তোমাকে এনে ওর খপ্পরে ফেলে দিতাম!

সে বারবার বলতে লাগলো, ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

এমন বন্ধু তো হাজার হাজার শত্রুর চেয়েও খারাপ।

ক্যাথেরিন বললে, আমার কথা কি বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ আমার হীন স্বার্থ থেকেই একথা বলছি—

হাঁ, তাই বলছ; তোমার কথা শুনে আমি শিউরে উঠেছি!

ভাল, ভাল। তাই যদি মনে হয়, চেষ্টা করে দেখ না! তোমার ঔদ্ধত্যের সীমা নেই! আমার যুক্তি তো ভেসে গেল!

ওর এই একগুঁয়েমির জন্যে আমাকে সইতে হবে—সইতে হবে! ক্যাথেরিন চলে যেতে ইসাবেলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। সবাই আমার বিরুদ্ধে। আমার একমাত্র সান্ত্বনা ও ধ্বংস করে দিতে চায়। ও মিথ্যে কথা বলেছে—তাই না? মিঃ হিথক্লিফ তো শয়তান নন, ওঁর মন কত উঁচু, কত সাঁচ্চা—তা না হলে ওকে মনে রাখলেন কি করে?

বললাম, ওগো, তোমার মন থেকে ওর কথা মুছে ফেল। ও অমঙ্গলের পাখী, তোমার যোগ্য নয়। ঠাকরুন ঠিকই বলেছেন! উনি ওঁকে এত ভাল করে জানেন যে, আর কেউ তত জানে না! আর উনি তো বাড়িয়ে বলার লোকও নন! যারা ভাল লোক হয়, তারা কি নিজেদের কোন কথা গোপন করে রাখে। কি করে ও কাটালো ক'টা বছর!

ও কি করে বড়মানুষ হোল, কি জন্যে ওয়াদারিং হাইটস্‌-এ আছে? যাকে ঘৃণা করে তার বাড়িতেই কিনা গিয়ে শেষে উঠলো? লোকে বলে ঐ আসার পর

থেকে আর্ন-শ আরো বয়ে গেছেন। দুজনে বহু রাত অবধি জুয়ো খেলেন, মদ খান। জোসেফের সঙ্গে গিমারটনে সেদিন দেখা হোল, সে তো কত কথাই বললে। জোসেফ পাদ্রী হোক, যাহোক, মিথ্যেবাদী নয়। যদি ওর কথা সত্যি হয়, তাহলে হিথক্লিফের মতো লোককে কেন যে তুমি বিয়ে করবে, তা আমি জানি না।

ইসাবেলা চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি আর সবার সঙ্গে ষড় করেই কথাটা বললে এলেন। তোমাদের ও কুৎসায় আমি কান দেব না। তোমরা কি জোর করে আমাকে বুঝিয়ে দেবে, পৃথিবীতে সুখ নেই। এ তোমাদের কি অন্যায় হিংসে বল তো!

পরদিন পাশের শহরে কি এক সভা ছিল। মনিবকে সেখানে যেতে হোল। হিথক্লিফ তাঁর অনুপস্থিতির খবর জেনেই অন্যদিন যখন আসে, তার চেয়ে তাড়াতাড়িই এল ক্যাথেরিন আর ইসাবেলা তখন লাইব্রেরী ঘরে বসে ছিল। ওদের ঝগড়া তখনো শেষ হয়নি, ওরা দুজনেই চুপচাপ, ইসাবেলা তো নিজের গোপন কথা রাগের মাথায় বলে ফেলে নিজেই পস্তাচ্ছে। আর ক্যাথি তো সঙ্গিনীর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ। হিথক্লিফকে জানালা দিয়ে দেখে সে হাসলো। আমি রান্নাঘর ঝাঁট দিচ্ছিলাম, ওর মুখে দুষ্টমির হাসি দেখতে পেলাম। ইসাবেলা তখন বই নিয়ে বা নিজের ভাবনায় বিভোর। সে দরজা খুলে না যাওয়া অবধি তেমনিই রইল। তখন আর পালাবার উপায় নেই; উপায় থাকলে ও ছুটে পালিয়ে বাঁচতো!

কর্ত্রী-ঠাকরুন আগুনের ধারে একখানা চেয়ার টেনে এনে হেসে বললেন এস, এস! এখানে দুজন মানুষ মুখ গোমড়া করে বসে আছে—এখন ওদের দুজনের ভিতর মিল কে করে দেবে? বরফ গলাবার জন্যে আর একজনের তো দরকার। তুমিই আমাদের এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায়। হিথক্লিফ, আমার চেয়ে ও তোমার কথা বেশী ভাবে, তোমাকে ভালবাসে, এমন একজনকে আজ তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তুমি গর্বিতই হবে। না, না, নেলির দিকে তাকিয়োনা, ও নয়। তোমার দৈহিক আর নৈতিক সৌন্দর্যের কথা

ভেবে ভেবে আমার ননদ তো বুকখানা ভেঙে ফেলেছেন। এখন এড্‌গারের বোনাই হবার ক্ষমতা যদি থাকে তো দেখ! না, না, ইসাবেলা তুমি পালিয়ে যেও না। মেয়েটা চটেমটে উঠতে যাচ্ছিল, ও তাকে আটকে রাখলে। এ এক লীলা খেলা। হিথক্লিফ, তোমাকে নিয়ে আমাদের ভিতরে বেড়ালের ঝগড়া! আমি তো ওর ভক্তি আর ভালবাসার বহর দেখে রণে ভঙ্গ দিয়েছি। তা ছাড়া এ খবরও শুনেছি, আমার যদি পথ থেকে সরে দাঁড়াবার মতো ভদ্রতাটুকু থেকে থাকে তা হলেও এমন এক তীর ছুঁড়েবে তোমার মন তাগ্‌ করে যাতে চিরদিনের মতো তুমি ওঁর শিকার হয়ে থাকবে, আমার ছবি একেবারে মুছে যাবে।

ইসাবেলা আত্মমর্যাদায় স্ফীত ; ও নিজেকে ওর মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে টানাটানি করতে ঘৃণা করে। ও বললে, তুমি অন্তত সত্যি কথাই বলবে, ঠাট্টার ছলেও আমাকে ছোট করবে না এইটুকু আমি চাই। মিঃ হিথক্লিফ আপনার বন্ধুকে আমাকে ছেড়ে দিতে বলুন। আমি আর আপনি যে ঘনিষ্ঠ নই, একথা তিনি ভুলে গেছেন। উনি যাতে আনন্দ পাচ্ছেন, আমার যে সেখানেই ব্যথা—একথা কি উনি বোঝেন?

অতিথি নিরুত্তর। তিনি এসে বসলেন। ওর ভাবাবেগ সম্পর্কে তিনি উদাসীন। ইসাবেলা এবার ফিসফিস করে তার নির্যাতনকারিণীকে মুক্তির আবেদন জানালে।

মিসেস লিণ্টন জবাব দিলেন, না, তা হবে না! আমি যে বাগড়া দিচ্ছি, সে নাম আমি কিনতে রাজি নই, তোমাকে থাকতেই হবে। হিথক্লিফ, আমার এমন সুখবরটা শুনে তুমিই বা খুশির ভাব দেখাচ্ছনা কেন? ইসাবেলা তো হলফ করে বলেছে, এড্‌গারকে আমি যতখানি ভালবাসি ওর তোমার উপর ভালবাসার কাছে সে তো কিছুই নয়। এলেন, ও ধরনের কথা ও বলে নি? রাগে দুঃখে কাল থেকে ও উপোস করে আছে। আমি ওকে তোমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করেছিলাম বলেই ওর এই রাগ।

হিথক্লিফ চেয়ারখানা টেনে এনে মুখোমুখি বসে বললেন, তুমি মিছে কথা

বলছো ক্যাথি, উনি এখন তো আমার সুমুখ থেকে চলে যাবার জন্তে ছটফট করছেন।

তিনি একবার আলোচনার বস্তুটির দিকে তাকালেন, যেন এক অদ্ভুত জন্তু ক্যাথি, বিতৃষ্ণাই জাগায়। প্রাচ্যের চতুষ্পদ জীববিশেষ, বিতৃষ্ণা জাগলেও দেখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ও বেচারীর তো সহ্য হোলনা, সে এই বিবর্ণ, এই আরক্ত হয়ে উঠতে লাগলো, অশ্রু এসে ফোঁটা ফোঁটা পুঁতির মতো জমে উঠলো ওর চোখের পাতায়। ও নুয়ে পড়ে ক্যাথির দৃঢ় মুষ্ঠি থেকে সজোরে ছিনিয়ে নিতে চাইলো আঙুলগুলো। যখন দেখলে, একটা আঙুল ছাড়ালে আর একটা আঙুল আবার বন্দী হয়, সে এবার নখের সাহায্য নিলে। তার তীক্ষ্ণতা ধৃতকারিণীর হাতে রেখে গেল রক্তমুখী অলঙ্কার। ওকে ছেড়ে দিয়ে, ব্যথায় হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস লিণ্টন, আরে এযে দেখছি বাঘিনী! দোহাই তোমার, তুমি চলে যাও! তোমার মতো এমন মাদী কুকুরের মুখ দেখতে চাইনে। ওর কাছে নখ দেখালে কেন? ও কি ভাববে বল তো? দেখ, দেখ, হিথক্লিফ, ওইগুলোই ওর অস্ত্র, ঐ অস্ত্র দিয়ে ও হত্যা করবে—তোমার চোখ সম্পর্কে সাবধান!

সশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ও চলে গেলে হিথক্লিফ নির্মম হয়ে বলে উঠলো, ঐ নখ যদি আমার উপর উদ্যত হয়, আমি ওগুলো ওর আঙুল থেকে খসিয়ে নেব। কিন্তু ওর সঙ্গে অমন ব্যবহার করলে কেন? ওগুলো নিশ্চয়ই সত্যি কথা নয়?

ও বললে, একেবারে সত্যি কথা। তোমার জন্য কয়েক হপ্তাধরে ও হেদিয়ে মরছে। এই তো আজ সকালেই আমার সঙ্গে ঝগড়া—একগাদা গাল দিলে, দোষের ভিতরে আমি তোমার দোষক্রটিগুলোর কথা বলে ওর এই আবেগ শান্ত করতে গিছলাম। ওকে আমি এত ভালবাসি হিথক্লিফ, যে, ওকে তুমি ধরে গিলে খাবে তা আমি হতে দেব না।

তিনি বললেন, ওর জন্তে আমারও মাথাব্যথা নেই, তবে হয়তো একটু আধটু শয়তান মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে

তুমি অদ্ভুত সব কথাই শুনতে পাবে। সাদা কথা হচ্ছে, ওর ঐ ফ্যাকাসে মুখে আমি রামধনু রং মেখে দেব, ওর ঐ নীল চোখে দেব কালো রং। ওগুলো যেন বড় বেশি লিণ্টনী ওগুলো বদলে না দিলে ওর সঙ্গে থাকা চলবে না।

ক্যাথেরিন বললে, ওর তো ঘুঘুর চোখের মত শান্ত, সুন্দর দুটি চোখ তো যেন দেবদূতের।

একটু থেমে হিথক্লিফ বললে, ও ওর ভাইয়ের ওয়ারিশ না?

ক্যাথি বললে, তাহলে দুঃখিতই হব। এখন ওসব কথা রেখে দাও! পড়শীর জিনিসের উপর তোমার খুব লোভ তা জানি—কিন্তু মনে রেখো এখানে পড়শী হচ্ছি আমি।

হিথক্লিফ বললে, যাহোক, ইসাবেলা লিণ্টন বোকা হলেও, একেবারে খেপে যায়নি। তাই ওকথা এখন না হয় মুলতুবি রইলো।

ওরা জিভ থেকে বাদ দিলে কথা, ক্যাথি হয়তো তার মন থেকেও দিলে। কিন্তু অপর মানুষটির বোধহয় বহুবারই কথাটা মনে পড়লো। ওকে আপন মনে হাসতে দেখলাম, মুখ বিকৃতি করলে, আবার ভাবনায় বিভোর হয়ে গেল—এক অশুভ সংকেত তাতে বেজে বেজে উঠলো। মিসেস লিণ্টন যখনি ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখনি ওর এই ভাব দেখছিলাম।

আমি ওর চাল-চলন লক্ষ্য করবো বলে ঠিক করলাম। ক্যাথেরিনের থেকে আমার মনিবের দিকটায়ই আমার পক্ষপাতীত্ব ছিল বেশী। মনে মনে তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দিলাম—উনি সহৃদয়, বিশ্বাসী, আবার সম্মানিত ও বটেন। আর ক্যাথি ওর উলটোটা ঠিক নয়, তবে তার মতামত সম্বন্ধে আমার আস্থা কম, তার উপর দরদও আমার তেমন নেই। তখন চাইছি, এমন একটা ঘটনা ঘটে যাক যাতে ওয়াদারিং হাইটস্ আর গ্রেঞ্জ মিঃ হিথক্লিফের হাত থেকে রেহাই পায়। আমার কাছে ওর আগমন তো দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন। আমার মনিবের পক্ষেও একথা খাটে বলেই আমার মনে হয়। ওঁর এই হাইটস্-এ আস্তানা গাড়া তো রীতিমত এক অত্যাচার বলে মনে হোল। ঈশ্বর তার ভ্রান্ত

মেষদের স্বেচ্ছায় চরতে দিয়েছেন, আর সেই সুযোগে গুঁড়ি মেরে এল এক সর্বনাশা জানোয়ার সে খোঁয়াড়ের পথ আগলে দাঁড়ালো। এবার সে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ধ্বংস করে দেবে···

এগারো

এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শিউরে উঠতাম, অমনি তাড়াতাড়ি টুপীটা মাথায় দিয়ে ছুটতে চাইতাম হাইট্‌সের দিকে। মনে হোত, ওকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য যে, ওর সম্বন্ধে আমরা সবাই সন্দিগ্ধান। তারপরে আবার মনে পড়ত ওর কু-অভ্যাসের কথা। ওকে তো শোধরানো যাবেনা।

একদিন হাইট্‌সের ফটকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দিনটা ছিল উজ্জ্বল। বরফে গলে গেছে, পথ এখন শুকনো খটখটে, একটা পিল্‌পের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম, এখান থেকে সড়ক মোড় ঘুরেছে হাওরের দিকে। পিল্‌পের উপর গ্রেঞ্জ-হাইটস্ আর গ্রামে যাবার পথের নিশানা। রোদ এসে পড়েছিল পিল্‌পের ধূসর চূড়ায়। গ্রীষ্মের কথা মনে পড়লো। আর ছেলেবেলার স্মৃতি যেন উথলে উঠলো। বিশবছর আগে এটি ছিল হিণ্ডলে আর আমার প্রিয় ঠাঁই। পিল্‌পেটার দিকে তাকালাম। রোদ বৃষ্টি অনেক গেছে, নীচে সেই গর্তটাও আছে, ওখানে এখনো নুড়ি আর শামুকে ভর্তি। আমরা ওগুলো জমা করে রাখতাম। মনে হোল যেন আমার খেলার সাথী হিণ্ডলেকেও দেখতে পাচ্ছি। ওর চৌকো মাথাটা নুয়ে পড়ে মাটি খুঁড়তে ব্যস্ত। ডাকলাম, হিণ্ডলে! ক্ষণিকের জন্য আমার চর্মচক্ষু প্রতারিত হোল, শিশু মুখ তুলে তাকালে! আবার মিলিয়ে গেল নিমিষে সে ছবি; কিন্তু কি-এক কামনা যে পেয়ে বসলো হাইটস্‌-এ ছুটে যাবার! এগিয়ে চললাম। যত কাছে আসতে লাগলাম, ততো বুক দুরু দুরু করে উঠতে লাগলো। কাছে এসে দেখলাম রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে। ওকে দেখে চিনতে পারলাম ও আমারই খুদে হেয়ারটন! দশমাসে কিছুই বদলায়নি।

ও দূরে সরে গিয়ে একটি ঢিল তুলে নিলে।

মনে হোল, ও আমাকে নেলি বলে চিনতে পারেনি, তাই বললাম, হেয়ারটন, আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ও তখন ঢিল ছোঁড়ার জন্যে তৈরী। ওকে ভোলাবার জন্যে কত কথা বললাম, কিন্তু হাত তো বাগ্ মানে না। আমার টুপীর উপর এসে ঢিলটা পড়লো আর বর্ষিত হোল গালাগাল। বুঝুক না বুঝুক, বহু ব্যবহারের পটুত্ব তাতে ছিল, শিশুর সরল মুখে যেন ঘনিয়ে এল হিংস্র শ্বাপদের ছায়া। আপনি বুঝে নিন এতে আমি কত দুঃখ পেলাম! পকেট থেকে একটা কমলালেবু বার করে ওকে শান্ত করতে গেলাম। ও একটু ইতস্তত করলে তারপরে কেড়ে নিলে। ও ভাবলে, আমি ওকে ভুলাতে চাই, তারপরে হতাশ করতেও পারি। আর একটা বার করে দেখালাম, লেবুটা রইল ওর নাগালের বাইরে।

শুধালাম, বাছা, তোমাকে এমন মিষ্টিকথা কে শেখালে! তোমার গুরুমশায় নাকি?

গুরুমশায় আর তুমি গোল্লায় যাও! আমাকে ওটা দাও! ওর তম্বি শুরু হোল।

কোথায় শিখলে আগে বল, তারপরে দেব। তোমার গুরুটি কে?

আমার শয়তান বাপিটা, আবার কে!

কি শিখলে ওর কাছ থেকে?

ও ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল লেবুটার উপর, আরো উঁচুতে তুলে নিলাম হাতখানা। আবার শুধালাম, কি শিখিয়েছেন তিনি?

কি আবার শেখাবে, ওঁর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে হবে বলেছেন। উনি আমাকে সইতে পারেন না, আমি ওঁকেও গাল পাড়ি কিনা!

এ আবার কোন্ শয়তান তোমাকে শেখালে?

না, বলবো না।

কে বল?

হিথক্লিফ।

ওকে তুমি ভালবাস ?

হাঁ, ও জবাব দিলে ?

কেন ?

বাপি আমাকে গাল দিলে, ও যে তাঁকে পাল্টা গাল দেয়। ও বলে, আমি যা খুশি করতে পারি।

তাহলে তোমাকে ঐ পাদ্রী এখন আর পড়ান না ?

না, ওকে বলে দিয়েছি, ও যদি পড়তে আসে ঘুষি মেরে দাঁত উপড়ে ফেলে দেব না! হিথক্লিফেরও সায় আছে!

কমলালেবুটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, ও গিয়ে খবর দিক বাগিচার ফটকে নেলি ডীন দাঁড়িয়ে আছে। ও চলে গেল। কিন্তু হিণ্ডলের বদলে এল হিথক্লিফ। তাকে দেখে আমি ছুটে চলে এলাম।

হিথক্লিফ এবার যেদিন গ্রেঞ্জে এল, ইসাবেলা আঙ্গিনায় পায়রাগুলোকে খাবার দিচ্ছিল। কত দিন ধরে ভাইয়ের বৌয়ের সঙ্গে তার কথা বন্ধ। তবে ওর ঐ খ্যাপামি তখন আর নেই। এতেই আমরা খুশি। বাড়িখানাতো জুড়িয়েছে। হিথক্লিফের ভদ্রতার বালাই নেই। ইসাবেলাকে দেখেই ও চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলে। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, ওকে দেখেই সরে গেলাম। ও এবার ওর কাছে গিয়ে কি বললে। ইসাবেলা তো বিব্রত, ছুটে পালাতে চায়, ও করলে কি, তার হাতের উপর হাত রাখলে। ইসাবেলা মুখ ফিরিয়ে নিলে। হিথক্লিফ আবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলে। ওর মনে হোল, কেউ দেখতে পায়নি। পাজীটার স্পর্দ্ধা কত, এবার ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরলো।

ওরে পাজী, ওরে বদমাস! চেঁচিয়ে উঠলাম।

কে, নেলি ? দেখলাম, ক্যাথেরিন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে আমি দেখতেই পাইনি।

বলে উঠলাম, আবার কে তোমার ঐ অপদার্থ বন্ধু! ঐ পাজীটা! ও

আমাদের দেখতে পেয়েছে, এই দিকেই আসছে! ইসাবেলার সঙ্গে যে পিরীত করতে গিছলো, তার কৈফিয়ৎটা কি দেবে ঐ পাজীটা!

ক্যাথি দেখলে, ইসাবেলা নিজেকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিয়ে ছুটে বাগানের ভিতরে চলে গেল; তার এক মিনিট পরেই এল হিথক্লিফ। আমি নিজেকে চেপে রাখতে পারছিলাম না, কিন্তু ক্যাথি শাসালে, যদি কথা বলি তো আমাকে এখুনি তাড়িয়ে দেবে।

সে বলে উঠলো তোমার কথা শুনে আমার মনে হয়, তুমিই এ বাড়ির কর্ত্রী। আর হিথক্লিফ তুমিই বা এমন সোরগোল তুললে কেন? তোমাকে না বলেছি, ইসাবেলাকে অব্যাহতি দাও! তা নাহলে কবে যে এখানকার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে কে জানে।

একবার বন্ধ করেই দেখুক না। ঐ কালো শয়তানটা বলে উঠলো। ভগবান ওকে ভেড়া বানিয়ে রাখুন এই আমার প্রার্থনা। ওকে তো রোজই আমি মনে মনে স্বর্গে পাঠাই।

চুপ, চুপ! ভিতরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ক্যাথি বললে, আমাকে আর জ্বালিয়ো না বাপু! আমার অনুরোধটা রাখলে না কেন? ও কি তোমার কাছে গিছলো?

তাতে তোমার কি? গর্জে উঠলো হিথক্লিফ। ওর যদি ইচ্ছে হয়, ওকে আমার চুমু খাবার দাবী আছে বই কি—তোমার বাধা দেবার কি অধিকার? আমি তো তোমার স্বামী নই, যে অমনি ঈর্ষা হবে।

তোমার উপর ঈর্ষা হয় না, কর্ত্রী বললেন। তোমার জন্যই আমার ঈর্ষা। অমন মুখ করে থেকো না। ইচ্ছে হয় তো ইসাবেলাকে বিয়ে করো। কিন্তু একটা কথা সত্যি বলতো, তুমি কি ওকে ভালবাস? জানি, সেখানে তুমি জবাব দেবে না। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, তুমি ওকে ভালবাস না!

আর কর্তা কি বোন ওকে বিয়ে করতে চাইলেই রাজি হবেন? আমি জিজ্ঞেস করে বসলাম।

কর্তাকে রাজি হতে হবে, ক্যাথি বললে।

ওর অতো হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না, ওর মত না পেলেও আমার চলবে। ক্যাথি, তোমাকে আমি গোটা কয়েক কথা বলতে চাই। তুমি আমার সঙ্গে অতি খারাপ ব্যবহার করেছ। তুমি যদি ভেবে থাক, আমার বোধশক্তি নেই, তাহলে তোমাকে বোকাই বলবো। আর মিষ্টি কথা বললেই আমি গলে যাব একথা ভাবলেও তোমাকে মূর্খ ছাড়া কিছু বলবো না। আমি যে প্রতিশোধ নেব না—একথা মনেও ভেবো না। তবে তোমার ননদের গোপন কথাটা বলে ভালই করেছ। এইটাকে আমি যতটা পারি কাজে খাটাব। তুমি সরে দাঁড়াও ক্যাথি!

এ আবার কেমন ধারা কথা! ক্যাথি অবাক হয়ে গেল। আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি—তুমি তার শোধ তুলে তবে ছাড়বে! ওরে অকৃতজ্ঞ, কবে আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলাম।

হিথক্লিফ উত্তর দিলে, না, তোমার উপর নয়। অত্যাচারী শাসক ক্রীতদাসদের পিষে ফেলে, কিন্তু তারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না, বরং, ওদের নীচুতলার মানুষদেরই পিষে দেয়। তোমার আমোদের জন্য আমাকে তুমি যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেরে ফেল, কিন্তু আমাকেও একটু অমনি আমোদ করতে দিতে হবে।

ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি শয়তান, তোমার আনন্দ দুঃখ দিয়ে। আমরা একটু শান্তিতে আছি, কিন্তু তা তুমি থাকতে দেবে কেন? আবার ঝগড়া বাঁধাতে এসেছ। বেশ তো, দরকার হয়তো এড্‌গারের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাও, ওর বোনকে ফুসলে নাও, তাহলেই তো আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

আলাপে ছেদ পড়লো। ক্যাথি উত্তেজিত; বিষণ্ণ। আগুনের ধারে বসে আছে। আর হিথক্লিফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। আমি কর্তার খোঁজে গেলাম তিনি তখন ক্যাথেরিনের নীচে এত দেরী দেখে উতলা হয়ে উঠেছেন।

ওঁর ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলেন, এলেন, তোমাদের কর্ত্রীঠাকরুনকে দেখেছ? বললাম, হাঁ, রান্নাঘরে আছেন। হিথক্লিফের ব্যাভারে উনি মুষড়ে পড়েছেন,—সমস্ত কথাই বললাম। শেষ অবধি শোনার ধৈর্য হোল না তাঁর।

তিনি বলে উঠলেন, এতো অসহ্য ব্যাপার! অমন লোককে বন্ধু বলাও তো লজ্জার কথা। আমার লোক দু'জনকে ডাকো, ক্যাথেরিনকে ঐ পাজীটার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে না—ঢের সয়েছি আর নয়।

তিনি এবার নেমে এলেন। তখন আবার শুরু হয়েছে বচসা। অন্তত শ্রীমতী লিণ্টন তো আবার নবীন উৎসাহে শুরু করেছেন; হিথক্লিফ সরে গেছে জানালার ধারে, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর এই বিস্ফোরণে সে বুঝি বা ভীত। কর্তাকে ও-ই প্রথম দেখতে পেলে, তাই ইসারায় থামতে বললে। কর্ত্রীও চুপ করলেন।

লিণ্টন এগিয়ে এসে বললেন, এ কি তোমার ব্যাপার বল তো? ঐ বদমাসটা যা করেছে, তার পরেও ভদ্রতাবোধে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ? বোধ হয়, এই ওর কথা বলার ধরন বলেই দাঁড়িয়ে আছ। ওর নীচতায় তুমি যখন অভ্যস্ত, আমারও আশা করি অভ্যেস হয়ে যাবে।

কর্ত্রী যেন তাঁর ক্রোধে অগ্রাহ্য করেই বললেন, এড্‌গার, তুমি কি দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিলে? হিথক্লিফ এবার চোখ তুলে একটু হাসলো।

এড্‌গার তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, মশাই, আপনার নীচ মন জেনেও আমার স্ত্রীর জন্যেই আপনাকে ক্ষমা করেছিলাম। আপনার সঙ্গ আমাদের কাছে তো বিষেরই শামিল—আপনি ভবিষ্যতে আর এই বাড়িতে ঢুকবেন না। আর এই মুহূর্তেই আপনি চলে যান! তিন মিনিট দেরী করলে ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে দাঁড়াবে!

হিথক্লিফ তাচ্ছিল্যভরে কর্তার শরীরের দিকে তাকালো।

ক্যাথি, তোমার এই পোষা ভেড়াটা দেখছি ষাঁড়ের মতোই চোখ-রাঙায়! আমার ঘুষিতে ওর মাথার খুলি দুভাগ হয়ে যাবে না! মিঃ লিণ্টন, সত্যিই এ আমার দুঃখ যে, আপনি এ হাতের এক ঘা সইতে পারবেন না।

কর্তা বারান্দার দিকে তাকিয়ে আমাকে লোক খবর দিতে ইসারা করলেন। ব্যক্তিগত লড়াইয়ে তাঁর অনিচ্ছা। আমি যাচ্ছিলাম ডাকতে,

কিন্তু গিন্নি বুঝতে পেরে আমাকে টেনে রাখলেন। এবার দরজা ছাবি বন্ধ করে দিলেন।

বাঃ, কি তোমার স্থায়সঙ্গত উপায়! তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পার, ক্ষমা চাও। না হয় তো মার খাও! না, চাবি চেয়ো না—তার আগেই আমি গিলে ফেলবো! তোমাদের উপরে মায়া ছিল বলে তার ফল ভুগছি। একজনের দুর্বলস্বভাব আর একজনের মন্দ স্বভাবকে আদর দিয়ে দিয়ে এখন তো দেখছি দুটোই অকৃতজ্ঞ। এড্‌গার, আমার কি ইচ্ছে হয় জানো, হিথক্লিফ তোমাকে পেটাতে পেটাতে—

কর্তা আর সহ্য করতে পারলেন না, তিনি চাবিটা ক্যাথেরিনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেলেন। ক্যাথি সেটা আগুনের ভিতরে ফেলে দিলেন। এবার এড্‌গার ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। তিনি ঝুপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে হাতে মুখ ঢাকলেন।

শ্রীমতী লিণ্টন চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঃ বাঃ সেকাল হলে বীরের তকমা পেতে দেখছি! আমরা তো এখন পরাস্ত। এইবার হিথক্লিফ মধ্যযুগের রাজার মতো আঙুল নাড়াক, আর···থাক, থাক, ভয় নেই। তুমি ভেড়াও নও, তুমি বেহদ্দ ছেলেমানুষ!

ওর বন্ধু বললে, বাঃ ক্যাথি, তোমার এই দুধের বাচ্ছাটিকে দেখে বড় খুশি হলাম! তোমার পছন্দের তারিফ করি! আমাকে বাতিল করে কিনা এই ভীরুটাকে পছন্দ করলে! ওকে হাত দিয়ে আঘাত করবো না, পা দিয়ে লাথি মারবো? ও কি কাঁদছে, না মূর্চ্ছা যাবে!

লোকটা এগিয়ে গিয়ে লিণ্টন যে চেয়ারে বসেছিলেন, সেটায় একটা পা দিয়ে ঠেলা মারলে। ওর দূরে সরে থাকাই ভাল ছিল। আমার মনিব অমনি লাফিয়ে উঠে ওর মুখে মারলেন এক ঘুষি—ওর ঘুষিতে অন্য কেউ হলে টলে পড়তো। মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো হিথক্লিফ। লিণ্টন এদিকে পেছনের দরজা দিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এলেন। ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠলো, এখানে তোমার আসা

বন্ধ হোল। যাও, এখুনি চলে যাও! ও এখনি হয়তো একজোড়া পিস্তল আর আধ ডজন লাঠী নিয়ে এসে হাজির হবে। যাও—যাও!

গর্জে উঠলো হিথক্লিফ, তোমার কি মনে হয়, ঘুষি খেয়ে আমি চলে যাব। না, না! উঠোন পেরিয়ে যাবার আগেই ওর ঐ আস্ত পাঁজর ক'খানা বাদামের মতো গুঁড়িয়ে দেব না! আজ যদি পেড়ে নাও ফেলি, একদিন ঠিক খুন করবো! যাই, দেখি গে!

মিছে কথাই বললাম, উনি আর ফিরছেন না, দু-দুটো মালি আর গাড়োয়ান রয়েছে। ওরা তোমাকে ছুঁড়ে পথে ফেলে দেবেখন। ওদের হাতে আবার খেঁটোও আছে।

হিথক্লিফ কি ভেবে নিলে। সে একটা শাবল তুলে নিয়ে তালা ভেঙে ওরা আসবার আগেই চম্পট দিলে।

কর্ত্রী তাঁর সঙ্গে আমাকে ওপরে যেতে বললেন। এই ব্যাপারে আমার দোষ কতখানি তিনি তো জানেন না, আমিও তাঁকে বলতে চাইলাম না।

ঘরে এসে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, নেলি, আমি পাগল হয়ে যাব। আমার মগজে যেন হাজারটা হাতুড়ির ঘা পড়ছে। ইসাবেলাকে বোলো, আমাকে ও যেন এড়িয়ে চলে। ওর জন্যেই তো এই কাণ্ডটা হোল। এড্‌গারের সঙ্গে যদি রাতে দেখা হয়, তাকে বোলো আমার বোধ হয় খুব একটা সাংঘাতিক অসুখ হবে। ও আমাকে আঘাত দিয়েছে কম নয়! ও কেন এল? হিথক্লিফকে আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করছিলাম। এখন তো আর কোনো উপায় নেই। ও এসেই তো এই কাণ্ডটা করলে! সত্যি ও যখন দরজা খুলে গমন করে বললে, আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। ওকে বোলো, আমাকে চটিয়ে দেবার নীতি ওকে ছাড়তে হবে। ওতে বিপদ আছে। চটলে আমি পাগল হয়ে যাই।

মনিব বসবার ঘরের দিকেই আসছিলেন, আমি তাঁকে কিছু বললাম না। কিন্তু আড়ি পেতে রইলাম, দেখি ওরা আবার ঝগড়া বাধায় কি না। মনিবই

প্রথম কথা বললেন, তাঁর স্বরে লেশমাত্র ক্রোধ নেই, কিন্তু বিষাদ যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

ক্যাথেরিন, তোমাকে উঠতে হবে না। আমি বেশীক্ষণ থাকবো না।

তিনি শান্ত স্বরেই বললেন, বিষাদিত সে স্বর, আমি বেশীক্ষণ থাকব না ভয় নেই। ঝগড়া বা মিল করতে আসিনি। শুধু জানতে এসেছি, আজকের এই ব্যাপারের পরেও কি তুমি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখতে চাও?······

কর্ত্রী মেঝেয় পা ঠুকে বাধা দিলেন, দোহাই তোমার, এখন ওসব কথা তুলো না। তোমার ঠাণ্ডা রক্ত গরম হয়ে উঠবে না, তোমার শিরাগুলো তো বরফের মতো ঠাণ্ডা। কিন্তু এদিকে আমার রক্ত ফুটছে, তোমার ঐ ঠাণ্ডা ভাব দেখলে তো টগবগ করে ফুটে উঠবে।

আমাকে এখনি বিদেয় দিতে হলে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, মিঃ লিণ্টন পেড়াপীড়ি শুরু করলো, হাঁ, জবাব দিতে হবে। তোমার ঐ খ্যাপামিতে আমি ভয় পাব না। আমি বুঝেছি, তুমি সময় মতো ধীর স্থির হতেও জানো। তুমি বল তো, হিথক্লিফকে ছাড়বে, না, আমাকে ছাড়বে? একই সঙ্গে দুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব চলবে না! আমার জানা দরকার, কাকে তোমার পছন্দ।

আমাকে একা থাকতে দাও, ক্যাথেরিন রাগে চীৎকার করে উঠলো। এই আমার দাবী। দেখছ, দাঁড়াতে পারছি না? এড্গার—যাও, তুমি এখান থেকে যাও। জোরে ঘণ্টা টানলে সে, এমন জোরে টানলে যে ঘণ্টার দড়িটাই ছিঁড়ে গেল, আমি আস্তে আস্তে ঢুকলাম। উঃ কি কাণ্ড! সোফার উপর মাথা কুটছে, দাঁত ঘসছে, মনে হয় সোফাই বুঝি চুরমার করে দেবে। মিঃ লিণ্টন তো ভয়ে হতবুদ্ধি। জল আনতে বললেন। এক গেলাস জল নিয়ে এলাম, ওর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলাম। এবার ও গা এলিয়ে দিলে! একেবারে ফ্যাকাসে মেরে গেছে। যেন মৃত ও। লিণ্টন ভয় পেলেন।

শিউরে উঠে বললেন, দেখ, দেখ!

তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিলাম, ওতে কিছু হবেনা। বললাম, মনিবের আসার আগেই ও এই মতলব এঁটে ছিল। কথাটা জোরেই বলে ফেললাম, শুনে ও

উঠে বসলো। চুল তখন ওর উড়ছে কাঁধের উপর, চোখ জ্বলছে, গলার মাংসপেশী ফুলে উঠেছে। ভাবলাম, মারধোর করবে; কিন্তু ও শুধু একবার তাকিয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে চলে গেল। মনিব ওর পেছন পেছন যেতে বললেন! ওর কামরার দরজা অবধি গেলাম। ও আমাকে ঢুকতে দিলে না।

পরদিন ভোরে ছোট হাজিরির সময়ও নীচে নামল না। আমি জিজ্ঞেস করতে এলাম, ঘরে পাঠিয়ে দেব কিনা খাবার। উত্তর এল না। দুপুরের খাওয়া আর চায়ের সময়েও সেই একই উত্তর। তার পরের দিনও তাই। আর মিঃ লিণ্টন তাঁর লাইব্রেরী ঘরেই কাটিয়ে দিলেন। স্ত্রীর তত্ত্ব-তালাস করলেন না। ইসাবেলা শুধু একবার আধঘণ্টার জন্য গিয়েছিল লাইব্রেরী ঘরে। তাঁর কাছ থেকে তিনি ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। কিন্তু সে এড়িয়ে গেল কথা। তিনি তবুও হুঁশিয়ার করে দিলেন, ও যদি ঐ হতভাগাটার জন্যে খেপেই যায়, তাহলে তিনি কোন সম্বন্ধই রাখবেন না।

বারো

ইসাবেলা বাগান আর পার্কে ঘুরে ঘুরে কাটাতে লাগলো। সবসময়েই সে নীরব, অশ্রুমুখী। ভাই তো বদ্ধ হয়ে রইলেন লাইব্রেরী ঘরে; বইয়ের একখানা পাতাও উলটে দেখলেন না। ভাবলাম, ক্যাথি বুঝি নিজেই ক্ষমা চাইতে আসবে—মিলন হবে! ও তো উপোস দিয়েই কাটালো। ভাবলে, এড্‌গার বুঝি ওকে শেষ অবধি ডাকবে। ওর পায়ের তলায় এখনো লুটিয়ে পড়েনি, সে তার নিজের গর্বে। ভেবে দেখলাম, তো বাড়িতে যদি কারো মাথায় কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে—সে এক আমি।

যাক—তিন দিনের দিন শ্রীমতী দরজা খুললেন, কলসী আর ডিকেণ্টারের জল তখন নিঃশেষিত। তিনি আবার জল চান, একটু খাবার হলেও ভাল হয়। মরে তো যাচ্ছেন খিদেয়। আমি ঠিক বুঝলাম, ওগুলো এড্‌গারকে শোনাবার জন্যে বলা। কিন্তু আমি কোনো কথাই বললাম না! ওকে এনে দিলাম খাবার আর চা, একেবারে গোগ্রাসে খেল, তারপরে আবার বালিশের উপর

মাথা এলিয়ে দিয়ে গুঙিয়ে উঠলো, উঃ আমি মারা যাবো! আমাকে তো কেউ দেখতে পারেনা! ঐ ছাইগুলো না খেলেই হোত। তারপরে খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, না, মরবো না—ও খুশি হবে—ও তো আমাকে ভালবাসে না!

আর কিছু চাই নাকি? শুধালাম।

ও সে জবাব না দিয়ে বললে, লোকটা কোথায়? ওকি মরেছে নাকি?

উত্তর দিলাম, যদি মিঃ লিণ্টনের কথা বলো, তিনি বেশ ভালই আছেন ঠাকরুন! পড়াশুনো করছেন।

পড়াশুনো করছেন! সে চেঁচিয়ে উঠলো। আর আমি এদিকে মরে যাচ্ছি! ওকি জানে, আমার কি দশা হয়েছে! উল্‌টো দিকের দেয়ালে আরসী টাঙানো, আরসীর দিকে তাকালো। এই কি ক্যাথেরিন লিণ্টন? ওকি আমাকে পোষা পাখি ভাবে? নেলি, তুমি কি ওকে খবর দিতে পার না যে—হয় আমি উপোস করে মরবো, নয়তো বিদেয় হব। সত্যি বললে, ও পড়াশুনো করছে? আমার জীবনের উপর ওর কি একটুও মায়া নেই?

কি বলছো গা ঠাকরুন! মনিব কি জানেন যে তুমি খেপে গেছ। আর তুমি যে উপোস দিয়ে মরবে না, একথা তো তিনি জানেন।

বটে! আচ্ছা ওকে বল, আমি তাই মরবো! আমি তো মরে যাচ্ছি।

কিন্তু এইমাত্র তো খাবার খেলে, কালই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

ও বাধা দিয়ে বললে, যদি জানতাম, আমি মরলে ও দুঃখে বুক ফেটে মরে যাবে, আমি এখুনি আত্মহত্যা করতাম। উঃ এই তিন তিনটে ভয়ানক রাত যে কি করে কাটিয়েছি আমিই জানি! চোখের পাতা একবারও এক করিনি। মনে হচ্ছিল, কেউ আমাকে দু-চোখে দেখতে পারে না। সবাই আমার শত্রু। এমনিভাবে মরতেও তো আমার ভাল লাগবে না। চারদিকে সব গোমড়া মুখ। এড্‌গার মরতে দেখে খুশি হবে, গিয়ে বই নিয়ে বসবে। আমি মরছি আর ও বই নিয়ে বসেছে!

ও গড়াগড়ি দিতে লাগলো। বালিশ ছিঁড়ে ফেললে দাঁত দিয়ে, তারপরে হুকুম করলে জানালা খুলে দিতে। শীতের মাঝামাঝি তখন, উত্তর-পুবাল বাতাস বইছে জোরে। আপত্তি করলাম। হঠাৎ মনে হোল, ডাক্তার তো ওকে চটিয়ে দিতে বারণ করেছিলেন। এই তো এক মুহূর্ত্ত আগে ও খেপে উঠেছিল, এখন তো ছেলেমানুষের মতো ছেঁড়া বালিশের ভিতর দিয়ে পাখীর পালকগুলি টেনে টেনে থাক করছে; এক এক জাতের পাখীর পালক ভিন্ন ভিন্ন করে সাজাচ্ছে।

এই তো টার্কি, এই তো বুনো হাঁস, এইগুলি বুঝি পায়রা! এইগুলি জলার মোরগ! হিথক্লিফ তো ওদের ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছিল সেবার। কিন্তু আমি বললাম, না গো ওদের মেরো না! ওরা কি সুন্দর!

ওকে বাধা দিয়ে বললাম, ছেলেমানুষি ছাড়তো! চোখ বুঝে শুয়ে থাক! পালকগুলো যে সব বরফের মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

আমি কুড়োতে লাগলাম।

ও যেন স্বপ্নের ঘোরে বলতে লাগলো, তুমি তো বুড়ো হয়ে যাবে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে তোমার চুল হবে সাদা, কুঁজিয়ে চলবে, ঐ যে দুটো মোম জলছে ঐ দুটো!—

কি বাজে বকছ—চেঁচিয়ে উঠলাম।

ঐ মুখখানা কি দেখছ না আরসীতে—দেখ-দেখ! ও আরসীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ওকে বোঝাতে পারলাম না, এ ওর নিজের মুখ। শেষে হদ্দ হয়ে একখানা শাল এনে ঢাকা দিয়ে রাখলাম আরসী।

ও আবার উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, ঐ তো এখনো আড়ালে আছে। ও কে? তুমি যখন চলে যাবে নেলি, তখন তো ও বেরিয়ে আসবে! নেলি, নেলি, এ এক হানা কামরা। আমি একা থাকতে ভয় পাচ্ছি।

ওর হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে ওকে স্থির হতে বললাম।

কই, কেউ তো নেই। শুধু তুমি আর আমি।

ও হঠাৎ শালখানা টেনে নিয়ে মুড়ি দিলে। ওর স্বামীকে ডেকে আনব বলে ছুটলাম। কিন্তু ভীষণ চীৎকারে আবার ফিরে এলাম। শালখানা ফেলে দিয়েছে। কি হয়েছে গো? ঐ তো আরসী, তোমারই ছায়া পড়েছে—আমিও তো তোমার পাশেই আছি।

ও আমাকে ফিসফিস করে বললে, মনে হোল যেন ওয়াদারিং হাইটস্‌-এ আমার কামরায় শুয়ে আছি। তারপরে তো চেঁচিয়ে উঠলাম। কথা বোলো না, আমার কাছে কাছে থাক। ঘুমতে আমার ভয় হয়, স্বপ্ন দেখেও তো আমি ভয় পাই।

বললাম, ঠাকরুন, ঘুমলেই সেরে উঠবেখন, আর কখনো উপোস করতে যেও না!

সে আবার বলতে লাগলো, যদি নিজের বাড়িতে এখন থাকতাম, বাতাস বয়ে যেত ফার গাছ দুলিয়ে। ঐ তো বাতাস এল! ও তো জলা থেকে উঠে এল! আঃ—

ওকে শান্ত করতে দরজাটা একটু ফাঁক করে দিলাম। দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া এল ছুটে। দেখে, তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম। ও ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে বিছানায়।

আমাদের সেই দুর্দান্ত ক্যাথি এখন শান্ত মেয়েটি!

হঠাৎ ও বলে উঠলো, কতদিন এ ঘরে আটক আছি?

সোমবারে তো দরজায় আগল দিলে, আজ বৃহস্পতিবার। রাত অনেক হয়েছে, শুক্রবার সকালও বলতে পার।

ও চেঁচিয়ে উঠলো, কি বলছ! এক হপ্তা কেটে গেল মোটে।

ঠাণ্ডা জল খেয়ে আর বদরাগি মেজাজ নিয়ে ঐ এক হপ্তা কাটিয়েছ এই তো ঢের!

তবু তার সন্দেহ। বললে, কিন্তু আমার যেন মনে হোল কত দীর্ঘ দিন!

সব কথাই তো মনে আছে। বললে, উঃ গা যে জ্বলে পুড়ে গেল নেলি। এখন তো বাইরে যেতে পারলে হোত। আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে

পেতাম নেলি, সেই মুক্ত জীবন। কেন এমন হোল? কেন কয়েকটা কথা শুনলে রক্ত অমন তোলপাড় করে ওঠে? আবার যদি তেমনি জলায় ঘুরতে পারি, তবে বুঝি শান্তি পাব। জানালাটা খুলে দাও! দাও, দাও! নড়ছো না কেন?

তোমাকে তো মেরে ফেলবার আমার ইচ্ছে নেই।

বাঁচারও তো উপায় বাত্‌লে দিচ্ছে না, সে গর্জে উঠলো। এখনো আমি পঙ্গু হয়ে পড়িনি নেলি, নিজেই আমি জানালা খুলে দেব!

ওকে বাধা দেবার আগেই ও বিছানা থেকে নেমে পড়ে টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলে জানালা। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ছুরির ফলার মতো বিঁধছে ওর কাঁধে। কত সাধ্য-সাধনা করলাম। কিন্তু প্রলাপবকা রোগীর শক্তি যে তখন অসীম। বাইরে চাঁদ নেই আকাশে, নিচের পৃথিবী কুয়াশাময়; কোনো বাড়িতে নেই আলো—অনেকক্ষণ থেকেই নিবে গেছে। ওয়াদারিং হাইটস্‌-এর আলো তো একেবারে নিবে গেছে—তবু তার মনে হোল, তখনো জ্বলছে আলো।

দেখ, দেখ, ও বলে উঠলো, ঐ তো আমার ঘর, আলো জ্বলছে, গাছ দুলছে ওর সামনে! আর একখানা মোম জ্বলছে জোসেফের চিলে কোঠায়। জোসেফ বহু রাত জাগে—তাই না? ও তো আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, আমি বাড়ি এলে তবে ও ফটকে চাবি বন্ধ করবে। ওকে এখনো তো কিছুক্ষণ দেরী করতে হবে। পথ তো দুর্গম। আমি আর হিথক্লিফ তো ঐ পথে কতবার গিয়েছি।

ওর এই পাগলামিতে কিছুই বললাম না। শুধু ভাবছিলাম, কোনো রকমে একটা কিছু ওর গায়ে চাপা দিয়ে দিতে পারলে হয়। এরই মধ্যে দরজায় হাতল ঘোরাবার শব্দ হোল। মিঃ লিণ্টন এসে ঢুকলেন। লাইব্রেরীর ঘর থেকেই এসেছেন। বারান্দায় আসতে আসতে আমাদের কথাও শুনেছেন, তিনি কৌতূহলী, ভয়ও আছে, এত রাতে আমরা কি বলাবলি করছি!

ওকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলাম, কর্তা গো, ঠাকরুনের খুব অসুখ। আমার

তো বাবু আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। সামলাতে পারছি না। ওঁকে আপনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিছানায় নিয়ে চলুন। মান-অভিমানের পালা এখন তুলে যান।

সে কি ক্যাথেরিনের অসুখ! তিনি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। এলেন জানালা বন্ধ করে দাও! ক্যাথি—একি!

তিনি নীরব হয়ে গেলেন। ক্যাথেরিনের চেহারা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, উনি তো সেই থেকে গজরাচ্ছেন গো, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন না, মুখে টুঁ শব্দটিও নেই। কাউকে গোশাঘরে ঢুকতেও দেন নি। আমরা কি করে জানব, কি হয়েছে। আর ব্যাপারটাও এমন কিছু নয়।

কর্তা তো ভ্রুকুটি করে বললেন, এলেন, ব্যাপারটা কিছুই নয়—না? এই যে আমাকে জানাও নি, এর শাস্তি তোমাকে দেব। এই বলে তিনি স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন।

প্রথমে ও যেন চিনতেই পারেনি। এবার নজর পড়লো, ও হঠাৎ বলে উঠলো, ওঃ, এড্গার লিণ্টন এসেছ ভাল, ভাল। তোমাকে তো আমি চাইনি। তোমাদের আসার দরকার নেই। আমার এখন কবর-ই আশ্রয়।

ক্যাথিরিন, কি বলছ! মনিব বলে উঠলেন, আমি কি তোমার কেউ নই? তুমি কি ঐ হতভাগাটাকে ভালবাস!

চুপ, চুপ! গর্জে উঠলেন শ্রীমতী লিণ্টন, চুপ কর! যদি ও নাম আবার বলবে তাহলে আমি এই জানালা থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে মরে যাব। তুমি আমাকে ছুঁতে পার, কিন্তু আমার মন তো পাবেনা। আমি তোমাকে আর চাইনা এড্গার। যাও, বই মুখে করে বসে থাক গে! তোমার তবু একটা সান্ত্বনা আছে।

মনিবকে বললাম, উনি সন্ধ্যে থেকেই অমনি আবোল-তাবোল বকছেন, ওকে একটু নিরিবিলিতে থাকতে দিন।

চুপ, মিঃ লিণ্টন খেঁকিয়ে উঠলেন, তোমার কাছ থেকে আমি কোনো পরামর্শ চাইনি। তুমি তোমার কর্ত্রীর স্বভাব জান, তবু আমাকে দিয়ে

তাঁর উপর অত্যাচার করাতে ছাড়নি, এই তিনদিন ও কি ভাবে ছিল, তাও ঘুণাক্ষরে বল নি !

নিজেকে সমর্থন করতে গেলাম, বললাম, হিথক্লিফ তো আপনি না থাকলেই এসে জোটে আর ঠাকরুনকে আপনার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে।

ক্যাথেরিন আবার সজাগ হয়ে উঠলো। সে বললে, নেলিটা তো বিশ্বাসঘাতক ! ওরে ডাইনী, তুই···

ওর ভ্রূর আড়ালে জমে উঠলো উন্মাদের মত্ততা, লিণ্টনের আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পাবার জন্য ও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। আমি এদিকে ঘর ছেড়ে ডাক্তার ডাকতে ছুটলাম।

ভাগ্য ভাল, কেনেথ ডাক্তার তখন বাড়ি থেকে রোগী দেখতে বেরুচ্ছিলেন। ক্যাথেরিনের অসুখের কথা শুনে তিনি তখুনি আমার সঙ্গে চললেন। পথে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে। সব কথাই খুলে বললাম। রেগে গিয়েই এমনি কাণ্ড ! এখন তো হয় প্রলাপ বকে, নয় তো স্বপ্নের ঘোরে থাকে।

মিঃ লিণ্টনের অবস্থা কি ? ডাক্তার শুধালেন।

উঃ, তিনি তো ভয়ানক মুষড়ে পড়েছেন গো ! কিছু একটা হলে তো উনি ভেঙে পড়বেন ! ওঁকে খুব একটা ভয় পাইয়ে দেবেন না।

ওকে তো বহু আগেই হুঁশিয়ার হতে বলেছিলাম, তা উনি তো আবার হিথক্লিফের সঙ্গে ভাব করে বসলেন।

বললাম মনিবের সঙ্গে তো ভাব নেই ! উনি কর্ত্রী ঠাকরুনের ছেলেবেলার বন্ধু, তাই আসেন-যান। কিন্তু আর ওঁর আসা হবে না।

কেন, আমাদের মিস্ লিণ্টনও কি এরই মধ্যে একেবারে অনাসক্ত হয়ে পড়েছেন ?

বললাম, তাঁর খবর তো আমি রাখিনে। আমার আর কথা বাড়াবার ইচ্ছে ছিল না। উনি খুব চালাক মেয়ে, নিজেই নিজের পরামর্শদাত্রী।

ডাক্তার মাথা নেড়ে চললেন। কিন্তু মেয়েটি বেহদ্দ বোকা, এই তো ভাল লোকের মুখ থেকেই শুনলাম, তোমাদের বাড়ির পেছনের বাগিচায় অমন ঝড়ের রাতে যুগলে বেড়াচ্ছিলেন, তা ঝাড়া ছু-ঘণ্টা তো বটেই। হিথক্লিফ ওকে বলে, বাড়ি থেকে পালিয়ে চল। আমাকে যে খবর দিয়েছে, সে বললে, মেয়েটি নাকি আরো সময় চেয়েছে! তার পরের কথা সে আর শুনতে পায় নি।

আমি তো শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। কেনেথ ডাক্তারকে পিছনে আসতে বলে আমি ছুটে এসে বাড়ি ঢুকলাম—সটান ইসাবেলার ঘরে। আমার সন্দেহ ভঞ্জন হোল। ঘর শূন্য। কি আর করবো, সিধে চলে এলাম। ডাক্তার এর ভিতরে এসে পৌছেছেন।

ক্যাথেরিন তখনো ঘুমে; স্বামী তাকে শান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন শিয়রে বসে আছেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, যদি ওকে একেবারে নিরিবিলিতে রাখা যায়, তাহলে আরাম হবার যথেষ্টই আশা আছে। আমাকে বললেন, মৃত্যুর ভয় নেই, আছে বুদ্ধিভ্রংশতার ভারী ভয়।

সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারলাম না, মিঃ লিণ্টনও পারলেন না। আমরা শুতেই গেলাম না রাতে। ভোর হতে বাড়িশুদ্ধ সবাই জাগলো; কিন্তু ইসাবেলার দেখা নেই! ওর দাদা বার বার জিজ্ঞেস করলেন, ও উঠেছে কিনা; ওর জন্যে অস্থির হয়েই উঠলেন। ভ্রাতৃ বধূর উপর ওর মায়া দয়া নেই দেখে ক্ষুব্ধও হলেন। এক পরিচারিকা গিয়েছিল গিমারটনে, সে এমন সময় ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে,

কর্তা গো আমাদের মিসি বাবা···

থাম্ না বাপু! ওকে বাধা দিলাম।

মনিব বললেন একটু আস্তে কথা বল মেরী, কি হয়েছে? তোমাদের মিসি বাবার কি হয়েছে?

চলে গেছেন! হিথক্লিফ তাকে নিয়ে উধাও।

উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে উঠলেন লিণ্টন, না, না, একথা ঠিক নয়! কি করে একথা তোমার মাথায় এল? এখন, যাও, ওকে ডেকে নিয়ে এস। এযে অসম্ভব ব্যাপার। এতো হয় না—হতে পারে না!

দরজার আড়ালে নিয়ে গিয়ে ওকে আবার জেরা করতে লাগলেম।

পরিচারিকা বললে, এখানে যে ছোকরা দুধ নিয়ে আসে, ও পথে দেখা হতে বললে, আমাদের কোনো বিপদ হয় নি তো? ভাবলাম বুঝি ঠাকরুনের অসুখের কথাই বলছে। ও বললে, কেউ পিছনে এখনো ধাওয়া করে নি। শুনে তো 'থ' মেরে গেনু। ও আরো বললে, এক ভদ্দর লোক আর একটা মেয়েমানুষ একটা কামারের দোকানে ঘোড়ার খুরে নাল পরাতে এসেছিল দুপুর রাতে। কামারের মেয়ে তখন ওদের দেখে। সে দেখেই ওদের চিনতে পারে। হিথক্লিফকে তো দেখেই চেনে, তবে মেয়েমানুষটির মুখ ঢাকা ছিল। ও জল চাইলে, আর সেই জলখাবার সময় ঢাকনাটা খুলে গেল। মেয়েটা বাপকে কিচ্ছু বললেনা, কিন্তু আজ ভোরে গিমারটন-শুদ্ধ লোককে গেয়ে বেড়িয়েছে গো!

আমি ছুটলাম ইসাবেলার ঘরে। আগেই জানি, তবু মনিবের হুকুম রাখতেই ছুটলাম। ফিরে এসে দেখি বিছানার পাশে বসে আছেন। আমাকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন। আমার দৃষ্টি দেখে চোখ নামিয়ে নিলেন। কিছুই বললেন না।

জিজ্ঞেস করলাম, ওঁকে কি ফিরিয়ে আনতে লোক যাবে?

মনিব উত্তর দিলেন, ও নিজের ইচ্ছেয় গেছে। আর ওর সে অধিকারও আছে। ওর কথা আর আমার কাছে বোলো না। এরপর থেকে ও নামেই আমার বোন থাকবে। আমি তো ওকে ত্যাগ করিনি, ওই তো আমাকে ত্যাগ করে চলে গেল!

তেরো

দু'মাস কেটে গেল। ফেরারীদের কোনো খবর নেই। এর মধ্যে মিসেস লিণ্টন একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। মার্চের প্রথম দিকে তিনি বাইরে বেরুলেন। মিঃ লিণ্টন তো ওঁকে নিয়ে তখন বিভোর। রোজ ভোরে সোনার মতো সদ্য ফোটা ফুল এনে রাখতেন ওর বালিশের উপর।

কর্ত্রী বলতেন, এই ফুল তো হাইটস্-এ সবচেয়ে আগে ফোটে। প্রথম তুষার গলার কথা আমার মনে পড়ে—আর প্রথম সূর্যের কথা। এড্গার, এখন কি দখিন বাতাস বয় না? তুষার কি এখনো গলে যায় নি?

স্বামী বলতেন, হাঁ গো, এখন তো সারা জলায় মাত্র দুটো জায়গা সাদা আছে। আকাশ কি নীল! চাতক ডাকছে। নদীনালা তো জলে থই থই। ক্যাথি, গত বসন্তে তো তোমাকে এখানে বরণ করে নিয়ে আসাই ছিল আমার কামনা। কিন্তু এখন তো ওখানে ঐ টিলার উপরে তুমি থাকলেই ভাল হোত। ওখানকার হাওয়ায় তুমি সেরে উঠতে।

না, ওখানে তো আর একটিবার মাত্র যাব। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে আসবে। ওখানেই আমি চিরদিনের জন্য থাকবো। পরের বসন্তে আবার আমার কামনা করবে তুমি। অতীতের দিকে তাকিয়ে ভাববে, তুমি তখন ছিলে কত সুখী।

ওকে এমনি করেই লিণ্টন মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখতে চাইতেন। কিন্তু তবু ওর চোখে হঠাৎ জমে উঠতো জল, গাল বেয়ে ঝরে পড়তো। ওকে মাঝে মাঝে আমরা বসবার ঘরে নিয়ে আসতাম, সেখানে কেটে যেত প্রহরের পর প্রহর। ওর সেবা-শুশ্রূষা বেশ মন দিয়েই করছিলাম। ওর উপর তো আর একটা জীবন তখন নির্ভর করছে। আমাদের তখন আশা, মিঃ লিণ্টনের আনন্দের দিন এল। তাঁর বংশধর আসছে।

ইসাবেলার কথা বলি, সে তার ভাইয়ের কাছে একখানা ছোট্ট চিঠি পাঠিয়ে ছিল। তাতে ছিল হিথক্লিফের বিবাহের বিজ্ঞপ্তি, নীচে পেন্সিলে ক্ষমা-প্রার্থনা আর মিলনের আশা। লিণ্টন বোধ হয় এর উত্তর দেননি। তারপরে আমি পেলাম একখানা দীর্ঘ চিঠি মধুচন্দ্র যাপন করে ফেরার পরে। চিঠিখানা পড়ে শোনাচ্ছি। মৃতের স্মৃতি তো মূল্যবান, তাই এখানাকে সযত্নে রেখেছি।

প্রিয় এলেন,

কাল ওয়াদারিং হাইটস্-এ চলে এসেছি। এসে শুনলাম, ক্যাথেরিন অসুস্থ, ওকে আর তাই চিঠি লিখলাম না। ভাইও বোধ হয় খুবই চটে আছে। তাই তোমাকেই লিখছি।

এড্‌গারকে বোলো, ওর সঙ্গে দেখা করবার আমার ভীষণ ইচ্ছে। ক্যাথেরিনকেও আমি আবার দেখতে চাই।

চিঠির বাকিটা তোমার জন্যেই। তোমাকে দুটো প্রশ্ন করতে চাই! এখানে থাকতে কি করে মানুষের সহজ স্বভাবটা বজায় রেখেছিলে, কি করে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তোমাদের এই হিথক্লিফটি কি মানুষ? যদি মানুষ হয় তো ও বদ্ধ পাগল। আর নয় তো একেবারে মূর্তিমান শয়তান! এ প্রশ্ন যে কেন করছি বলবো না। তবে তোমার যদি কোন ব্যাখ্যা থেকে থাকে জানিও। কিন্তু চিঠি লিখো না, আমার সঙ্গে দেখা করতে এস।

আমাদের এই নতুন বাড়িতে কাল এসে যখন উঠলাম, তখনকার কথাই একবার বলি।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিল। বোধ হয় সন্ধ্যে ছটাই হবে, আমরা হাওয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গীটি একবার দেখে নিলে চারদিক। সন্ধ্যে ঘোর হতে আমরা এসে পৌছিলাম খামার বাড়িতে। তোমাদের বুড়ো জোসেফ একটা মোম বাতি নিয়ে এল। আমার মুখের সামনে ধরলো একবার। তারপর ঘোড়া দুটোকে নিয়ে গেল আস্তাবলে। আমার দেখেশুনে মনে হোল, আমরা যেন পুরানো কোনো প্রাসাদ দুর্গে এসে গেছি।

হিথক্লিফ জোসেফকে কি বলার জন্তে রয়ে গেল, আমি এসে ঢুকলাম রান্নাঘরে। একটা দুরন্ত ছেলেকে দেখলাম। নোংরা পোষাক তার পরনে, কিন্তু বেশ জোয়ান। ক্যাথেরিনের মতো ওর চোখ।

এই তাহলে ক্যাথেরিনের ভাইপো! ওর কাছে গিয়ে ওকে একটু আদর করতে চাইলাম।

কেমন আছ গো বাছা?

ও যা বললে তার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না।

হেয়ারটন ভাব করবে না আমার সঙ্গে?

ও তো গাল দিয়ে উঠলো।

আমি তো আবার উঠোনে এলাম। হিথক্লিফের দেখা নেই। এবার উঠোন পেরিয়ে আর একটা বন্ধ কামরা দেখতে পেলাম। সাহস করেই টোকা দিলাম। এবার হয়তো কারো দেখা পাব। এক মুহূর্ত কেটে গেল। যিনি এলেন তিনি লম্বা, ঢ্যাঙা এলোমেলো চুল, আর অসম্ভব নোংরা। ওঁর চোখও ক্যাথেরিনের মতোই। তবে এ যেন প্রেতের মতো, সৌন্দর্য ধ্বংস হয়ে গেছে।

উনি তো গর্জে উঠলেন, কি চাই? কে তুমি?

বললাম, ইসেবেলা লিণ্টন আমার নাম, আমাকে তো আপনি আগেও দেখেছেন। হিথক্লিফের সঙ্গে আমার সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে—ওই আমাকে এখানে এনেছে।

তিনি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো জিজ্ঞেস করলেন, ও কি ফিরেছে?

সবে আমরা ফিরেছি!

তাহলে পাজীর ধাড়িটা তার কথা রেখেছে। তিনি চারদিকে তাকালেন, আঁধারে যেন কাকেও খুঁজছেন। আমি কামরা থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইছিলাম। কিন্তু তার আগেই উনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। একটা বিরাট আগুনের কুণ্ড জলছে ঘরে। মেঝে নোংরা, ধুলো আর জঞ্জাল জমেছে চারদিকে। বললায় আমাকে একজন চাকরানীকে ডেকে শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিতে বলুন। কিন্তু মিঃ আর্ণ-শ উত্তর দিলেন না। পকেটে হাত

ডুবিয়ে আপন মনে পায়চারী করতে লাগলেন। আমার উপস্থিতি উনি ভুলেই গেছেন।

ভাবতো এলেন, আমার কি অবস্থা। বসে রইলাম তো রইলামই। ঘড়িতে বেজে গেল আটটা, নটা, কিন্তু তখনো মিঃ আর্ণ-শর পায়চারী থামেনি। মাঝে মাঝে গুঙিয়ে উঠছেন, অস্ফুট চীৎকার করছেন। আর্ণ-শ একবার আমার সামনে এসে থেমে পড়লেন। বিস্ময় তার চোখে। আমি সুযোগ পেয়ে আবার বললাম, আমি বড় ক্লান্ত, একজন দাসীকে ডেকে আমার ঘরটা দেখিয়ে দিতে বলুন।

দাসী তো নেই, উনি উত্তর দিলেন। তোমাকে নিজের দাসীগিরি করতে হবে।

তাহলে কোথায় শুতে যাব বলে দিন?

জোসেফ হিথক্লিফের কামরাটা দেখিয়ে দেবে। ঐ দরজাটা খুলে ফেল, ও তো ওখানেই আছে।

তাই করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় বাধা দিয়ে বললেন, দেখ, দরজায় খিল আটকে, চাবি বন্ধ করে শোবে, দেখো ভুলোনা যেন!

কেন?

কেন—দেখবে! এই বলে নিজের ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে একটা অদ্ভুত ধরনের পিস্তল বার করলেন। ওর নলে দু-ফলা স্প্রিং-এর ছুরি লাগানো। বললেন, খ্যাপা মানুষের কাছে এতো এক মস্ত প্রলোভনের জিনিস। আমি তো নিজেকে সংযত করতে পারিনি। তাই রোজ ওর ঘরের সামনে গিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করি। একদিন যদি কোনরকমে খোলা পাই ওকে তো সাবাড় করে দেব! করবোই; এক হাজারটা যুক্তি থাকলেও করবো। শয়তান আমাকে খুন করতে প্রলুব্ধ করে। শয়তানের সঙ্গে যতখুশি তুমি লড়তে পার, কিন্তু একদিন যখন সময় আসবে, সেদিন কে বাঁচাবে তার হাত থেকে?

অদ্ভুত অস্ত্রটা দেখতে লাগলাম, কৌতূহলী হয়ে। ঐটে যদি আমি পেতাম, আমার জোর কত বাড়তো! ওঁর হাত থেকে নিয়ে ছুরির ফলায় হাত দিলাম।

উনি আমার লুব্ধ দৃষ্টি দেখে অবাক হলেন। তাড়াতাড়ি যেন হিংসে করেই পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। ছুরির ফলা বুজিয়ে দিলেন।

বললেন, ওকে বোলো, ওকে পাহারা দিয়ে রেখো, আমি তো কিছুই গ্রাহ্য করিনে। তুমি তো জান আমাদের কি সম্বন্ধ!

কিন্তু হিথক্লিফ আপনার কি করেছে? জিজ্ঞেস করলাম। ওকে বাড়িতে ঠাঁই না দিলেই হয়!

না, না, গর্জে উঠলেন আর্ণ-শ। ও যদি চলে যেতে চায়, এখুনি ও মরবে। ওকে বোলো না। আমি কি সবই হারাব? হেয়ারটন কি ভিখারী হবে? আমি আবার সব পেতে চাই। ওর ঐ টাকাকড়ি সোনা পেতে চাই, তারপরে রক্ত। আর শয়তান নেবে ওর আত্মা!

এলেন, তুমি তো তোমার পুরানো মনিবের কথা আমাকে বলেছ। উনি তো পাগল। কাল রাতে তো তাই দেখেছি, আবার পায়চারী করতে লাগলেন। এরই মধ্যে আমি দরজার খিলটা খুলে চুপি চুপি রান্না ঘরে চলে এলাম। জোসেফ তখন জাউ রাঁধছিল। ওকে বললাম, আমাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দাও। ও আমার কথা শুনলে কি না কে জানে! তবে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমাকে নীচে নিয়ে এল। একটা কামরার সামনে এসে দাঁড়ালাম। এইটেই বোধ হয় বাড়ির সবচেয়ে ভাল কামরা। মেঝেয় ভাল গালচে পাতা, কিন্তু নক্সা তার ধুলায় বিবর্ণ; আগুনের কুণ্ড আছে। একখানা ওক কাঠের সুন্দর খাট, আর তার উপরে লাল রঙা মশারী। একেবারে আধুনিক মশারী, কিন্তু এর উপর বহু ধকল গেছে বলেই মনে হয়। চেয়ার গুলোও ভাঙাচোরা।

এই কামরা—এই বলে সে চলে গেল। মোমবাতিটা নিয়ে গেল সঙ্গে, আমি অন্ধকারেই রইলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হিথক্লিফ আমাকে জাগিয়ে দিলে। সে জিজ্ঞেস করলে, এখানে আমি কি করছিলাম।

বললাম, এই তো কামরা।

ও বললে, না, আমাদের কামরার চাবি আমার পকেটে। ওই আমাকে ক্যাথেরিনের অসুখের খবর দিলে। বললে, আমার ভাই এজন্য দায়ী। তারপর শাসালে এড্‌গারের উপর ওর ঝালটা আমার উপরেই মেটাবে।

আমি ওকে ঘৃণা করি—আমি অভাগী—আমি তো বোকার মতো কাজ করেছি। কিন্তু গ্রেঞ্জের কাউকে একথা বোলো না। রোজই তোমার অপেক্ষায় থাকবো। আমাকে নিরাশ কোরো না।

—ইসাবেলা।

চৌদ্দ

চিঠি পড়া শেষ করেই মনিবকে গিয়ে খবর দিলাম, ওঁর বোন ওয়াদারিং হাইটস্‌-এ আছেন, তিনি কর্ত্রীঠাকরুনের অসুখের কথা শুনে আসবার জন্যে উদ্‌গ্রীব, ওঁর আশা, মনিব আবার ওকে ক্ষমা করবেন।

লিণ্টন বকে উঠলেন, কি, ওকে ক্ষমা করবো। ওকে ক্ষমা করার তো কিছু নেই। তুমি আজ ওখানে গিয়ে বলে আসতে পার, আমি ওর উপর একটুও চটিনি। বরং ওকে হারিয়ে আমি দুঃখিত। আমার আরও ভয়, সুখী ও হবে না। ওকে দেখতে আমি যাব না, আমরা তো একেবারে আলাদা হয়ে গেছি।

ওঁকে বললাম, ওঁর কাছে দু-ছত্রও লিখবেন না ছোটকর্তা ?

না, তার দরকার নেই।

মুষড়ে পড়লাম। গ্রেঞ্জ থেকে রওনা হয়ে পথে আসতে আসতে ভাবছিলাম, ও নিশ্চয়ই সকাল থেকে আমার পথ চেয়ে বসে আছে। বাড়ির কাছে আসতেই ওকে তো জানালায় দেখতে পেলাম। হেসে মাথা নাড়লাম। কিন্তু পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে ও সরে গেল। দরজায় টোকা না মেরেই ঢুকে পড়লাম। কি হয়েছে বাড়িখানা। একেবারে ছন্নছাড়া চেহারা! আর ইসাবেলা যখন এল, ওকে দেখে চমকে উঠলাম। ওর সুন্দর মুখখানা শীর্ণ,

বিবর্ণ। চুলে সে সযত্ন কেয়ারী নেই ; এলোমেলো হয়ে আছে। হিণ্ডলে সেখানে ছিল না। হিথক্লিফ বসে ছিল। সে আমাকে দেখে চেয়ার এগিয়ে দিলে। ওকেই ওখানে একমাত্র ভদ্র দেখাচ্ছিল।

ইসবেলা আমাকে দেখে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলে। সে তার দাদার প্রত্যাশিত চিঠিখানা চায়। আমি মাথা নাড়লাম। ও সঙ্কেত বুঝতে পারলে না, আমাকে এক কোণে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে আমার কাছে চাইলে। হিথক্লিফ আঁচ করে নিয়ে বললে, ইসাবেলার জন্যে যদি কিছু এনে থাক, ওকে দাও! গোপন করতে হবে না। ওর আর আমার মধ্যে, গোপন তো কিছু নেই।

সত্যি কথাই বললাম, আমি কিছুই আনিনি। মনিব বলে দিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে চিঠি আর দেখা করার আশা বৃথা! তবুও ভালবাসা জানিয়েছেন, বলেছেন, তোমরা সুখী হও এই তার কামনা!

ইসাবেলার ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠলো, ও আবার জানালার ধারে ফিরে গেল। ওর স্বামী ক্যাথেরিনের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। জেরার পর জেরায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললে। আমি ক্যাথিকেই দুষলাম আর ওকে নিষেধ করে দিলাম, ও যেন ভবিষ্যতে ওই পরিবারের বিঘ্নস্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়।

বললাম, ক্যাথি এখন একেবারে অন্য মানুষ। ওর চরিত্রই বদলে গেছে। ওর ছেলেবেলার সঙ্গী এখন ওর অতীত স্মৃতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে।

হিথক্লিফ শান্ত স্বরেই বললে, তুমি কি মনে কর আমি অতীতের ক্যাথির স্মৃতি নিয়েই খুশি থাকবো?

ওর সঙ্গে আমার তুলনা করছো? এই বাড়ি ছাড়বার আগে তোমার কাছ থেকে আমি এই কথা আদায় করবো যে, তুমি ওর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবে। তুমি রাজি বা গররাজি হও, দেখা করবোই! কি বল তুমি?

বললাম, না, দেখা করবে না! আমাকে দিয়ে তো হবেই না। আর-একবার তোমার সঙ্গে মনিবের দেখা হলে যা কাণ্ড হবে, তাতে ও আর বাঁচবে না।

তুমি মনে করলে সেটা নাও হতে পারে, আর ঐ এড্‌গার কি সে সাহস করবে! আমাকে একটা কথা বলবে, ওকে হারালে কি ক্যাথির খুব লাগবে! ওর জায়গায় আমি হলে তো এমন কাণ্ড করতাম না। তুমি অমন করে তাকিয়ে থাকতে পার! কিন্তু সত্যি বলছি, ওর যতদিন ঐ হতভাগার প্রতি মমতা থাকবে, ততদিন আমি কিছু করব না। যেদিন তা উবে যাবে, সেদিন আমি ওর কলজেটা ছিঁড়ে নিয়ে রক্ত চুষে-শুষে খাব। কিন্তু যতদিন তা না হয় ততদিন তো এমনি থাকবো, ওর এক গাছা চুলও ছোঁব না।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ও যখন তোমাকে ভুলে যেতে বসেছে, তখন ওর স্মৃতি পথে হানা দিয়ে ওর আরামের শেষ পথটুকু নষ্ট করে দিচ্ছ। তোমার কি বিবেক বলে কিছু নেই?

তুমি বুঝি ভেবেছ, ও আমাকে ভুলে গেছে? না, ও ভোলে নি। তুমি আর আমি দুজনেই ভাল করে জানি, ওর স্বামীর কথা যদি একবার ভাবে তো, আমার কথা ভাবে একশোবার। গত গ্রীষ্মে এসে ভেবেছিলাম, ও হয়তো ভুলে গেছে। তাহলে তো লিণ্টন, হিণ্ডলে আর আমার স্বপ্ন সব গুঁড়িয়ে যাবে। দুটি কথা আমার ভবিষ্যৎ রচনা করবে—সে দুটি কথা মৃত্যু আর নরক। কিন্তু আমি তো বোকা, তাই অমনি কথা ভেবেছিলাম। ঐ এড্‌গার যদি মনপ্রাণ দিয়েও ভালবাসে, আমি একদিনে ওকে যতখানি ভালবাসব, ও আশী বছরে তা পারবে না। আর ক্যাথেরিনের মন তো আমারই মতো! ঘোড়ার দানাপানির পাত্রে যদি সমুদ্রকে আটক রাখা যায়, তাহলে বুঝি আমার উপরে ওর ভালবাসার উপমা দেওয়া যায়। ওর কুকুরের মতোই ও তাকে ভালবাসে, বা ঘোড়ার মতো। আমার মতো ভালবাসা ও ক্যাথির কাছ থেকে পায় নি। ওর যা নেই, তার জন্যে ওকে কি ক্যাথি ভালবাসতে পারে?

ইসাবেলা হঠাৎ উদ্দাম হয়ে উঠলো, ক্যাথেরিন আর এড্‌গার দুজনে দুজনকে মানুষ যতখানি ভালবাসতে পারে, ততখানিই ভালবাসে। আমার ভাইয়ের সম্বন্ধে কেউ এভাবে কথা বলবে, আর আমি চুপটি করে সয়ে যাব—তা হবে না!

হিথক্লিফ বিদ্রূপভরে বললে, তোমার ভাই তোমাকে খুব ভালবাসে—তাই না? তাই তো তোমাকে ছনিয়ায় ছেড়ে দিয়েছে! তোমার কথা ভাবেও না।

সে উত্তর দিলে, আমি কি সইছি ও তো জানেও না। আমিও তো ওকে জানাই নি।

তাহলে কিছু অন্তত জানিয়েছ। চিঠি লিখেছ নাকি?

আমি সে বিয়ে করেছি সেকথা জানিয়েছি। সে চিঠি তো দেখেছ।

তারপরে আর নয়?

না।

বললাম, ওঁর অবস্থা তো এখন বেশ খারাপ দেখছি। ভালবাসা উনি পান নি— তবে সেটা কার দোষ বলবো না।

হিথক্লিফ চেঁচিয়ে উঠলো, ওটা তো একটা বেশ্যা হয়ে গেছে! ওর আমার উপর আর মন নেই। তুমি জান, বিয়ের পরদিনই ভোরে বাড়ি ফেরার জন্যে ওর কি কান্না! যাহোক, এই বাড়িতে ওকে নজরবন্দী রাখবো— যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেব না।

বললাম, তুমি জান তো উনি বাপের একমাত্র মেয়ে, সবাই ওঁর হুকুম মেনে চলতো। ওর জন্যে একটা ঝি রেখে দাও। একটু যত্ন কর। মিঃ লিণ্টন সম্পর্কে তুমি যা-ই ভাব, ও তো নিরীহ মানুষ। ও ভালবাসতেও জানে। তা না হলে সমস্ত আরাম আর বিলাস, বন্ধুবান্ধব ফেলে দিয়ে তোমার কাছে এই বনবাদাড়ে চলে আসতো না!

ও একটা মোহের উপরে ছেড়ে ছিল। আমাকে ও উপন্যাসের নায়ক ভেবে ছিল, আর আমার কাছ থেকে চেয়েছিল শ্রদ্ধা। আমি তো ওকে প্রকৃতিস্থ জীব বলেই ভাবি না। আমার চরিত্র সম্বন্ধে কি আজগুবি সব ভাবনা ভেবে সেই মতো ও কাজ করতো। কিন্তু এখন আমাকে চিনেছে। ও জেনেছে আমি ওকে ভালবাসি নে। এক সময়ে তো ভেবেছিলাম, ওকথা ওকে টের পাইয়ে দেয়া যাবে না। কিন্তু এখনো তেমন ফল দেয় নি।

এই তো আজ ভোরেই জাহির করলে, ও নাকি টের পেয়েছে, আমাকে ওর ঘৃণা করাই উচিত। উঃ, কি অমানুষিক শ্রম ভাবতো! ইসাবেলা, তোমার কথা ঠিক্ তো? আমাকে ঘৃণা কর তো? একদিন যদি তোমাকে রেখে অন্যত্র যাই, আবার ফিরে এলে তো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছুটে আসবে আমার কাছে। তোমার সামনে অন্তত একটু ভাল ব্যবহার করি এই ও চায়, সত্যটা প্রকাশ পেলে ওর গর্বে ঘা লাগে বলেই চায়। কিন্তু আমি তো মিছে বলি নি, ওর উপর যে ভান করেও একবার ভাল ব্যবহার করেছি সে নালিশ ও করতে পারবে না। নেলি, তোমার মনিবটিকে বোলো, ওর মতো এমন অপদার্থ মেয়ে জীবনে দেখিনি। এমন কি অমন যে লিণ্টন পরিবার তাঁদেরও নাম হাসিয়েছে। মাঝে মাঝে তো দিশে হারিয়ে ভাবি, ও কত সইতে পারে। এখনো আঁকড়ে আছে কেন? কিন্তু ওর ঐ ভ্রাতৃস্নেহে বিচলিত আর কড়া হাকিমি মেজাজ যেন শান্ত রাখে। আমি আইনের বাইরে কিছু করছি না—করবোও না। ও যদি চলে যেতে চায় যাবে, ওর উপস্থিতিটাই একটা উপদ্রব বিশেষ, ওর উপর অত্যাচার করে তো ততখানি আরামও পাই না।

বললাম, দেখ হিথক্লিফ, এ তোমার পাগলের মতো কথা। তোমার বৌ নিশ্চয়ই জানে তুমি বদ্ধ পাগল। তাই সব সয়ে যায়। কিন্তু যখন ওকে যেতে বলছো, ও নিশ্চয়ই এবার যাবে। ওগো ঠাকরুন, তুমি কি একেবারে মোহে পড়লে নাকি—কি, এখানে থাকবে?

ইসাবেলার চোখ জ্বলে উঠলো, এলেন, সাবধানে কথা কও! ওর কথায় কান দিও না। ও একটা মিথ্যেবাদী শয়তান—ও মানুষ নয়। আরো বহুবার বলেছে, আমি চলে যেতে পারি। কিন্তু চেষ্টা করেও দেখেছি। কিন্তু আর সে সাহস নেই। এলেন, আমার ভাই আর ক্যাথিকে কিছু বলবে না এই কথা দাও। ও যতই ভান করুক, এড্‌গারকে ও খেপিয়ে দিতে চায়। ও বলে, আমাকে বিয়ে করেছে ওকে কায়দায় পাবে বলে। কিন্তু ও তা পারবে না। তার আগে আমি মরবো। মাঝে মাঝে তো ভাবি, ওর অতো শয়তানি বুদ্ধি কেন, ওতো আমাকে খুন করলেই পারে।

হিথক্লিফ বাধা দিল, এখন এই-ই যথেষ্ট। নেলি, আদালতে ডাক পড়লে এই কথাগুলো মনে রেখো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ! ও তো ঠিক আমার মনের মতো হয়ে এসেছে। না, না, ইসাবেলা, তুমি তোমার নিজের অভিভাবিকা হবার উপযুক্ত নও। আমি তোমার আইনত রক্ষক, তোমাকে রক্ষা করতেই হবে। যাও, উপরে যাও! এলেনের সঙ্গে আমার আরো ক'টা কথা আছে। ও পথে নয়, ও পথে নয়! বলেছি তো উপরে যাও, যাও!

এই যে এই পথ!

ওকে ধরে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিলে ঘর থেকে। তারপর ফিরে এসে বললে, আমার মায়া-দয়া নেই। পোকা যতই ছটফট করে ওঠে যন্ত্রণায়, আমি ততই তাকে দলে—পিষে দিতে চাই! এ এক চমৎকার নীতিশিক্ষা এলেন। যতই ব্যথা বাড়ে, ততই আমি দলে-পিষে দিই!

টুপীটা পরে নিয়ে বললাম, দয়া মায়ার মানে তুমি বোঝ? কখনো দয়া-মায়া কি জীবনে জেনেছ?

আমি চলে যাচ্ছি দেখে বললে, টুপীটা খুলে রাখ। এখন যেতে পাবে না। হয় তোমাকে ক্যাথেরিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তোমাকে রাজি করাব, নয়তো বাধ্য করাতে হবে। শোন, তার প্রতি আমি কিছু করতে চাই না। কোনো হাঙ্গামা বাঁধাতে চাই না। মিঃ লিণ্টনকে রাগিয়ে বা অপমান করেও আমার কোন লাভ নেই। ওর মুখ থেকে শুধু আমি শুনতে চাই, ও কেমন আছে? কেন ওর অসুখ হোল। আমি ওর জন্যে কি করতে পারি। কাল রাতে ছ' ঘণ্টা গ্রেঞ্জের বাগানে ছিলাম, আজ রাতেও আবার যাব। ঢোকার সুযোগ আমাকে করে নিতে হবে। এড্‌গারের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, তাকে পেড়ে ফেলতে আমার আটকাবে না। ওর চাকর-বাকর যদি বাধা দিতে আসে, আমার পিস্তল দেখিয়ে ওদের শাসাব, তাড়িয়ে দেব। কিন্তু তার দরকার কি! তুমিই তো সহজে বন্দোবস্ত করে দিতে পার। যখন যাবো, তোমাকে আগেই জানিয়ে দেব। তুমি আমাকে চুপি চুপি

ঢুকিয়ে নেবে। আমি যে পর্যন্ত না যাব, তুমি নজর রাখবে। তাহলে তো তোমার বিবেক ঠাণ্ডা থাকবে? কোন হাঙ্গামাই হবে না।

আমি প্রতিবাদ জানালাম; বললাম, একটা কিছু হলে তখন ক্যাথির সর্বনাশ হবে। তুমি আমাকে আর অনুরোধ কোরো না, তাহলে আমি মনিবকে জানাব। তিনি তখন বাড়িতে পাহারা বসাবার বন্দোবস্ত করবেন।

তাহলে আমিও আমার উপায় দেখবো! গর্জে উঠলো হিথক্লিফ। কাল ভোরের আগে ওয়াদারিং হাইটস্ থেকে তুমি যেতে পাবে না। ক্যাথেরিন আমাকে দেখতে চায় না, একথা বললে! তোমরাই ওকে এমনি করে রেখেছ। বললে না, আমার নামও সে করে না,—কি করে করবে—আমার নাম করাটাও যে নিষেধ। ও তো তোমাদের সবাইকে গোয়েন্দা বলে ভাবে—তোমরা ওর স্বামীরই তো গোয়েন্দা। তুমি না বললে, ও অস্থির হয়ে যাবে, সব সময়েই কি যেন উদ্বেগ—ওর বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কি করে না হয়ে পারে তাই বল? ঐ একটা ক্ষীণজীবী অপদার্থের সহবাসে তো তাই হবে। এ যেন বিরাট এক ওকগাছকে এনে ফুলের টবে বসানো, এমনিই তো হয়—সে কি বাঁচে। অমন যত্ন করলে তার কি হবে। যাকগে ওকথা, এখন জলদি চল। এখানে থাকবে, আর আমি লিণ্টন আর ওর ঐ দরোয়ানদের সঙ্গে লড়াই করে ক্যাথিকে দেখে আসবো?—না, আমার বন্ধু হয়ে আমার অনুরোধটা রাখবে। যা হয় ঠিক করে ফেল! আর এক মুহূর্তও সবুর সইছে না।

আমি কত বললাম, কতবার অস্বীকার করলাম, কিন্তু ও আমাকে রাজী করিয়ে তবে ছাড়লো। ওর থেকে ঠাকরুনের কাছে একখানা চিঠি নিয়ে যাব। তিনি রাজী থাকেন তো মনিবের অনুপস্থিতির সুযোগে ও চলে আসবে। এটা উচিত না অনুচিত হোল। হয়তো অনুচিতই। কিন্তু রাজী হতে হোল।

এইবার নেলি থামলো। পরে বলে উঠলো, ঐ যে কেনেথ ডাক্তার আসছেন গো। যাই, ওঁকে গিয়ে বলি আপনি অনেক ভাল আছেন।

পনেরো

এক সপ্তাহ চলে গেল। আমি তখন সুস্থ। এর মধ্যে নেলি এসে মাঝে মাঝেই আমাকে বলেছে। আমি সেগুলিকে জড়ো করে ওর ভাষায়ই উপহার দিচ্ছি। ভাষার উপরে কারিকুরি তো চলে না।

সেদিন সন্ধ্যায় ভাবলাম, হিথক্লিফ নিশ্চয়ই আশে পাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। আমি তো বাইরে একবারও গেলাম না। চিঠিখানা আমার কাছেই তখন রয়ে গেছে। মনিব বাড়ির বাইরে না গেলে তো চিঠি দেব না বলেই ঠিক ছিল। এর মধ্যে তিন দিন কেটে গেল। রোববারে সবাই যখন গীর্জায় গেছে, তখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম।

কর্ত্রী ঠাকরুন সাদা পোষাক পরে জানালায় বসে ছিলেন, কাঁধের উপরে ছিল হালকা শালখানা। ওঁর সামনে খোলা একখানা বই। পাতাগুলি হাওয়ায় পৎপৎ করে উড়ছিল। ওখানা বোধহয় লিণ্টনই ফেলে রেখে গিছলেন। উনি তো আজকাল ওকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বই পড়ে শোনান।

আমি বললাম, তোমার একখানা চিঠি আছে গো। এখুনি পড়ে ফেলতে হবে—উত্তর এখুনি চাই। সীলমোহর খুলে ফেলবো? উনি মাথা নাড়লেন। আমি খুলে ফেললাম। এবার বললাম, পড় গো! উনি হাতে তুলে নিতে গিয়ে ফেলে দিলেন। তুলে নিয়ে ওর কোলের উপর রাখলাম। তারপর রইলাম প্রতীক্ষায়। কিন্তু উনি তো সেদিকে তাকাচ্ছেনই না। বললাম, আমি কি পড়বো! হিথক্লিফ লিখেছে।

চমকে উঠলেন, এক ঝলক স্মৃতি যেন এসে পড়লো। যেন নিজের মনের ভাবগুলিকে সাজিয়ে নেবার এক সংগ্রাম শুরু হোল। চিঠিখানা হাতে তুলে নিলেন, মনে হয় পড়েও ফেললেন। শেষ করে বুঝি বা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। তখনো যেন অর্থ বুঝতে পারছেন না।

ব্যাখ্যা করতেই হবে। তাই বললাম, তোমার সঙ্গে ও দেখা করতে চায়। এতক্ষণে বোধকরি বাগানে এসে বসে আছে। উত্তরের অপেক্ষা করছে। কথা বলতে বলতে দেখলাম, একটা কুকুর শুয়ে আছে বাইরে ঘাসের উপরে। সেটা ডেকে উঠতে যাবে, হঠাৎ সে ডাক না দিয়ে লেজ নাড়লো। মিসেস-লিণ্টন ঝুঁকে পড়লেন, নিশ্বাস রুদ্ধ করে শুনলেন। হল ঘরে এবার পায়ের শব্দ। হিথক্লিফের পক্ষে খোলা ফটক তো এমন প্রলোভন যে সে না ঢুকে পারে নি। বোধহয় এও ভেবেছিল, আমি আমার কথা রাখিনি। তাই নিজের সাহসের উপরই সে নির্ভর করেছে। ক্যাথেরিন ফিরে তাকাল দরজার দিকে। হিথক্লিফ ঘর খুঁজে পাচ্ছিল না—ও তাই আমাকে নিয়ে আসতে বললো। দরজা অবধি এগিয়ে যেতেই দেখলাম, ও এসে গেছে।

ও ওর কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলো। মুখে কথা নেই। নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধেছে, চুমু খাচ্ছে, অজস্র চুমু—এত চুমু বুঝি জীবনে ওকে খায়নি! কিন্তু আমার মনিবানীই প্রথম চুমু দিলেন; মনে হোল হিথক্লিফ যেন আর ব্যথা সইতে পারছে না। ওর মুখের দিকে সে তাকাচ্ছে না। আমারও ওর মতোই মনে হোল—মনিবানীর এ অসুখ সারবার নয়—মৃত্যুই ওঁর নিয়তি।

ও হতাশায় চীৎকার করে উঠলো, ক্যাথি, ক্যাথি! এমনভাবে তাকাল মনে হোল এবার বুঝি চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়বে। কিন্তু উদ্বেগে জ্বলছে ওর চোখ, গলে গলে তো পড়ল না অশ্রুধারা।

ক্যাথেরিন এলিয়ে পড়লো আবার। ভ্রূতে যেন মেঘ জমেছে ভ্রূকুটির। সে বললে, হিথক্লিফ, তুমি আর এড্‌গার তো আমার বুকখানা ভেঙে দিয়েছ! আবার আমার কাছে তোমরা দুজনেই কাঁদতে এলে—যেন তোমাদের করুণা করা সম্ভব। না, তোমাকে তো আমি দয়া করবো না! তুমি আমাকে খুন করেছ! তুমি কত জোয়ান! আমি মরে গেলে আরো কতদিন বাঁচতে চাও?

হিথক্লিফ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে গেল। ক্যাথি ওর চুল হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলো।

ক্যাথি তিক্ত স্বরে বললে, আমার কি ইচ্ছে হয় জান, এমনি করে তোমাকে ধরে রাখি, তারপরে আমাদের মৃত্যু হোক। তোমার এক ফোঁটা দুঃখ নেই? কেন দুঃখ সইবে না বল? আমি কবরে গেলে আমাকে কি ভুলে যাবে? বিশ বছর পরে এসে বলবে, এই সেই ক্যাথেরিনের কবর। ওকে বহুদিন আগে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু বহুদিন তা শেষ হয়ে গেছে। তারপরে তো কত-জনকে ভালবেসেছি। আমার কাছে আমার ছেলে মেয়েরা ওর চেয়ে প্রিয়। মৃত্যু হলে যে ওর কাছে যাব তাতেও তো খুশি হতে পারছি না। ওদের যে ছেড়ে যেতে হবে? কেমন, একথা বলবে তো?

হিথক্লিফ তার মাথাটা সরিয়ে নিয়ে দূরে সরে গেল। ওকথা বোলো না! আমি যে পাগল হয়ে যাব। যখন মরতে বসেছ, তখন তোমার মুখে এ কি কথা? তুমি কি ভাবতে পার, এই কথা থাকবে আমার স্মৃতিতে গাঁথা, তুমি চলে গেলে আমার বুকখানা কুরে কুরে খাবে? আমি তোমাকে খুন করেছি —এতো তোমার মিথ্যে কথা। তুমিও তা জান। ক্যাথি, তুমি তো জান তোমাকে ভোলাও যা আমার জীবন হারানোও তাই। তুমি সুখে শান্তিতে থাকবে, আর আমি কি এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করবো?

ক্যাথি কঁকিয়ে উঠলো, না, আমার আর শান্তি নেই। তারপর ওর বুকে স্পন্দন জাগলো উত্তেজনায়। ও চুপ করে গেল। উত্তেজনা চলে যেতে বললে, আমার চেয়ে তোমাকে ভুগতে আমি বলি না। শুধু চাই, আমরা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাই। কাছে এস, আবার হাঁটু গেড়ে বস। আসবে না?

হিথক্লিফ আবার এসে চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল। ক্যাথি ঘুরে ওকে দেখতে গেল। কিন্তু হিথক্লিফ চলে গেল অগ্নিকুণ্ডের কাছে। ক্যাথির মনে সন্দেহের দোলা—ও আমাকে বললে, নেলি, দেখছ তো আমাকে কবরে পাঠাতে ওর দ্বিধা নেই! এই ওর ভালবাসা! বেশ, বেশ! এতো আমার সেই হিথক্লিফ নয়। আমার হিথক্লিফ তো আছে আমার আত্মায়। থেমে গেল ক্যাথি। কি ভেবে আবার বলতে লাগলো, এই ভাঙাচোরা জেলখানাটা আর তো ভাল লাগে না।

আগেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। তোমার জানালার কাছ থেকে আমি নড়বোনা।

ওকে জড়িয়ে ধরে ক্যাথি বলে উঠলো, না, না, তুমি যেও না! যেও না।

একঘণ্টার জন্য তো চলে যাচ্ছি।

এক মুহূর্তের জন্যও না, ও উত্তর দিলে।

আমাকে যেতেই হবে—লিণ্টন এখুনি উপরে আসবে।

কিন্তু ক্যাথির মুখে দৃঢ়সংকল্প! না, না, তুমি যাবে না। এই তো বারের বার শেষবার। এড্‌গার আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। হিথক্লিফ, তুমি চলে গেলে আমি মরে যাব—মরে যাব!

ঐ তো ও এল। বোকা কোথাকার! হিথক্লিফ বসে পড়লো আবার। চুপ, চুপ ক্যাথি। আমি থাকবো। ও যদি গুলীও ছোঁড়ে, আমি আশীর্বাদ করতে করতে মরে যাব।

আবার নিবিড় আলিঙ্গনে ওরা বদ্ধ হোল। মনিব আসছেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ—ঘামিয়ে উঠছে আমার কপাল। আমি ভয় পেলাম।

ওকে বললাম, তুমি কি ওর পাগলামি শুনবে। ও কি বলছে, নিজেই জানে না। ওর সর্বনাশ করবে নাকি? ওর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই বলেই তো অমন করছে! ওঠো! এখুনি ওকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে চলে যাও!

হাত মোচড়াতে লাগলাম; তারপর চেঁচিয়ে উঠলাম। এর মধ্যে দেখলাম, ক্যাথির হাত খসে পড়েছে ওর গলা থেকে, মাথা ঝুলে আছে।

ও তো মূর্চ্ছা গেছে! যাক ভালই হোল। এর চেয়ে মরাই ওর ভাল।

এড্‌গার এসে ঢুকলেন। অপ্রত্যাশিত অতিথিকে দেখে চমকে গেলেন, রেগে উঠলেন। কি করবেন জানি না, কিন্তু থেমে পড়লেন।

হিথক্লিফ ক্যাথির মৃতম্লান দেহখানার দিকে তাকিয়ে বললে, আমাকে কিছু বলার আগে একে দেখুন।

ওর চেতনা ফিরিয়ে আনতে আমরা চেষ্টা করলাম। খানিকক্ষণ পরে

ও চেঁচিয়ে উঠলো। এড্‌গার দুর্ভাবনায় ঘৃণিত বন্ধুর কথা ভুলে গেছলেন। কিন্তু আমি ভুলি নি। আমি ওকে চলে যেতে বললাম।

ও বললে, আমি বাইরে যাচ্ছি। তবে বাগানে থাকবো। কিন্তু তোমার কথা রেখো নেলি, কাল ঐ গাছের কাছে আসবে। নইলে আমি আবার আসবো। সে লিন্টন থাকুক চাই না-ই থাকুক।

সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

ষোল

সেদিন রাতেই জন্মাল ঐ ওয়াদারিং হাইটস্‌-এর ক্যাথিরিন, ও এক অবহেলিত শিশু। কেউ তাকে চায় নি, তবু এল। আর দুঘণ্টা পরেই মারা গেল তার মা।

পরদিন সকালটা ছিল সুন্দর, নিঃশব্দে ঘরে এসে পড়ছিল ভোরাই আলো। কাউচে এসে চল্‌কে পড়ছিল, এড্‌গার লিন্টন নিঃশব্দে চোখ বুজে শুয়েছিলেন। যেন মৃতের মতো নিস্পন্দ। আর ক্যাথি! সে যেন চির শান্তিতে শুয়ে আছে। ভ্রূ নিশ্চল, চোখের পাতা বোজা, ঠোঁটে একটু বা হাসি। ওর চেয়ে বুঝি স্বর্গের দেবীও সুন্দরী নন।

মনিবকে ঘুমোতে দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। দাসদাসীরা ভাবলে, সারারাত জেগেছি বলে বুঝি ক্লান্তি দূর করতে বেরিয়েছি। কিন্তু তা নয়। হিথক্লিফের সন্ধানে গেলাম। ও যদি সারারাত বাগানে ঘুরেও বেড়ায় তাহলেও জানতে পাবে। যদি জানালার ধারে এসে থাকে তাহলে হয়তো দেখেছে আলো, শুনেছে সদর দরজা খোলার শব্দ। ওর মনে হতে পারে, কিছু একটা হয়েছে; কিন্তু জানতে তো পারে নি। ওকে এ খবর জানাতে হবে। ও পার্কে কোথাও আছে। আর পেলামও তাই। একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে, মাথায় টুপী নেই, চুল শিশির-ভেজা। হয়তো বহুক্ষণ অমনি আছে। দুটো পাখী ওর পাশেই খড়কুটো এনে বাসা বাঁধছে। ওরা

তাকে গ্রাহ্য করছে না। যেন এক টুক্‌রো কাঠ আর কি! আমাকে দেখে ওরা উড়ে চলে গেল। ও চোখ তুলে তাকিয়ে বললে,

ও মারা গেছে! তোমার খবরের জন্য অপেক্ষা করে থাকিনি। তোমার ঐ চোখে রুমাল দিয়ে কান্না থামাও! ও তোমাদের অমন কান্না চায় না।

আমি কাঁদছিলাম ক্যাথি আর হিথক্লিফ দুজনেরই দুঃখে। সময় সময় তো এমনও হয়, যারা নিজেদের উপরও মায়াদয়া দেখায় না, এমন লোককেও আমরা ভালবেসে ফেলি। ওর মুখ দেখেই বুঝেছিলাম, ও জেনেছ, আর ঠোঁট নাড়তে দেখে মনে হয়েছিল, ও বুঝি প্রার্থনা করছে।

চোখ মুছে বললাম, হাঁ, ও মারা গেছে! হয় তো স্বর্গেই গেছে!

বলো কি করে ও মরলো? হিথক্লিফ অধীর।

বললাম, একেবারে চুপচাপ করে! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজেকে এলিয়ে দিলে ঘুমে। পাঁচমিনিট পরে নাড়ি ধরে দেখি, আর নেই।

ও কি আমার কথা কিছু বলেছিল? ও দ্বিধাভরে শুধালো।

তুমি চলে যাবার পর ওর তো আর জ্ঞান ফিরে আসে নি। ওর মুখে ছিল মিষ্টি হাসি; আর শেষকালে ও তো ছেলেবেলার কথাই বলতো। ওর জীবন তখন স্বপ্নে ঘেরা—আহা ও যেন অন্য জগতে শান্তি পায়!

যেন ও দুঃখই ভোগ করে, হিথক্লিফ গর্জে উঠলো। পা দাপাচ্ছে, ক্রোধে সে অধীর। ও শেষ অবধি মিথ্যে কথাই বলে গেছে? ও এখন কোথায়? ঐ স্বর্গে তো নয়—ও নরকেও যায়নি—মরেওনি। ক্যাথি, ক্যাথি। তুমি না বলেছিলে, আমার দুঃখে তোমার সহানুভূতি নেই? আজ আমিও তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি—ক্যাথেরিন আর্ণ-শ, তুমিও যেন জীবনে শান্তি না পাও! প্রার্থনা করতে করতে জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তুমি বলেছিলে, আমিই তোমাকে খুন করেছি। বেশ তো প্রতিশোধ নিতে আমার কাঁধে এসেই ভর কর। খুনীর উপর এমন করেই তো প্রতিশোধ নিতে হয়। তুমি যে রূপেই থাক, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক, আমাকে পাগল

করে দাও। শুধু আমাকে ছেড়ে চলে যেও না—আমার জীবন তো তুমি, আত্মাও তুমি, তুমি যদি চলে যাও আমি কি নিয়ে বাঁচবো?

গাছের গুঁড়িতে ও মাথা কুটতে লাগলো। গাছের বাকলে রক্তের দাগ দেখতে পেলাম। ওর কপালে আর হাতে রক্তের দাগ। ওর এই মাথা কোটা হয় তো সারা রাত ধরেই চলেছে। তবু মায়া হোল না—ভয়ই পেলাম, কিন্তু তবু ছেড়ে চলে যেতেও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু ও একটু প্রকৃতিস্থ হয়েই বুঝতে পারলো, আমি লক্ষ্য করছি, অমনি বাজখাঁই গলায় গর্জে উঠে চলে যেতে বললে। ওকে শান্ত করা বা সান্ত্বনা দেওয়া কি আমার সাধ্যি!

শুক্রবারের আগে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হোল না। ফুল আর পাতায় ঢাকা শব রইল বসবার ঘরে। লিণ্টন সেখানে সারা দিন রাত সজাগ প্রহরীর মতো পাহারা দিতে লাগলেন। আর আমি ছাড়া কেউ জানলে না যে, হিথক্লিফও অমনি করে পার্কে কাটালে রাত আর দিন। তারও তখন বিশ্রাম নেই।

মঙ্গলবার দিন। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। মনিব আর বসে থাকতে না পেরে নিজের ঘরে একটু গেলেন, আমি এই সুযোগে গিয়ে জানালাটা খুলে ফেললাম। একবার ওকে শেষ দেখা দেখতে দেব। ও নিজেও সে সুযোগ ছাড়ল না। ও নিঃশব্দে এল। আমিও টের পেতাম না, যদি না শব ঢাকা কাপড়খানা একটু এলোমেলো হয়ে যেত। আর মেঝেও দেখলাম রুপোলী সুতো দিয়ে বাঁধা এক গোছা চুল পড়ে আছে। ক্যাথেরিনের গলায় ছিল পদক তার থেকেই সুতোটা দেওয়া। হিথক্লিফ পদকখানা খুলে তার ভিতরে রেখে গেছে নিজের চুল।

আর্ণ-শ অবশ্য খবর পেলেন। কিন্তু এলেন না; তাই শবযাত্রী দলে এক ওর স্বামী ছাড়া আর যারা রইল সবাই প্রজা আর দাসদাসী। ইসাবেলাকে তো বলাই হোল না।

ক্যাথেরিনের সমাধি লিণ্টনদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে হোল না

আত্মীয়স্বজনদের পাশেও তার স্থান হোল না। এক টেরে একটু ঘাসেভরা ঢাল জমিতে ওকে কবর দেওয়া হোল, পাশেই দেওয়াল নিচু হয়ে গেছে, তারপরেই জলা শুরু। ওর স্বামীকেও ওখানেই পরে কবর দেওয়া হয়, ওদের সমাধি ফলক দুটিতেও কোন জাকজমক নেই। একেবারে সাদাসিদে।

সতেরো

শুক্রবার থেকেই ঝড়বাদল শুরু হোল। আর পুরো একমাস ধরে চললো। সন্ধ্যে হতেই শুরু হয়ে গেল। দক্ষিণ থেকে উত্তর-পূর্বে ছুটে চললো হাওয়া, বৃষ্টি নিয়ে এল। তারপরেই তুষারের পালা। পরের দিন কেউ কি ভাবতে পারলে, যে, একদিন আগেও ছিল বাসন্তী দিন। ফুলগুলি ঢেকে গেল বরফের ফাটলে; লার্ক চুপচাপ; গাছের কচি পাতা তখন তুষারাহত, বিবর্ণ। শীত এসে জুড়ে বসলো, আর বিষাদ, মনিব তো এখন ঘরে বন্দী হয়ে থাকেন। আমিই বসার ঘর জুড়ে আছি। এটাই এখন শিশুর ঘর। শিশু কাঁদে, আমি হাঁটুর উপর রেখে দোলা দিই। সেদিনও এমনি করেই সময় কাটাছিলাম, এমন সময় দরজা খুলে গেল। হাসির শব্দ। ভাবলাম, কোন পরিচারিকা বুঝি! তাই চটে গিয়ে মুখ না ফিরিয়েই বললাম, এখানে এলে কেন? মিঃ লিণ্টন তোমার ঐ হাসি শুনলে কি ভাববেন বল তো? পরিচিত স্বরে উত্তর এল, আমাকে মাপ কর, এখন এড্‌গার শুয়ে আছে জেনেই এলাম।

ও আগুনের কাছে এসে বললে,

বাবা! ওয়াদারিং হাইটস্ থেকে এক ছুটে চলে এসেছি, হাঁফাতে হাঁফাতে বললে। কতবার যে হোঁচট খেয়েছি তার ঠিক নেই। সারা গায়ে তো ব্যথা! যাক বাপু ভয় পেওনা। আমি সব কথাই বলবো। এখন গিয়ে গাড়োয়ানকে

গাড়ি তৈরী করতে বল, আমাকে গিমারটনে যেতে হবে, আর কাউকে বল কিছু কাপড়চোপড় যেন এখুনি আমার পোষাকের আলমারী থেকে নিয়ে আসে।

যিনি এলেন, তিনি শ্রীমতী হিথক্লিফ—আমাদের ইসাবেলা। চুল এলিয়ে পড়েছে, তুষার আর জল গড়িয়ে পড়ছে; ওর সেই আগেকার পোষাক ওর পরনে। হালকা শিল্কের পোষাক, ভিজে লেপটে আছে, পায়ে হাল্কা চটি। কানের কাছে একটা ক্ষত দেখে চমকে উঠলাম, শুধু এত ঠাণ্ডা বলেই রক্ত ঝরছে না, ওকে দেখে মনে হোল, ও যেন এখুনি ভেঙে পড়বে।

তাই বললাম, ওগো দিদিঠাকরুন গো, আমি কোথাও যাব না, কোনো কথাও শুনবো না, আগে তোমার পোষাক খুলে শুকনো কাপড়-চোপড় পর। আজ রাতে আর তোমাকে গিমারটনে যেতে হবে না। গাড়ি তৈরীর হুকুম দিয়ে কি হবে বল তো?

ও বললে, আজ যে আমাকে পৌছতেই হবে—হেঁটে যাই আর ঘোড় সওয়ার হয়ে যাই, যেতেই হবে! তবে পোষাক বদলাতে আমার আপত্তি নেই!

ওর হুকুমই মানতে হোল। গাড়ি তৈরি না হওয়া পর্য্যন্ত ও পোষাক বদলালো না। তারপরে ওর ক্ষততে পটি বেঁধে দিলাম, পোষাক ছাড়িয়ে দিলাম। আর একজন দাসী বসে গেল পোষাকের পুঁটুলি করতে।

সব যোগাড়-যন্তর শেষ হতে ও এসে আগুনের কাছে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিল; ওর সুমুখে এনে রাখলাম এক পেয়ালা চা।

ও বললে, তুমি আমার মুখোমুখি বস, ক্যাথির বাচ্চাকে সরিয়ে নাও। ওকে আমি দেখতে চাই না। আমি ক্যাথিকে ভালবাসি না একথা মনেও কোরো না—বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে তো কি কান্নাই কাঁদলাম! ঝগড়া করেই তো আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়। তার জন্যে তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। কিন্তু তাই বলে ঐ পশুটার উপর আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। আগুন খুঁচিয়ে দেবার ঐ শাবলটা দাও তো। আর একটু তাপ বাড়ুক!

এই ওর শেষ চিহ্ন, ও এই বলে ওর তর্জনি থেকে সোনার আঙটিটা খুলে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ছেলেমানুষের মতো আঙটিটার উপর আঘাত

করতে লাগলো। এটাকে আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে ফেলবো, তারপরে আগুনে ফেলে দেব। এই বলে সে আগুনের কুণ্ডের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ও যদি আবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, তখন আর-একটা কিনে দেবে। ও এড্গারকে জ্বালাতে এখান পর্যন্ত আমার খোঁজ করতে পারে তা আমি জানি। তাই তো এখানে থাকব না। তা ছাড়া এড্গারের তো আমার উপর মায়া দয়া নেই! ওকে আর আমি জ্বালাতন করতে চাই না। আমার জিনিসপত্রগুলো এনে দাও, নিয়ে আমি চলে যাই। ঐ আপদটার হাত থেকে আমি রেহাই পেতে চাই। উঃ, আমাকে ধরতে পারলে ও যা করবে! আর্ণ-শ যে ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না। উনি যদি ওকে চুরমার করে দিতে পারতেন, তাহলে কি আর আমি পালিয়ে আসি!

বাধা দিয়ে বললাম, দেখ গো, অতো তাড়াতাড়ি কথা বোলো না। ঐ যে রুমালখানা বেঁধে দিয়েছি, ওখানা খুলে পড়বে। আবার রক্ত ছুটবে! চা খেয়ে একটু জিরিয়ে নাও। আর অতো হেসো না বাপু! এই বাড়িতে হাসি মানায় না! তাছাড়া তোমার এ অবস্থায়ও কি হাসি পায়!

ও বললে, সত্যি বলেছ! যাহোক, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। আরে বাচ্চাটা যে কেঁদে সারা হয়ে গেল গো!

ঘণ্টা বাজালাম, সঙ্গে সঙ্গে একটি দাসী এসে বাচ্চাকে নিয়ে গেল। এবার ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও কেন ওয়াদারিং হাইটস্ থেকে পালিয়ে এল। ও এখন যাবেই বা কোথায়!

ও বললে, আমার তো এখানেই থাকার ইচ্ছে ছিল। এড্গারকে খুশি করা, বাচ্চার দেখাশুনো এই তো আমার কাজ; আর তাছাড়া এই তো আমার বাড়ি। কিন্তু ও তো তা দেবে না। আমরা সুখে শান্তিতে থাকবো, ওকি তা হতে দেবে! তাই দূরে, বহু দূরে চলে যেতে চাই। ওতো আমাকে পেলে খুন করবে, কিন্তু ও যাতে আত্মহত্যা করে তাই আমি চাই। নেলি, ভালবাসা যা ছিল সব তো মরে গেছে, অথচ কত না ওকে ভালবাসতাম!

এখনো যেন মনে হয় আবার ওকে ভালবাসতে পারি······না, না! ও যদি এসে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে তবু তো আর ভালবাসব না! ক্যাথি ওকে কি করে অতো ভালবাসতো? ও তো একটা রাক্ষস! ও মরে যাক, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, আমার স্মৃতি থেকে ওর কথা মুছে যাক্!

বললাম, চুপ, চুপ! একটু সদয় হও! ও মানুষ—ওর চেয়ে ঢের ঢের খারাপ মানুষ আছে!

না মানুষ নয়, ফুঁসে উঠলো ইসাবেলা, আমি ওর উপর সদয় হব না! ওকে আমার মন বিকিয়ে দিয়েছিলাম, ও সেই মন নিয়ে তাকে দলে-পিষে মেরে ফেল্‌লে। তারপর আবার মরা মন ছুড়ে ফেলে দিলে আমাকে। এলেন, মানুষ তো মনেই অনুভব করে। ও তো সেই মনকে ধ্বংস করে দিলে, আর তো অনুভব করার শক্তি আমার নেই। ও যদি ক্যাথির জন্যে কেঁদে কেঁদে মরে যায় তাহলেও তো আমার একটু মায়া হবে না। ইসাবেলা কাঁদতে লাগলো। আবার চোখের জল মুছে বললে, তুমি জিজ্ঞেস করলে না, কেন চলে এলাম? আমি তো বাধ্য হলাম। ও তো খেপে গেছে। ওর এই খ্যাপামি আরো বাড়িয়ে তুলেছি আমি! এতে আমি খুশি। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে হবে, তাই পালিয়ে এলাম।

গত কাল মিঃ আর্ণ-শর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হাজির থাকবার কথা ছিল। তিনি তাই মদ বেশি করে গেলেন নি। যখন ঘুম থেকে উঠলেন, তখন তাঁর মনমরা। তাই আবার গিলতে বসে গেলেন মদ। হিথক্লিফ তো ক'দিন ধরে কেমন যেন হয়ে গেছে। এই তো প্রায় হপ্তাখানেক হোল ও খাবার ছোঁয় না। সারারাত কোথায় থাকে কে জানে, ভোরে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ওর সঙ্গে কে তখন কথা কইবে! ও দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করে—প্রার্থনা তো জোরেই করে। কিন্তু তাতে ভগবানের নাম গন্ধ নেই—ভগবান আর ওর সেই বেদে বাপে একাকার হয়ে যায়। তারপরে আবার বেরিয়ে যায়। সোজা গ্রেঞ্জের দিকে যায় আর আমার কি করে কাটে জান? জোসেফের বক্তৃতা শুনে। আর

খুদে হেয়ারটনও জ্বালায় কম না! বরং হিণ্ডলের সাংঘাতিক সব কথা শুনতে আমি রাজি, তবু ওর কাছে ঘেঁসতে চাই না। আর হিথক্লিফ বাড়ি ঢুকলে তো আমি রান্না ঘরে চলে যাই।

কাল রাতে একখানা বই পড়ছিলাম। বারোটা বেজে গেল। উপরে যেতে ইচ্ছে ছিল না। বাইরে তুষার ঝরছে। যেন হিংস্র হয়ে উঠছে তুষারঝড়। হঠাৎ মনে পড়লো ক্যাথির কথা—কবরখানার কথা। বইয়ের পাতায় আবার মুখ গুঁজে রইলাম। হিণ্ডলে আমার উল্‌টো দিকে বসেছিলেন, হয় তো উনিও ভাবছিলেন ঐ একই কথা। তিনি তো এখন আর মাতাল নন। বাড়ি একেবারে নিঝুম, শুধু বাতাসের গোঙানি উঠছে। জানালাগুলো কেঁপে উঠছে ঘন ঘন, কয়লা পুড়ছে আগুনের কুণ্ডে, চড়চড় শব্দ হচ্ছে; আমি মাঝে মাঝে মোমের পলতেটা উস্‌কে দিচ্ছি। জোসেফ আর হেয়ারটন বোধহয় তখন ঘুমে বিভোর, ভারি খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে যত আনন্দ ছিল, সব উবে গেছে, আর তো ফিরে আস্‌বে না।

খিড়কির দরজার তালাটায় ঝন্‌ঝনানি। মৃতপুরীর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। হিথক্লিফ আজ তাড়াতাড়িই ফিরেছে। হয়তো ঝড়ের জন্যই ফিরতে হয়েছে। বাইরের ফটক বন্ধ বলে ও পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসেছে। রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে উঠে পড়লাম। আমার সঙ্গীটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ওকে আরো মিনিট পাঁচেক বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাই। তোমার আপত্তি নেই তো?

জবাব দিলাম, সারারাত রাখুন না, তাতেও আপত্তি নেই। দরজার তালাটা খুলে খিলটা বন্ধ করে দিন। আর্ন-শ তাই করলেন। এবার চেয়ারখানা নিয়ে এসে আমার পাশে বসলেন।

ওঁর চোখে জ্বলছে ঘৃণার আগুন, আর উনি আমার কাছে চাইলেন সহানুভূতি।

উনি বললেন, আমাদের দুজনেরই ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে! আমরা যদি ভীরু না হই, এস আমরা একত্র হয়ে সেই বোঝাপড়াটা করে নিই।

তুমি কি তোমার ভাইয়ের মতো অমনি নরম? তুমি কি শেষ পর্যন্ত ওর এই অত্যাচার সয়ে যাবে? এর কি প্রতিশোধ নেবে না।

উত্তর দিলাম, আর তো সইতে পারছি না, প্রতিশোধ নিতে পারলে তো ভালই হয়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা আর হিংসা দুটোই হচ্ছে দু-মুখো ফলার বর্শা। শত্রুর চেয়ে নিজেকেই তা বেশি বেঁধে।

বিশ্বাসঘাতকতা আর হিংস্রতা তো পাল্টা জবাব, হিণ্ডলে বলে উঠলেন। শোন, তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি চুপ করে বসে থাক। পারবে তো? ঐ শয়তানটা শেষ হয়ে যাবে দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবে। ওকে নিকেশ করতে না পারলে ওই হবে তোমার আর আমার সর্বনাশের কারণ। দেখ, দেখ, ঐ পাজীটার কাণ্ড দেখ! এমনভাবে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে মনে হয় যেন ও-ই এ বাড়ির মালিক। তুমি আমাকে কথা দাও, তুমি চুপ করে থাকবে—এই তো একটা বাজতে আর তিন মিনিট বাকি আছে। যখন একটা বাজবে—তখন তুমি মুক্ত হবে।

তিনি পকেট থেকে সেই অদ্ভুত হাতিয়ারটা বার করলেন। তার কথা তো তোমাকে চিঠিতে জানিয়েছি, আলোটা নিবিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আমি ওর হাত চেপে ধরলাম।

বললাম, চুপ করে তো আমি থাকব না! আপনি ওকে ছুঁতে পারবেন না! দরজা অমনি বন্ধই থাকুক।

না, না! আমি ঠিক করে ফেলেছি। আর আমি তা করবই। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তুমি না চাইলেও তোমার উপকার আমি করবো! ঐ হেয়ারটনটার পথের বাধা দূর হবে। ক্যাথি আজ নেই। কেউ আমার জন্য দুঃখ করবে না লজ্জিত হবে না—

ভালুকের সঙ্গে কি লড়া যায়—তর্ক-বিতর্ক করা সম্ভব কি পাগলের সঙ্গে? আমার একমাত্র উপায়, জানালার কাছে ছুটে গিয়ে হিথক্লিফকে সতর্ক করে দেওয়া!

ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, তুমি বাড়িতে ঢুকলেই আর্ন-শ তোমাকে গুলী করবেন!

অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়ে উঠলো সে। তুমি দরজাটা খোল—

আবার বললাম, আমি তো বাধা দেব না। বাড়ির ভিতরে এসে গুলী খাও না! আমার কর্তব্য আমি করলাম।

জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। আর্ণ-শ আমাকে গাল পাড়তে লাগলেন! আমি এখনো ঐ শয়তানটাকে ভালবাসি, অথচ ও তো আমাকে ধ্বংস করতেই চায়। আর আমার গোপন মনে তখন কামনা—ও হিথক্লিফকে নিকেশ করে দিক্, আর হিথক্লিফ ওকে সাবাড় করে দিক! এমনি ভাবছি, হঠাৎ জানালার শার্সি খসে পড়লো, আর দেখলাম সেখান দিয়ে মুখ বার করে আছে সেই শয়তান। ভয়ংকর ওর চেহারা, চুল বরফে সাদা হয়ে গেছে দুপাশে, ওর চোখে শ্বাপদের দাহ ঝলসে উঠছে। ও দাঁতে দাঁত ঘসে বললে, ইসাবেলা দরজা খুলে দাও! নইলে—

উত্তর দিলাম, আমি তো আর খুন করতে পারি না! হিণ্ডলে গুলীভরা পিস্তল আর ছোরা নিয়ে তৈরী আছেন।

খিড়কির দরজা খুলে দাও!

হিণ্ডলে তোমার আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হবেন। হিথক্লিফ আমি তোমার জায়গায় হলে এখনি ছুটে গিয়ে ক্যাথির কবরের উপরে শুয়ে তুষার ঝড়ে মরে যেতাম। পৃথিবীতে বেঁচে থেকে আর সুখ কি? তুমি তো আমাকে বলেছ, ক্যাথি তোমার জীবনের একমাত্র আনন্দ! কি করে ওকে হারিয়ে তুমি বেঁচে আছ! আমার সঙ্গীটি ছুটে এসে বললেন, ও ওখানে নাকি!

এলেন, তুমি আমাকে ভণ্ড ভাবছ, কিন্তু তুমি তো সব কথা জান না, তাই বিচার করতেও বোসো না! ওর কেউ প্রাণ নেবে এ আমার সয় না। তবু মনে মনে ওর মৃত্যু কামনা করি! তাই খুবই হতাশ হলাম। আর ভয়ও পেলাম। যখন দেখলাম ঐ জানালা দিয়ে ও ঝাঁপিয়ে পড়লো আর্ণ-শর উপর, তারপরে হাতিয়ার কেড়ে নিতে গেল।

গুলী ছুটলো, আর ছোরাখানা এসে বিঁধলো ছুরির মালিকেরই কব্জিতে। মাংসের ভিতর থেকে টেনে বার করে সেখানা নিজের পকেটে রেখে

দিলে হিথক্লিফ। ও এবার শত্রুর উপর ঝুঁকে পড়লো। শত্রু অচেতন হয়ে পড়ে আছে, ধমনী কেটে রক্ত বেরুচ্ছে। ঐ শয়তানটা ওঁকে দলে-পিষে দিলে, আগুনের কুণ্ডটার উপরে বার বার ওর মাথাটা নিয়ে গিয়ে ঠুকলে। আমি যাতে জোসেফকে না ডেকে আনতে পারি আমাকেও তাই ও জড়িয়ে ধরে রইল এক হাত দিয়ে। এবার ও সেই অচেতন দেহটাকে টেনে নিয়ে এল ; তারপরে ক্ষতস্থানে বেঁধে দিল পটি। আমি ছাড়া পেলাম। জোসেফকে খুঁজে বার করে এক নিশ্বাসে সব কথা বলে গেলাম। ও তাড়াতাড়ি ছুটে এল।

কি হবে গো এখন, কি হবে গো ? ও চীৎকার করে উঠলো। হিথক্লিফ গর্জে উঠে বললে, কি আবার হবে—তোমার মনিব পাগল হয়ে গেছেন, ওঁকে আমি পাগলা গারদে দিয়ে আসব। এই—ওখানে অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় কোরো না ! এদিকে এস, আমি আর ওর সেবা করতে পারব না ! এই ক্ষত জায়গাটা ধুয়ে ফেল—

ও বলে উঠলো, তুমি ওকে খুন করলে গো ! ভগবান তো……

হিথক্লিফ ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে ঐ রক্তের ভিতরে। একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিলে ওর দিকে। কিন্তু ও রক্ত পরিষ্কার না করেই প্রার্থনা করতে বসে গেল।

হিথক্লিফ বলে উঠলো, ভুলেই গিছলাম ; তুমি এমনিই করবে। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, আমার বিরুদ্ধে তুমি ষড়যন্ত্র করেছ ! এই তো তোমার মতো মানুষের উপযুক্ত কাজ !

আমাকে ধরে ও ঝাঁকুনি দিয়ে জোসেফের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর আমার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনতে চাইলে। আমি অনিচ্ছাসত্ত্বে বলে গেলাম। আর্ণ-শ মরে যাননি। খানিকটা মদ তার মুখে ঢেলে দিতেই তিনি চেতনা ফিরে পেলেন। অচেতন অবস্থায় সে আর্ণ-শর সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে না করেছে, সে সম্বন্ধে তিনি জানেন না বলেই, তাঁকে সে জানালে, তিনি মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। এখন শুতে যাওয়াই উচিত। এই বলে সে চলে গেল। হিণ্ডলে পড়ে রইলেন সেখানে। আমি ঘরে চলে এলাম।

আজ দুপুরে নীচে নেমে দেখলাম, আর্ণশ আগুনের ধারে বসে আছেন। খুবই অসুস্থ। আর ওঁর জীবনের ঐ মূর্তিমান আপদটা বসে আছে আর এক পাশে। টেবিলে খাবার জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল, ওরা কেউ ছুঁলে না। আমি একাই খেলাম। আমার নীরব সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে খুশি হলাম। ওদের মন তো উত্তাল, কিন্তু আমার বিবেক তো শান্ত। খাওয়া সেরে আগুনের ধারে গিয়ে বসলাম।

হিথক্লিফ তাকিয়েও দেখলে না। ও যেন পাথুরে মূর্ত্তি। ওর ললাট দেখে একদিন তো ভেবেছিলাম কি পৌরুষ সেখানে বিকশিত, আজ তো দেখলাম সেখানে মেঘ জমেছে, ওর চোখ অনিদ্রায় একেবারে স্তিমিত, ঠোঁটে নেই সেই বিদ্রূপ—স্তব্ধ হিথক্লিফ। অন্য কেউ হলে সমবেদনায় মন গলে যেত। কিন্তু ওর এই অবস্থায় খুশিই হলাম। পরাজিত শত্রুকে অপমান করা যতই খারাপ হোক, ওকে একটু বিদ্রূপই করলাম। পাল্‌টা ঘা দিয়েই তো আমার আনন্দ। ও ভ্রূক্ষেপও করলো না···হিণ্ডলে এবার এক গেলাস জল চাইলেন, ওঁকে জল দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন।

বললেন, যতখানি অসুস্থ হতে চাই ততখানি হইনি। হাতের কথা বাদই দিলাম, সর্বাঙ্গেই ব্যথা। মনে হয় হাজারটা শয়তানের সঙ্গে লড়ে এই দশা হয়েছে।

বললাম, তাতে আর আশ্চর্য কি! ক্যাথি বলতো আপনার শারীরিক ক্ষতি কখনো হবে না—কেন না ও আছে মাঝখানে। তবু এটা ভাল কথা যে, মরা মানুষ কবর থেকে উঠে আসে না। কাল ও উঠে এলে এক বিশ্রী কাণ্ডই দেখতো। আপনার বুকে আর কাঁধে কি আঘাত লাগে নি?

তিনি উত্তর দিলেন, তুমি কি বলছো? আমি যখন অজ্ঞান হয়ে যাই, ও কি আমাকে তখন আঘাত করেছে?

আপনাকে লাথি মারতে কি ও কসুর করেছে! ও তো আপনাকে তখন ছিঁড়ে খায় এমনি অবস্থা। ও তো আধখানা মানুষ, বাকিটা তো সবই শয়তানি ভরা।

আমাদের শত্রুর দিকে চোখ তুলে তাকালেন আর্ন-শ, সে যেন পরিবেশ সম্বন্ধে হতচেতন। ওঃ, ওকে যদি গলা টিপে শেষ করে দিতে পারতাম! তাহলে তো নরকে গিয়েও আনন্দ পেত! উঠতে গিয়ে আবার ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলেন আর্ন-শ।

না, না, বললাম, আপনাদের একজনকে তো ও শেষ করে দিয়েছে। গ্রেঞ্জসুদ্ধু লোক তা জানে।

হিথক্লিফ বুঝি আমার কথা শুনতে পেলে। ওর চোখে জল, বুক ঠেলে বেরিয়ে এল দীর্ঘনিশ্বাস। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। নরকের আগুন যেন ঝলসে উঠলো চোখে, কিন্তু শয়তান যে নিস্তেজ।

ও গর্জে উঠলো, যাও, এখান থেকে ভাগো!

ওকে বললাম, ক্যাথিকে আমি ভালবাসতাম, তাই ওর ভাইয়ের সেবা করা আমার কর্তব্য। ও তো মারা গেছে, কিন্তু ও বেঁচে রয়েছে ওর ভাইয়ের মধ্যে। তুমি কি লক্ষ্য কর নি হিথক্লিফ, হিণ্ডলে আর ওর চোখদুটি অবিকল এক। যদি না দেখে থাক,—

ও চীৎকার করে উঠলো, দূর হয়ে যা নইলে আমি তোকে খুন করে ফেলবো!

পালাবার জন্যে তৈরী তখন আমি। তবু বলে উঠলাম, ক্যাথি যদি তোমার স্ত্রী হোত, ওর-ও তো এই দশা করতে! ও তো আর এমনি মুখ বুজে সয়ে যেত না! ও নিশ্চয়ই বিরক্তিতে ফুঁসে উঠতো।

ও ছুটে না এসে টেবিল থেকে একখানা ছুরি তুলে নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে মারলো। আমার কানে এসে তা বিঁধলো। তাড়াতড়ি টেনে বার করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর একখানা এরই মধ্যে শাঁই করে এসে পড়েছে। ও এবার তেড়ে আসছিল, এর মধ্যে গৃহস্বামী ওকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনে মেঝের পড়ে ধস্তাধস্তি শুরু করলে। রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে আসতে-আসতে জোসেফকে বললাম, সে যেন এখুনি ছুটে যায়। তারপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কোনরকমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। আরক

থেকে যেন মুক্তি পেল আত্মা। তারপরে একেবারে তো জলা পেরিয়ে এখানে এসে হাজির।

ইসাবেলা চুপ করে গেল, চা খাচ্ছে। এবার সে উঠে পড়ে যাবার জন্যে তৈরী হোল। এডগার আর ক্যাথির ছবিতে চুমু খেয়ে আমাকে চুমু দিয়ে গিয়ে উঠলো গাড়িতে। ও চলে গেল। আর কখনো এ অঞ্চলে ফিরে আসে নি। কিন্তু মনিবের সঙ্গে ওর চিঠিপত্র চলতে লাগলো। ওর চলে যাবার কয়েক মাস পরে একটি ছেলে হোল। তার নামকরণ হোল লিণ্টন।

হিথক্লিফের সঙ্গে একদিন গ্রামে দেখা হয়ে ছিল, সে আমাকে ওর কথা জিজ্ঞেস করলে। বলতে রাজি হলাম না। ও কি করে যেন ওর ঠিকানা বার করে ফেললে, কিন্তু তবু ওকে আর বিরক্ত করলে না। তবে আমার সঙ্গে দেখা হলেই ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতো। ছেলের নাম শুনে হেসে বললে, ও যাতে আমাকে ঘৃণা করে তাই ওরা চায়, তাই না?

উত্তর দিলাম, ওরা তোমার কথা ওকে জানাতেই চায় না।

ও জানালে, আমি ঠিক জানিয়ে দেব। ওদের এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করে দিতে পার।

কিন্তু সে সময় আসার আগেই ওর মা মারা গিয়েছিল। ক্যাথির মৃত্যুর সে তো তেরো বছর পরের কথা। খুদে লিণ্টনের বয়স তখন বারো কি তেরোর কিছু বেশী।

ইসাবেলার এই অপ্রত্যাশিত আগমনের পরে মনিবের সঙ্গে কথা বলার আর সুবিধে পেলাম না। ওঁকে যখন জানালাম, উনি শুনে খুশিই হলেন। তিনি আজকাল যেন সন্ন্যাসীর জীবন কাটাচ্ছেন। হাকিমি পদ ছেড়ে দিয়েছেন, গীর্জায়ও যান না। মাঝে মাঝে জলার ধারে বেড়াতে বেরোন। তিনি ক্যাথির স্মৃতি মন্থন করেই কাটান প্রহর। আবার স্নেহও উৎসারিত হয়ে পড়ছে। প্রথমে বাচ্চাকে দেখেও দেখতেন না, কিন্তু এপ্রিলের তুষারের মতো ওঁর হৃদয়ের এই শীতলতা গলে গলে গেল। বাচ্চা যখন কথা বলতে শিখলে, হামাগুড়ি দিতে শুরু করলে, ও তো তাঁর মন কেড়ে নিলে।

ওর নামও হোল ক্যাথেরিন, কিন্তু পুরো নাম কখনো বলতেন না। হিথক্লিফ ক্যাথেরিন বলে ডাকতো বলেই ও নাম তিনি এড়িয়ে যেতেন। ক্যাথি বলেই ডাকতেন। এতে মার সঙ্গে ওর প্রভেদ বোঝাত, আবার সংযোগও বোঝাত।

এদিকে মাস কেটে যেতে লাগলো। একদিন আর্ন-শ মারা গেলেন। আমরা গ্রেঞ্জে বসে কোনো খবরই পেলাম না। শুধু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় খবর এল। কেনেথ ডাক্তার মনিবকে খবর দিলেন, বললেন, কে মারা গেছে জানেন?

কে?

হিণ্ডলে আর্ন-শ, মদ খেয়ে খেয়ে বেঘোরে মরলো! তিনি আরো বললেন, খুদে হেয়ারটন সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। তার বাবা বহু দেনা করে রেখে গেছেন। বিষয়-সম্পত্তি তো হিথক্লিফের কাছে বাধা।

ওঁর কথা শুনলাম। এবার চললাম হাইটস্-এ। আমাকে দেখে জোসেফ খুশি হোল। কিন্তু হিথক্লিফ বললে, আমার দরকার ছিল না, তবে এসেছি যখন যোগাড়-যন্তরে একটু সাহায্য করতে পারি।

ও বললে, ঐ লোকটাকে আবার জাঁকজমক করে কে কবর দেবে! ওকে দু দণ্ডের জন্য ছেড়ে চলে গেছি, এর মধ্যে ও ঘরের দরজা বন্ধ করে মদ খেয়ে নিজের মরণ ডেকে আন্‌লে। সকালবেলা দরজা ভেঙে ঢুকে দেখি, ও শুয়ে পড়ে আছে। কেনেথ ডাক্তারকে খবর দিলাম। তখন তো ও মরে শিটিয়ে গেছে।

বুড়ো জোসেফও ওর কথায়ই সায় দিলে।

আমি পেড়াপীড়ি করতে লাগলাম, পয়সা খরচ করেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। হিথক্লিফ জানালে আমার যেমন খুশি। তবে এইটুকু স্মরণ রাখতে হবে যে, টাকা যাবে তার পকেট থেকে। ওকে দেখে দুঃখ বা আনন্দের কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। তবু ও যেন তৃপ্ত। শবাধারটা যখন বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছিল, ও যেন খুশিই হোল। ও এত বড় ভণ্ড যে ও শোক যাত্রায়ও চললো। ও হেয়ারটনকে বললে, এবার তুমি আমার হলে।

আমরা দেখতে চাই একটা গাছ আর একটার মতোই বেঁকেচুরে বড় হয়ে উঠতে পারে কি না! বোকা হেয়ারটন খুশি হয়ে উঠলো কথাটা শুনে। ও তো মানে বুঝতে পারে না। আমি বুঝতে পেরে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলাম, ঐ ছেলে আমার সঙ্গে থ্রাসক্রস গ্রেঞ্জে যাবে। ও কেন তোমার হতে যাবে?

লিণ্টন কি সেকথা বলেছে? ও দাবি জানালে।

নিশ্চয়ই—উনি আমাকে সেই মতোই হুকুম দিয়েছেন।

বেশ, বেশ, পাজিটা বললে, এখন ও নিয়ে তর্ক করতে চাই না, কিন্তু শিশু পালনে আমার হাত দুরস্ত করে নিতে হবে। আমি খুদে হেয়ারটনকে ঝগড়া না করে এমনি এমনি ছেড়ে দেব না। আর সেই বাচ্চাটাকেও যেখান থেকে পারি নিয়ে আসবো! তোমার মনিবকে একথা বোলো।

ফিরে এসে একথা মনিবকে জানালাম। মনিব এড্‌গার, লিণ্টন প্রথমে একটু বা কৌতূহলী হয়েছিলেন, কিন্তু পরে আর কোনো কথা বললেন না। উনি ঐ বাচ্চাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না।

এখন অতিথি হোল ওয়াদারিং হাইটস্‌-এর প্রভু। সে য়্যাটর্নির কাছে প্রমাণ দিয়ে দেখাল যে আর্ণ-শ তার জমি জমার প্রতিটি অংশ তার কাছে বাঁধা রেখেছে। জুয়োখেলার নেশা এমনি করেই সে মিটিয়েছে। হেয়ারটন কোথায় এ অঞ্চলের কর্তা হোত, সে হোল কিনা তার বাবার চির শত্রুর দাস। নিজের বাড়িতে সে দাস হয়েই রইল। বিনা মাইনের দাস। নিজের প্রভুত্ব সে খাটাতে পারত না। আর তার অজ্ঞানতার সুযোগে তার উপর অবাধে অবিচার চলতে লাগলো।

আঠারো

মিসেস ডীন বলতে লাগলো, বারো বছর কেটে গেল। ক্যাথি নিয়ে এল এই ছন্ন ছাড়া সংসারে আবার রোদের ঝলক। সুন্দরী মেয়ে—আর্ণ-শ বংশের সুন্দর কালো চোখ সে পেয়েছে আর পেয়েছে লিণ্টন বংশের সুন্দর রং আর

হলদে কোঁকড়ানো চুল। ও ভালবাসতে জানে, আর ওর এই নিবিড় ভালবাসা দেখে ওর মার কথা মনে হয়, কিন্তু ওর মতো তো নয় ক্যাথি। ও ঘুঘুর মতো নম্র হতে জানে, স্বরও ওর মৃদু—কেমন যেন বিষাদিত ভাব; ও কখনো তেমন রেগে ওঠে না; ভালবাসাও ওর উগ্র নয়; গভীর, কোমল সে ভালবাসা। কিন্তু দোষও ছিল। ও ছিল একগুঁয়ে। ওর বাবা তো ওকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি ওর শিক্ষার ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন।

এমনি করে তেরো বছরে ও পা দিলে। পার্কের সীমার বাইরে ও কখনো যায় নি। মিঃ লিণ্টন ওকে মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। নিজে ছাড়া আর কারো উপরে সে ভার দিতেন না। ও ওয়াদারিং হাইটস্-এর নাম তখন শোনে নি, হিথক্লিফেরও ওর কাছে কোনো অস্তিত্ব ছিল না; ও ছিল সুখী, খুশি। নিজের ঘরের জানালা থেকে ও মাঝে মাঝে মন্তব্য করত,

এলেন, ঐ পাহাড়ে কতক্ষণে যেতে পারব বল তো? ওর ওপাশে কি আছে—সমুদ্র নাকি? বলতাম, না গো না, ওর ও পাশেও এমনি পাহাড়।

ঐ সোনালী পাহাড়ের কাছে গেলেও অমনি সোনালী থাকবে তো? আবার একদিন ও জিজ্ঞেস করলে।

সূর্যাস্তের সোনালী মায়া তখন এসে পড়েছে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, সমস্ত পটভূমি ছায়াময়। ওকে বললাম, ওখানে কিছুই নেই। সূর্যাস্তের সোনায় অমনি সোনালী ওর রং।

কিন্তু এখানে তো কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তবু ওখানে অমনি কেন?

এমনি নানা প্রশ্ন। কখনো বা ধরে বসতো সে যাবে পার্ক পেরিয়ে বহু দূরে চলে।

মিঃ লিণ্টনকেও সেকথা বলতো। কে-এক দাসী পরীর গুহার কথা তাকে বলে ছিল। তারপরে তো রোজই আবদার ধরে বসতো—সে যাবে সেই গুহায়। মিঃ লিণ্টন তাকে বুঝিয়েছিলেন, সে বড় হলে সেখানে যাবে।

একমাস গেলেই ক্যাথি বলতো—এখন তো আমি যেতে পারব। আমি তো বড় হয়েছি।

কিন্তু যাওয়া আর হোত না। পরীর গুহায় যাবার পথ ঘেঁষে গেছে ওয়াদারিং হাইটস্-এর পাশ দিয়ে। এড্গারের যেতে মন চাইত না। তাই ও রোজই শুনতো, এখনো তো তোমার বয়স হয় নি বাছা।

এর মধ্যে ইসাবেলা একদিন চিঠি লিখলে, সে ঘুষঘুষে জ্বরে ভুগছে, ও ভাইয়ের কাছে বিদায় নিতে আর খুদে লিণ্টনকে তাঁর হাতে দিয়ে যেতে চায়। মনিব তো তখুনি চললেন বোনের সঙ্গে দেখা করতে।

তিন সপ্তাহ মনিব ফিরলেন না। ক্যাথি লাইব্রেরী ঘরে বসেই তিন-চারদিন কাটিয়ে দিল। বড় মনমরা হয়ে পড়েছে—তাই ওকে মাঝে মাঝে হেঁটে বা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে বাইরে পাঠাতে লাগলাম।

বসন্ত তখন এসে গেছে। ও ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এমনও হোত, সকালে চা খেতেও ফিরতো না। তারপর ফিরে এসে বানিয়ে বলতো রাজ্যের গল্প। ও যে চৌহদ্দি পেরিয়ে যাবে না সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম। পার্কের গেট থাকতো প্রায়ই তালা বন্ধ—তাছাড়া একা বেরিয়ে যাবার সাহসও ওর ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমার এ ধারণা ভুল বলেই প্রমাণিত হোল। একদিন সেই যে ভোরে বেরিয়ে গেল, চা খাবার সময়েও এল না। ওর কুকুরটা ফিরে এল—কিন্তু ক্যাথি বা তার টাট্টুর খোঁজ নেই, আর নেই দুটো শিকারী কুকুরের। লোক পাঠালাম, তারপরেই নিজেই বেরুলাম খুঁজতে। পার্কের পাশে বাগানে এক মজুর কাজ করছিল, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ও বললে, ভোরে দেখেছি। ও তো ঐ ঝোপ পেরিয়ে কোথায় চলে গেল গো—আর দেখলামই না।

খবরটা শুনে কি হোল ভাবতেই পারেন। মনে হোল ও সেই পরীর গুহার দিকে গেছে। আমি ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে হাইটস্ এসে গেল। কিন্তু ক্যাথির পাত্তা নেই। কত ভয় হোল, কি জানি

পাথরে পা পিছলে কিছু যদি একটা হয়েই থাকে। আমার বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি ওর সঙ্গের একটা কুকুর জানালার ধারে পড়ে আছে। মাথা ফুলে উঠেছে, কানে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। আমি ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারলাম। আর্ন-শ মারা যাবার পর একটি মেয়েলোক রাখা হয়েছিল। সে এসে দরজা খুলে দিলে।

ও বললে, খুদে মনিবকে বুঝি খুঁজতে এলে। তা ওতো এখানে ভালই আছে। মনিব যে বাড়ি নেই এও ভাগ্যি!

কর্তা তাহলে বাড়ি নেই।

না, জোসেফ আর উনি দুজনেই বাইরে গেছেন। আর এক ঘণ্টার ভিতরেও ফিরবে কি না সন্দেহ, ভিতরে এসে একটু জিরিয়ে নাও।

ভিতরে এসে দেখি, ক্যাথি একটা চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। এ ওর মার চেয়ার।

ওকে দেখে রাগের ভান করে বললাম, কেমন ধারা মেয়ে গো তুমি? বাবা আসার আগে আর তোমাকে বেরুতে দেব না! দুষ্টু মেয়ে!

ও তো আমার কাছে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছুটে এসে বললে, এলেন, আজ তোমাকে কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলবো। তাহলে আমাকে খুঁজে পেলে! আচ্ছা, তুমি কি কখনো এখানে এসেছ?

বললাম, এখন টুপী পরে বাড়ি চল! কর্তা আমার উপর তোমার ভার দিয়ে গেছেন—আর তুমি কিনা পালিয়ে চলে এলে! তোমার উপর আর আমার বিশ্বাস নেই।

ও তো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে, আমি কি দোষ করেছি? বাবা তো আমাকে কিছু বলেন না, গাল দেন না। এলেন, উনি তো তোমার মতো নন্!

বললাম, চল, চল! মেলা বক্ বক্ করে না! তোমার তেরো বছর বয়েস হোল, এখনো কিনা এমনি দুষ্টুমি!

ক্যাথি চটে গিয়ে দূরে সরে গেল।

দাসীটি বললে, তুমি ওর উপর রাগ করছো কেন গা? ওর তো কোনো দোষ নেই। আমরাই ওকে নামতে বলি। ও তো নামতেই চায় না, ঐ পাহাড়ে যাবে। শেষে হেয়ারটন ওর সঙ্গে যেতে চাইলে। যা পথ, ওকে যেতেই বললাম। হেয়ারটন পকেটে হাত ডুবিয়ে আমাদের কথা শুনছিল। নীরব সে, কিন্তু মনে হোল, আমার হঠাৎ গাল দেওয়াটা ওর পছন্দ হয় নি।

…মেয়েটি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও বললাম, কতক্ষণ আর বসে থাকবো? এদিকে যে আর দশ মিনিটের ভিতরে আঁধার হয়ে যাবে। ক্যাথি টাট্টুটা কোথায়? জলদি কর, আর-একটা কুকুরই বা কোথায় গেল!

ও উত্তর দিলে, ঘোড়াটা উঠানে বাঁধা আছে। আর কুকুরটাকে রাখা হয়েছে বন্ধ করে। চার্লি ওকে কামড়েছে কিনা। তোমাকে পরে সেসব কথা বলবো কিন্তু এখন তো তুমি চটে আছ, ভাল করে শুনবেও না।

ওর টুপীটা তুলে নিয়ে ওকে পরিয়ে দিতে গেলাম। এদিকে ও ঘরময় ছুটোছুটি করে আমাকে এড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। আর আমিও ওকে ধরতে ধাওয়া করলাম ইঁদুরের মতো ও আসবাব-পত্রের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। হেয়ারটন আর ঐ মেয়েটি হেসে উঠলো। শেষে বিরক্ত হয়ে বললাম,

দেখ ক্যাথি, কার বাড়ি শুনলে এখুনি তুমি বেরিয়ে আসতে পথ পাবে না।

হেয়ারটনকে সে শুধালো, এটা তোমার বাবার বাড়ি, না গো?

না, ও মুখ নীচু করে উত্তর দিলে।

কার—তোমার মনিবের? ও জিজ্ঞেস করলে।

আরক্ত হয়ে উঠলো হেয়ারটন।

আমার কাছে এবার এসে জিজ্ঞেস করলে, কার বাড়ি গা? ও যেমন করে আমাদের বাড়ি, আমাদের লোকজন বললে, আমার তো মনে হয়েছিল ও এই বাড়ির মালিক। ও তাহলে চাকর! আমাকে আপনি বলে নি কেন?

হেয়ারটন বাজের মতো কালো হয়ে উঠলো।

মেয়েটা ওর আপনার জনকে চাকর ভেবে এবার হুকুম দিলে, যাও আমার ঘোড়াটা নিয়ে এস! আর আমার সঙ্গে পরীর গুহায় চল! কি, তোমার মুখে রা নেই যে! আমার ঘোড়াটা নিয়ে এস!

তোমার চাকর হবার আগে আমি যেন মরে যাই! ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠলো।

কি—কি বললে? ক্যাথি অবাক হয়ে বললে।

চুপ রও ডাইনী! আবার গর্জে উঠলো হেয়ারটন।

ওদের তর্কবিতর্কে বাধা দিয়ে বললাম, দেখলে তো ওরা কেমন মানুষ। এবার চল সরে পড়ি।

কিন্তু ক্যাথি তো ক্রোধে অধীর। সে বললে, এলেন, ও অমন করে আমার সঙ্গে কথা বলবে কেন? আমি যা হুকুম করলাম ও তা মানবে না না কেন?

ও আবার বললে, যাও, ঘোড়াটা নিয়ে এস। আমার কুকুরটাকে এখুনি ছেড়ে দাও!

দাসীটি বললে, আপনি একটু নরম করেই কথা বল না গো। ও তো তোমারই মামাতো ভাই!

ও আমার মামাতো ভাই? ক্যাথির মুখে বিদ্রূপের হাসি।

হাঁ গো, হাঁ।

এলেন, ওরা কি বলছে দেখতো। আমার ভাইকে তো বাবা লণ্ডন থেকে নিয়ে আসবেন। আমার ভাই তো ভদ্রলোক। আর ওটা তো—

ফিসফিস করে বলে উঠলাম, চুপ, চুপ! মানুষের কত ভাই থাকে। তবে সবার সঙ্গে তো আর মেশা যায় না।

না, না, এলেন, ও আমার ভাই নয়।

দাসীটি ক্যাথিকে ও কথা বলায় আমি বিরক্তই হলাম। আবার ক্যাথিও মুখে লিণ্টনের আসার কথা জানিয়ে দিলে। ক্যাথি তো বাবা ফিরে এলেই

তাঁর কাছে সব কথা জানতে চাইবে। এদিকে হেয়ারটন লজ্জিত হয়ে ক্যাথির হুকুম তামিল করলে, ঘোড়া আর একটা নতুন কুকুর এনে দিলে। কিন্তু ক্যাথি তখনও রাগে গজগজ করছে। তার নিজের কুকুর দুটো চাই। ওরা তো খানিকক্ষণ পরেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল। ব্যাপারটা শুনলাম। আমাদের খুদে মহিলাটি যখন ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন, হেয়ারটনের কুকুরগুলো তাঁর ঐ কুকুর দুটোকে আক্রমণ করে! ওদের ছাড়িয়ে দেবার আগেই ওদের এই অবস্থা দাঁড়ায়। হেয়ারটন আর ক্যাথির সঙ্গে এমনি করেই পরিচয় গড়ে ওঠে। ক্যাথিকে হেয়ারটন বলে পরীর গুহায় সে তাকে নিয়ে যাবে। তারপরে তো গলায় গলায় ভাব। এখন নিজের ভাই শুনে ও তো কিছু বুঝতে পারছে না। যাহোক, ক্যাথিকে নিয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

উনিশ

কালো দাগ টানা একখানা চিঠি এল। তাতে জানা গেল মনিব কবে ফিরবেন। আর এল সেই সঙ্গে ইসাবেলার মৃত্যু সংবাদ। তিনি লিখলেন, আমি যেন ক্যাথিকে শোকের পোষাক পরিয়ে দিই—আর তাঁর ভাগ্নের জন্য যেন একখানা ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি। ক্যাথি তো বাবা আসবে শুনে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো। তাঁদের আসার দিন ঘনিয়ে এল। সকাল থেকেই ক্যাথি হুকুমে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। তারপরে কালো পোষাক পরে ও আমাকে এসে ধরে বসলো, ওঁদের নিয়ে আসতে যেতে হবে।

ও চলতে চলতে খালি বক্ বক্ করছিল। লিন্টন তো আমার চেয়ে ছ' মাসের ছোট, তাই না? কি মজা! ও হবে আমার খেলার সঙ্গী। ইসাবেলা পিসীমা তো বাবাকে একগোছা চমৎকার চুল পাঠিয়ে ছিলেন, আমার চেয়েও সুন্দর চুল! আমি একটা কাচের কৌটোয় রেখে দিয়েছি। আহা, ওঁকে যদি দেখতে পেতাম! এলেন, চল, ছুটে যাই।

ও খানিকটা ছুটে গেল। আমি ধীরে ধীরেই চলছিলাম। ও এবার পথের পাশে ঘাসের জমির উপর বসে পড়লো। কিন্তু সুস্থির কি থাকতে পারে মেয়ে! অমনি আবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়লো। এসে বললে, উঃ, আর কত দেরী হবে গো! ঐ তো পথে ধুলো উড়ছে—ওরা এল বলে! না তো! কখন আসবে? আর একটু চল না—এই আর আধ মাইল! এলেন, চল, চল! একবার হাঁ বল—ঐ যে বার্চের বন, হোথায় চল না!

রাজি হলাম না। অবশেষে ওর কৌতূহল আর প্রতীক্ষার অবসান হোল। গাড়ি দেখা গেল। ওর বাবা জানালা দিয়ে মুখ বার করে ছিলেন। তাঁকে দেখেই ও খুদে দুখানি হাত বাড়িয়ে দিলে। গাড়ি এসে থামলো। তিনি এসে নামলেন। ওরই মতো অধীর, আকুল তিনি। মেয়েকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন। ওঁরা যখন আদর সোহাগে মত্ত, আমি গাড়ির ভিতর উঁকি মেরে দেখলাম। এক কোণে ঘুমিয়ে আছে খুদে লিণ্টন। বিবর্ণ রোগা ছেলে, কেমন যেন মেয়েলী—আমাদের মনিবের খুদে ভাই বলে মনে হয়—এমনি তাঁদের চেহারার মিল। কিন্তু কেমন এক অসুস্থতা আছে—যা এডগার লিণ্টনের ভিতরে কখনো দেখিনি। মনিব ওকে বিরক্ত করতে নিষেধ করলেন। বড় ধকল গেছে নাকি ওর উপর। ক্যাথিও একবার উঁকি মারতে পেলে খুশি হোত, কিন্তু বাপ মেয়েকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

মিঃ লিণ্টন তাঁর মেয়েকে ডেকে বললেন, তোমার এই ভাইটির কিন্তু তোমার মতো অতো জোর নেই। তাছাড়া ওর মাও সবে মারা গেছে। তোমার মতো ও দৌড়-ধাপ করে বেড়াতে পারবে না। বকবক্ করেও ওকে বিরক্ত কোরো না; আজকের রাতটা অন্তত ওকে জালিও না!

ক্যাথি বললে, বাবা, তাই হবে। কিন্তু ওকে কি একটিবার দেখতেও পাব না! ও কি রকম ছেলে, একটিবার মুখও বার করলে না।

এইবার ছেলেটির ঘুম ভাঙানো হোল, তাকে তার বাবা গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলেন।

লিণ্টন, এই তোমার বোন ক্যাথি। এ এরই মধ্যে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে। আর কাঁদাকাটি করবে না। লক্ষ্মী ছেলেটি হয়ে থাকবে।

ক্যাথি ওর হাত ধরতেই ও কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। বলে উঠলো, আমি এখন শুতে যাব। চোখের জল মুছে।

ওকে নিয়ে যেতে যেতে বললাম, ওগো বাছা, অমন করে কেঁদো না! ওতে ঐ একরত্তি মেয়েটাও যে কেঁদে সারা হয়ে যাবে। দেখলে না তোমার জন্যে ওর কত দুঃখ!

আমরা এবার এসে ঢুকলাম লাইব্রেরী ঘরে। এখানেই চা দেওয়া হয়েছে। আমি লিণ্টনের টুপী আর জামা খুলে নিয়ে ওকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। কিন্তু বসেই আবার কান্না জুড়ে দিলে। মনিব জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে।

ছেলেটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, আমি তো চেয়ারে বসতে পারিনে।

তাহলে সোফায় গিয়ে বোস। এলেন ওখানেই তোমাকে চা দিয়ে আসবে। লিণ্টন গিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিলে। এদিকে আমি কিছু করবার আগেই ক্যাথি একটা টিপয় টেনে নিয়ে গিয়ে চায়ের পেয়ালাটি তার উপর রাখলে। প্রথমে ও চুপচাপ বসে রইল। তারপরে ওকে চুমু খেতে লাগলো। ছেলেটা খুশি হোল তার মুখে ফুটে উঠলো হাসি।

ওদের দিকে তাকিয়ে মনিব বললেন, ও এখানে বেশ থাকবে! কিন্তু এখানে ওকে রাখতে পারলে হয়। ক্যাথি ওর সমবয়েসী। ওর সঙ্গ পেয়ে ও হয়তো চাঙ্গা হয়েই উঠবে।

আমিও ভাবছিলাম, এখন ওকে রাখতে পারলে হয়। আমি তো সে-আশা করি না। কিন্তু ও কি ঐ ওয়াদারিং হাইটস্-এ গিয়েই টিকতে পারবে? সেখানে তো ওর বাবা আর হেয়ারটন আছে! তারা হবে ওর খেলার সঙ্গী আর উপদেষ্টা গুরু! আমাদের এই ভাবনার শীঘ্রই নিরসন হোল। একজন

পরিচারিকা এসে জানাল, মিঃ হিথক্লিফের খানসামা জোসেফ মনিবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠলো, পরিচারিকাকে বললাম, আমি যাই, গিয়ে জিজ্ঞেস করি ও কেন এসেছে! এত রাতে কেউ কাউকে বিরক্ত করে! আবার আপনি তো সবে বহুদূর থেকে এলেন!

কিন্তু এরই মধ্যে জোসেফ এসে হলঘরে হাজির। আমি ওকে দেখেই বলে উঠলাম, তুমি আবার কি খবর নিয়ে এলে?

আমাকে যেন এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়েই বলে উঠলো, আমি মিঃ লিণ্টনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

তিনি এখন শুতে গেছেন। যদি বিশেষ কোনো দরকার না থাকে, তিনি এখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। তার চেয়ে তুমি বল, তোমার কি দরকার?

কিন্তু জোসেফ নাছোড়বান্দা। আশপাশের দরজাবন্ধ ঘরগুলির দিকে তাকিয়ে বললে, ওঁর কামরাটা কোথায়?

কি আর করবো, ও আমার মধ্যস্থতায় কাজ করতে রাজি নয়—তাই লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে খবর দিলাম। তাঁকে একথাও বললাম, ওকে বিদায় দিতে হুকুম করুন। কিন্তু মিঃ লিণ্টন সে সময় পেলেন না। আমার পিছনে পিছনে কখন এসে সে দাঁড়িয়েছে টেরও পাইনি। সে ঘরে ঢুকে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বললে, হিথক্লিফ ওর বাচ্চাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছে। আমি না-নিয়ে যাব না।

এড্‌গার লিণ্টন এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। উপায় নেই। দাবি জানিয়েছে দাবিদার, প্রত্যাখ্যান করলে সে দাবি আরো জোরালো হয়েই উঠবে। রাজি হতেই হবে। কিন্তু লিণ্টনকে ঘুম থেকে তিনি তুলতে চাইলেন না।

শান্ত স্বরেই বললেন, মিঃ হিথক্লিফকে বোলো, কাল তাঁর ছেলে ওয়াদারিং হাইটস্-এ যাবে। এতটা পথ এসে ও ক্লান্ত, ঘুমিয়ে আছে। আর

তোমার মনিবকে এ কথাও বোলো, ওর মা আমাকেই ওর অভিভাবক নিযুক্ত করে গেছেন। ওর স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ।

জোসেফ মেঝেয় লাঠি ঠুকে বলে উঠলো, না, না! হিথক্লিফ ওসবের ধার ধারে না। তার নিজের ছেলেকে সে চায়! আমি ঐ ছেলেকে আজই নিয়ে যাব। ওকে নিয়ে আসুন!

লিণ্টন দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, আজ রাতে আমি নিয়ে যেতে দেব না। যাও, তোমার মনিবকে গিয়ে ওকথা বল! এলেন, ওকে নীচে নিয়ে যাও তো! যাও বলছি!

আমি জোসেফের হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এলাম।

জোসেফ বলে উঠলো, বেশ, বেশ! কাল ও নিজেই তেড়ে ফুঁড়ে আসবে! তখন দিও তো বাছা ওকে বার করে!

বিশ

একটা গোলমাল হবে এই ভয়েই মিঃ লিণ্টন আমাকে ভোরেই খুদে লিণ্টনকে তার বাড়িতে দিয়ে আসতে বললেন।

দুঃখ করে বললেন, ওর ভাগ্যের উপর আর আমাদের কোন হাত রইল না! যাক্, ও কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে ক্যাথিকে কিছু বলবে না! এরপরে ওর সঙ্গ তো সে পাবে না—তাই ও কোথায় আছে না জানাই ভাল। কি জানি জেনে ফেললে হয়তো হাইটস্-এ ছুটে যাবে। শুধু ওকে বোলো, খুদে লিণ্টনের বাবা তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে খবর পাঠিয়েছেন—তাই সে চলে গেল।

ভোর পাঁচটায় বিছানা থেকে উঠতে তার ভারী অনিচ্ছা ছিল। যখন বলা হোল, এখুনি ওকে রওনা হতে হবে, ও তো আরো অবাক হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম, ওর বাবা হিথক্লিফ ওকে দেখতে চান।

ও তো আরো অবাক হয়ে বলে গেল, আমার বাবা! মা তো কখনো আমাকে

বলেন নি যে আমার বাবা আছেন। উনি কোথায় থাকেন? তার চেয়ে আমি মামার কাছেই থাকব!

ওকে উত্তর দিলাম, গ্রেঞ্জ থেকে এই কিছু দূরেই তিনি থাকেন। ঐ টিলাগুলোর আড়ালে। তুমি তো এখানে যখন-তখন আসতে পারবে। বাছা, বাবাকে মার মতোই ভাল বাসবে, দেখবে উনিও তোমাকে খুব ভালবাসবেন।

ও বললে, কিন্তু তাঁর কথা তো মার মুখে কখনো শুনিনি। বাবা তো আমাদের সঙ্গে কখনো থাকতেন না! সবারই বাবা আর মা তো একসঙ্গে থাকেন?

বললাম, উনি যে নানা কাজে ব্যস্ত। প্রায়ই তো দূর দেশে যান। তাছাড়া তোমার মার শরীর ভাল ছিল না। তাই উনি থাকতেন স্বাস্থ্যকর জায়গায়।

কিন্তু মা কখনও ওঁর নামও করেননি। মামার কথাই বলতেন। আমিও মামাকেই জানতাম। মার কাছে ওঁর কথা শুনেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু বাবাকে আমি এখন কি করে ভালবাসবো! ওঁকে তো আমি চিনিই না!

ওকে বুঝিয়ে বললাম, বাছা, সব ছেলেমেয়েই তাদের বাপমাকে ভালবাসে। তোমার মা হয়তো ভেবেছিলেন, ওঁর কথা বললে তুমি হয়তো ওঁকে দেখার জন্য উতলা হয়ে উঠবে। চল, আর দেরী নয়, ভোরের হাওয়া এখুনি বেশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠবে।

ও জিজ্ঞেস করলে আচ্ছা কালকের ঐ মেয়েটিও কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

না, এখন যাবে না।

মামা?

না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ও বালিশের উপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে কি ভাবতে লাগলো।

অবশেষে চীৎকার করে উঠলো, মামার সঙ্গে ছাড়া যাব না, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে!

ও কিছুতেই শান্ত হয় না, মনিবকে ডাকলাম। শেষে তিনি বহু চেষ্টা করেই ওকে বিছানা থেকে তুললেন। ওকে বলা হোল, ক'দিনের জন্য যাচ্ছে বই তো নয়। আর ক্যাথিকে নিয়ে তিনি এর মধ্যে গিয়ে দেখা করে আসবেন। আমিও ওকে নিয়ে যেতে যেতে অনেক কিছু বললাম।

ভোরের হাওয়া বইছিল। উজ্জ্বল রৌদ্র। ক্যাথির টাট্টু ঘোড়া চলছিল আস্তে আস্তে। ওর দুঃখ কোথায় উবে গেল। ও ওর বাবার কথা, বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো।

ও পিছন ফিরে তাকালো উপত্যকার দিকে, হাল্কা কুয়াশায় ঘিরে আছে উপত্যকা, থাসক্রসগ্রেঞ্জ আবছা দেখা যায়। নীল আকাশের প্রান্তে যেন পেঁজা তুলোর মতো কুয়াশা লেগে লেগে আছে।

ও এবার বললে, মামার বাড়ির মতোই কি ঐ বাড়িখানা ?

না, অমন গাছপালা ঢাকা নয়। কিন্তু তুমি ওখান থেকে সারা তল্লাটখানা দেখতে পাবে। প্রথমে বাড়িখানা পুরানো আর বড় আঁধার মনে হবে, কিন্তু অমন বাড়ি এ এলাকায় ক'খানা আছে ! আমাদের হেয়ারটন তোমাকে কত সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখাবে। যখন বসন্ত আসবে, তখন বাগানের এক কোণে গিয়ে বসে তুমি বই পড়বে। তোমার মামাও মাঝে মাঝে তোমাদের ওখানে যাবেন। তাঁর সঙ্গে এক-একদিন পাহাড়ে ঘুরে আসবে !

আমার বাবা কেমন দেখতে ? ও জিজ্ঞেস করলে। উনি কি আমার মামার মতো ?

হাঁ, অমনি ওঁর বয়েস কিন্তু চুল আর চোখ ওঁর কালো, আর লম্বাও ঢের। প্রথমে দেখে মনে হবে কড়া লোক তোমাকে তেমন আদর যত্ন নাও করতে পারেন। এই ওঁর অভ্যেস ! কিন্তু তুমি বাপের সঙ্গে ভাব করবে ; মামার চেয়ে উনি তোমাকে বেশি ভালবাসবেন।

খুদে লিণ্টন কি ভেবে বললে, কালো চুল, কালো চোখ, আমি তো ওঁকে ঠিক ভাবতে পারছিনে। তাহলে আমি ওঁর মতো হইনি !

না, তোমার চেহারার সঙ্গে একটুও ওঁর মিল নেই ওর দিকে একবার দৃষ্টি

পড়লো। ফরসা রং, ছিপছিপে গড়ন, আর আয়ত শান্ত চোখ। অবিকল মার সেই চোখ দুটি—কিন্তু সেখানে মার সেই ক্ষণিক উদ্দামতার ছায়া।

ছেলেটা আবার বললে, কি অদ্ভুত! উনি কখনো আমাকে বা মাকে দেখতে আসেন নি। উনি কি আমাকে কখনো দেখেছেন? যদি দেখে থাকেন সে তো আমি যখন একেবারে ছোট ছিলাম। আমার তো কিছুতেই মনে পড়ে না!

ওকে বলতে লাগলাম, দেখ বাছা, তিনশো মাইল পথ তো আর চাট্টিখানি নয়। তাছাড়া তোমার কাছে দশ-বারো বছর একটা যুগ, কিন্তু আমাদের বয়েসী মানুষের কাছে সে তো এক লহমার ব্যাপার। হয়ত তোমার বাবা বহুবার যাবেন বলে ঠিক করেছেন, নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এই নিয়ে ওঁকে আবার কোনো কথা জিজ্ঞেস কোরো না। উনি তো এসব শুনে আরো মুষড়ে পড়বেন।

বালক চুপ করে গেল। সে তখন নিজের ভাবনায় বিভোর। এবার আমরা এসে পৌঁছলাম খামারবাড়ির ফটকে। ও দেখছে চোখ ভরে দেখছে, ঐ দরজা—ঐ জামগাছের ঝোপ, বাঁকা ফার গাছের সার। বাড়ির বাইরেটা দেখে ও খুশি নয়। কিন্তু অভিযোগ করতে চায় না।—সে জ্ঞানটুকু ওর আছে।

সাড়ে ছটা বাজে। প্রাতরাশ সবে সাঙ্গ হয়েছে, পরিচারিকা টেবিল পরিষ্কার করছিল। জোসেফ মনিবের চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন বলছিল। হেয়ারটন মাঠে যাবার জন্য তৈরী।

আমাকে দেখেই হিথক্লিফ বলে উঠলো, এই যে নেলি যে! আমি তো ভেবেছিলাম, নিজে গিয়েই আমার সম্পত্তিটিকে নিয়ে আসতে হবে। তুমি এনেছ? দেখি, দেখি তো!

ও দরজার কাছে চলে এল। বেচারী খুদে লিণ্টন তো ভয়ে বিবর্ণ, জোসেফ আর হেয়ারটনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

জোসেফ গম্ভীরভাবে দেখে শুনে বললে, ও তো যেন কর্তার ছেলে নয়, মেয়ে।

হিথক্লিফ হেসে উঠলো!

কি সুন্দর! একে কি খাইয়ে মানুষ করেছে! কি—শুগ্‌লী আর টক দুধ নাকি? নেলি, সত্যি আমি এমনটি তো আশা করিনি!

ও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। বাপের কথার একটি বর্ণও বুঝতে পারলে না। কিন্তু এখনো ও নিশ্চিত নয় যে, এই লোকটাই ওর বাবা। ও আমাকে জড়িয়ে ধরলো। হিথক্লিফ এসে বসেপড়ে ওকে ডাকতেই ও আমার কাঁধে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলো।

হিথক্লিফ ওকে টেনে-হিঁচড়ে কাছে নিয়ে এসে ওর মুখখানা তুলে ধরলো—ওসব এখানে চলবে না! আমরা তোকে মারধর করছিনে। লিণ্টন তোর নাম, না? তুই একবারে তোর মার মতো হয়েছিস! ওরে কুঁকড়োর বাচ্ছা, আমার কাছ থেকে কি পেলি!

টুপীটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ওর মাথা থেকে খসিয়ে, ঘন চুল ওর মাথায়, ওর বাহু আর আঙুলে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখলে। লিণ্টনের কান্না থেমে গেছে। সে তার নীল আয়ত দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে।

হিথক্লিফ টিপে টিপে দেখলে, ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বড় দুর্বল। সে দেখে যেন খুশি হয়েছে, এবার বললে, আমাকে চিনতে পারিস?

না, লিণ্টনের চোখে রাজ্যের ভয়।

আমার কথা শুনেছিস!

না, আবার এল উত্তর।

না! তোর মার কি অন্যায়, বাপের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জাগাবার একটুও চেষ্টা করেনি! তাহলে শোন্, তোর মা ছিল খারাপ মেয়ে মানুষ—বেশ্যা—সে তাই তোকে বাপের কথা কিছু জানতে দেয়নি। এখন এখানে ভাল ছেলে হয়ে থাকবি, আমি তোর ভার নেব। নেলি, তুমি কি ক্লান্ত? তাহলে বসে পড়, নয় তো বাড়ি চলে যাও! তুমি তো এখানে যা দেখবে—একেবারে অবিকল গিয়ে তাইই গ্রেঞ্জে উগ্‌রে দেবে। তাই তুমি থাকতে আমি আমার পিতৃত্বের মালিকানা জাহির করবো না!

উত্তর দিলাম, বেশ তো! আমি চলেই যাচ্ছি! কিন্তু ছেলেটার উপর

একটু মায়াদয়া কোরো, তা নইলে বেশীদিন তো রাখতে পারবে না। গোটা দুনিয়ায় তুমি একাই ওর আপনজন তাতো—নয়।

ও হেসে উঠলো, ভয় নেইগো, ভয় নেই। ওর উপর খুব মায়াদয়া দেখাব। ওর স্নেহশ্রদ্ধা ভক্তি সব আমি একচেটে করে ফেলতে চাই। দেখ, দেখ কেমন মায়া দয়া আমার! জোসেফ, ওর জন্যে খাবার নিয়ে এস! এই বেটা হেয়ারটন, তুই তোর কাজ কর না গিয়ে। ওরা দুজন চলে যেতে বললে, নেলি, আমি জানি, আমার এই বাচ্চাই ঐ থাসক্রসগ্রেঞ্জর তোমাদের ওয়ারিশ; ও যে পর্যন্ত না তার দখল পায়, আমাকে ওকে জিইয়ে রাখতেই হবে। তাছাড়া আমার বংশধর লিণ্টনদের ছেলেপুলেদের দিয়ে জনমজুর খাটাবে তাই আমি দেখতে চাই। এডগারটাকে আমি ঘৃণা করি কিন্তু বাচ্চার জন্যে ভয় কোরো না। ওর জন্যে ভাল করে একখানা ঘর আমি সাজিয়ে রেখেছি। আর হেয়ারটন ওর খিদমতগারি করবে! কিন্তু এত করেও মনে সুখ পাচ্ছি না। এই ছেলেকে কি মানুষ করা যাবে! ওর এই মেয়েলী চেহারা দেখেই আমার সব আশা উবে গেছে।

জোসেফ এর মধ্যে নিয়ে এল দুধ-জাউ—খুদে লিণ্টনের সামনে রাখলো। ওতো খাবারের চেহারা দেখে বিরূপ হোল, তাই জানালে, খাবার ওর মুখে রুচবে না। জোসেফ তো বলেই উঠলো, রুচবে না? খুদে হেয়ারটন তো অন্য কিছু কখনো খায়নি।

কিন্তু লিণ্টন প্রতিবাদ করলে, আমি ওগুলো খাব না! তুমি নিয়ে যাও! জোসেফ খাবারের পাত্রটা নিয়ে আমাদের কছে এসে হিথক্লিফের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, দেখতো কত্তা, ছেলের মুখে এসব রুচবে না!

কেন কি হোল? হিথক্লিফ জিজ্ঞেস করলো।

কি আবার হবে—তোমার আদরের দুলালের মুখে রুচবে না! হবে না কেন, যেমন মা, তার তেমনি বেটা!

হিথক্লিফ ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, ওর মার নাম আমার কাছে কোরো না! ওর যা মুখে রোচে এমন জিনিষ এনে দাও? নেলি, ও কি খায়?

আমি কিছুটা গরম দুধ বা চা এনে দিতে বললাম। জোসেফ গজর গজর

করতে করতে চলে গেল। মনে হোল, ওর বাবার স্বার্থপরতায় হয়তো ওর খানিকটা সুখসুবিধেই হবে। আমার মনিবকে একথা বললে, তিনি খুশিই হবেন। আর তো থাকবার দরকার নেই—তাই আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। দরজা ভেজিয়ে দিয়েছি, এমন সময় শুনতে পেলাম আর্ত চীৎকার—

ওগো আমাকে ফেলে যেও না! আমি তো এখানে থাকব না! কিন্তু দরজায় সশব্দে খিল পড়লো। আমি টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে চললাম থ্রাসক্রসগেঞ্জের দিকে। আমার অভিভাবকত্বের পালা সাঙ্গ হোল।

একুশ

ক্যাথিকে নিয়ে সেদিন মহা মুশকিলেই পড়া গেল। সে উঠেই মহা আনন্দে তার ভাইকে দেখতে ছুটে এল। কিন্তু খবর শুনে সে কি তার কান্না! এড্গার নিজে তাকে শান্ত করে বললেন, ও শীগ্গীরই ফিরে আসবে। কিন্তু তিনি আপন মনে বললেন, ওকে আর দেখব কিনা জানিনা কিন্তু এ প্রতিশ্রুতিতে ক্যাথি সাময়িকভাবে শান্ত হোল। রোজই সে জিজ্ঞেস করতো কবে আসবে তার ভাই।

যখনি ওয়াদারিং হাইটস্-এর কারো সঙ্গে দেখা হোত, তাকে খুদে লিণ্টনের খবর জিজ্ঞেস করতাম! শুনতাম, তেমনি দুর্বলই আছে; আর লোকজনকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। খুদে লিণ্টন নাকি পড়াশুনো করে নয়তো একা ঘরে বসে থাকে। আবার শুয়ে শুয়েও ওর দিন কেটে যায়। তাছাড়া সর্দিকাশি, গা-ব্যথা এসব তো লেগেই আছে।

আমি ওর কাছ থেকে এখবরও পেলাম, সহানুভূতির অভাবে ও দিন দিন স্বার্থপর হয়ে উঠছে। ওর এই পরিবর্তনে দুঃখই হোল। মিঃ এড্গার এদিকে খবরের জন্য ব্যস্ত! ওর ভাবনায় তিনি অধীর, এমন কি তিনি হয়তো একদিন দেখাও করতে পারেন বলে মনে হোল। একদিন তিনি ওদের বাড়ির পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, ওকি কখনো গ্রামে বেড়াতে আসে? সে বললে, দুবার এসেছিল।

সেই একই খাতে বয়ে চললো গ্রেঞ্জের জীবনধারা। ক্যাথি এদিকে ষোল বছরে পা দিলে। ওর জন্মদিনে উৎসব করার নিয়ম, কেননা ঐদিন আবার মনিবানীর মৃত্যুরও দিন। ওর বাবা লাইব্রেরী ঘরেই দিনটা কাটিয়ে দিলেন। সন্ধ্যের দিকে গেলেন গিমারটন অবধি বেড়াতে। ক্যাথি নিজেকে নিয়ে তখন মত্ত। দিনটা ছিল বড় সুন্দর। ওর বাবা ফিরে এলেন ক্লান্ত হয়ে। নিজের কামরায় চলে গেলেন। পরদিন। আমাদের তরুণী ভদ্রমহিলাটি বেরুলেন বেড়াতে। বললো, এলেন বেড়াতে যাচ্ছি। সঙ্গে চল!

ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও চললাম। আমার আগে আগে ও লাফিয়ে চলেছে। একবার দূরে ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে ফিরে আসছে আমার কাছে। চারদিকে উজ্জ্বল মধুর রোদ। চাতক পাখী ডাকছে। ওর দিকে তাকিয়ে মন আনন্দে নেচে উঠলো। উদ্দাম উজ্জ্বল তরুণী স্বর্ণবর্ণী কেশপাশ এলিয়ে পড়ছে। মুখে ওর স্বাস্থ্যের দীপ্তি—নির্মেঘ আকাশের নির্মল আনন্দে যেন বিভোর।

ওকে বললাম, কতদূর যাবে গো?

আর একটু দূরে—আর একটু দূরে এলেন! ঐ টিলাটার উপর চড়বো, ঐ যে বাঁধটা ওটা পেরিয়ে যাব।

চললাম। টিলার পর টিলা চলে গেল। বাঁধের পর বাঁধ। ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। শুনলে না ও ছুটতেই লাগলো। ও মিলিয়ে গেল। ও তখন ওয়াদারিং হাইটস্-এর কাছে এসে গেছে। দূর থেকে দেখলাম, ক'জন লোক ওর আশেপাশে। তার মধ্যে হিথক্লিফকে দেখেই চিনতে পারলাম। ওর কাছে ছুটে এলাম।

ক্যাথি নাকি পাখীর বাসা থেকে পাখী চুরি করতে গিয়েছিল হিথক্লিফের এলাকায়। তাই এই সোরগোল।

ও বললে, আমি তো একটাও নিইনি। বাবা বলেন, ওরা নাকি চমৎকার ডিমপাড়ে আমি তাই ডিমগুলো দেখছিলাম।

হিথক্লিফ আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে, তারপর চীৎকার করে উঠলো, তোমার বাবাটি কে?

আমার বাবা থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জের মিঃ লিণ্টন। আপনি যদি আমাকে চিনতেন ও ভাবে কথা বলতেন না।

হিথক্লিফ বিদ্রূপ করে উঠলো, তাহলে তোমার বাবাকে তুমি মস্ত মানী লোক বলেই ঠাওরাও দেখছি।

ক্যাথি বলে উঠলো, আপনিই বা কে শুনি? সেদিন আপনার এখানে তো ওকে দেখে গেছি। (সে হেয়ারটনকে দেখিয়ে দিলে) ওকি আপনার ছেলে?

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, ক্যাথি তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চল! দেরী হয়ে গেছে।

হিথক্লিফ বলে উঠলো, না, ও আমার ছেলে নয়। আমার ছেলেও আছে। তাকে তুমি দেখেছ। তোমার দাসীটি তো যাবার জন্যে উতলা—কিন্তু আমার মনে হয়—একটু জিরিয়ে নেওয়াই ভাল। একবার ভিতরে আসবে কি?

আমি ক্যাথিকে ফিস্‌ফিস্ করে জানিয়ে দিলাম, ও যেন কিছুতেই রাজি না হয়। ও অমনি জোরে বলে উঠলো, কেন রাজি হব না এলেন? আমি তো হাঁফিয়ে উঠেছি। তাছাড়া ঘাস তো শিশিরে ভেজা—এখানে তো বসা চলে না! এলেন, চল ভিতরে যাই। তাছাড়া উনি না বললেন, ওঁর ছেলেকে আমি চিনি। ওঁর ভুল হয়েছে।

না, ভুল হয়নি! এসে দেখ! নেলি, তুমি চুপ কর তো! হিথক্লিফ বলে উঠলো, হেয়ারটন মেয়েটিকে নিয়ে এস।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, না, ও যাবে না। হিথক্লিফ আমার হাত চেপে ধরলো, এর মধ্যে ও ঢুকে পড়লো।

হিথক্লিফকে বললাম, এ তোমার ভারী অন্যায়। এতে কোনো ভালই তো হবে না। বাড়ির ভিতরে ঢুকে লিণ্টনকে দেখবে, আর বাড়ি গিয়ে তা বলে দেবে। এদিকে আমি গাল খাব।

ও উত্তর দিলে, আমি খুদে লিণ্টনের সঙ্গে ওর দেখা করিয়ে দিতে চাই।

এই ক'দিন ও একটু ভাল আছে। ও যাতে ব্যাপারটা গোপন রাখে সে ব্যবস্থা আমি করবো। তাছাড়া এতে ক্ষতিটা কোথায় ?

ক্ষতি হচ্ছে ওর বাবা এটা পছন্দ করেন না। তিনি আমার উপরে চটে যাবেন। তাছাড়া তোমার কোনো বদ মতলব আছে বলেই আমার মনে হয়।

বরং আমার সুমতলব আছে বল! আমি সব কথাই বলছি। এই খুড়তুতো ভাইবোন যাতে প্রেমে পড়ে তাই আমি চাই। ওদের বিয়ে হোক এই আমার ইচ্ছে। তোমার মনিবের এতে সুবিধেই হবে। তাঁর মেয়ে ছুটি বিস্তীর্ণ জমিদারীর মালিক হবে।

হাঁ, লিণ্টনের তো শরীর অসুস্থ, ও মারা গেলে হবে বটে !

না, তা হবে না। উইল-এ এমন কোন সর্ত আমি রাখবো না। জমিদারী হবে আমার। কিন্তু এখন আমি ওদের মিলন চাই—আর তা হবেও এই আমি ঠিক করেছি !

আর আমি ঠিক করেছি, আর এ বাড়ির ছায়া মাড়াতে ওকে দেব না !

হিথক্লিফ আমাকে চুপ করতে বললে। ক্যাথি ফটকে দাঁড়িয়েছিল। আর লিণ্টনও এমনি সময় বেরিয়ে এল।

হিথক্লিফ তাকে দেখিয়ে ক্যাথিকে জিজ্ঞেস করলে, ওটি কে বলতে পার ?

আপনার ছেলে ?

হাঁ, হাঁ। কিন্তু ওকে এই প্রথম দেখলে ?

সত্যিই লিণ্টনকে চিনতে পারেনি ক্যাথি, সে অনেক লম্বা হয়ে গেছে। একটু যেন শরীরটাও ভাল।

হিথক্লিফ বলে উঠলো, তোমার স্মৃতিশক্তি তো বড় খারাপ দেখছি। তুমি কি তোমার পিসতুতো ভাই লিণ্টনকে চিনতে পারনি।

কি—ঐ লিণ্টন! ক্যাথি নাম শুনে চমকে উঠলো। ঐ—ঐ আমার খুদে ভাই লিণ্টন ! ও তো আমার চেয়ে ঢের ঢ্যাঙা হয়ে গেছে। সত্যি, সত্যি তুমি লিণ্টন ?

ছেলেটি এগিয়ে এল, ক্যাথি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। দুজনেই অবাক।

সময় দুজনেরই চেহারাই বদলে দিয়েছে। ক্যাথি এখন পূর্ণ প্রস্ফুটিতা, ইস্পাতের মতোই নমনীয় ওর তনুদেহ। সারা দেহ চুইয়ে পড়ছে স্বাস্থ্যের দীপ্তি। ওরা কত আদর আর সোহাগের কথা বললে। ক্যাথি এবার হিথক্লিফের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি তাহলে আমার পিসেমশাই! আপনি প্রথমে চটে গেলেও আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। আপনি লিণ্টনকে নিয়ে থ্রাসক্রসগেঞ্জে যান না কেন? এত কাছে আমরা থাকি অথচ আমাদের দেখা হয় নি—এ বড়ই অদ্ভুত! হিথক্লিফ উত্তর দিলে, এক-আধবার যে না গেছি তা নয়।

এবার ক্যাথি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, এলেন তুমি ভারী দুষ্টু! আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছিলে না! আমি রোজ সকালে এখানে আসব পিসেমশাই। আপনি কি আমাকে দেখে খুশি হবেন না?

নিশ্চয়ই খুশি হব, হিথক্লিফ বলে উঠলো। কিন্তু তোমাদের ওখানে তো যাওয়া সম্ভব হবে না। মিঃ লিণ্টনের আমার উপরে রাগ আছে। একবার আমাদের খুব ঝগড়া হয়। তুমি গিয়ে ওঁর কাছে যদি আমার কথা বল, উনি তোমাকে আর আসতে দেবেন না। যদি ভাইকে দেখার ইচ্ছে থাকে চুপ করেই থেকো। তোমার যখন খুশি আসবে, কিন্তু কখনো ঘুণাক্ষরেও বাবার কাছে বলবে না।

আপনারা কেন ঝগড়া করলেন? ক্যাথি জিজ্ঞেস করলে।

আমি গরীব বলে ওঁর বোনের সঙ্গে বিয়ে দিতে আপত্তি ছিল। তারপরে আমি বিয়ে করলাম বলে উনি চটে যান—ওঁর গর্বে ঘা লাগে বলেই উনি আমাকে আর ক্ষমা করতে পারেন নি।

ক্যাথি বলে উঠলো, এ কিন্তু ভারী অন্যায়। একদিন ওঁকে একথা বলবো। কিন্তু আপনাদের ঝগড়ায় আমরা তো কেউ ছিলাম না। ও যদি গ্রেঞ্জে না যায়, আমিও এখানে আসবো না।

কিন্তু ওর পিসতুতো ভাইটি বললে, অতদূর আমি হেঁটে যেতে পারবো না। তাহলে মারাই যাব। ক্যাথি, বরং তুমিই এস! রোজ না হয় সপ্তাহে একটিবার অন্তত আসবে।

হিথক্লিফ তার সন্তানের দিকে ঘৃণাভরে তাকাল। ও আমাকে বললে, মনে হয় নেলি, আমার সব শ্রম পণ্ড হবে। ক্যাথি ওর দরটা বুঝতে পেরে ওকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে। উঃ, ও যদি হেয়ারটন হোত! তুমি জান, দিনে বিশবার আমি হেয়ারটনের মতো ছেলের কামনা করি। ও যদি অন্য কারো ছেলে হোত, আমি ওকে ভালবাসতাম। লিণ্টন!

কি বাবা? লিণ্টন উত্তর দিলে।

তোমার বোনকে দেখাতে পার এমন কি তোমার কোন পুঁজিই নেই। ওকে বাগিচায় নিয়ে যাও, আস্তাবলে নিয়ে যাও।

সে কিন্তু নড়তেও অরাজি। বললে, ক্যাথি, তোমার কি এখানে বসতে ভাল লাগছে না?

হিথক্লিফ উঠে পড়ে বেরিয়ে গেল। সে নিয়ে এল হেয়ারটনকে।

ওকে দেখে ক্যাথি বলে উঠলো. আচ্ছা পিসেমশাই, ও কি আমার ভাই?

হাঁ, হিথক্লিফ বললে। ও তোমার মার ভাইপো। ওকে তোমার ভাল লাগে না!

ক্যাথি যেন কেমন কৌতূহলী।

ও কি দেখতে ভাল নয়? হিথক্লিফ জিজ্ঞেস করলে।

ক্যাথিটা কি অসভ্য। ও হিথক্লিফের কানে কানে কি বললে। সে হেসে উঠলো, এদিকে···হেয়ারটন আরক্ত হয়ে উঠেছে। ও নিজের হীনতা সম্বন্ধে সচেতন। ওর অভিভাবক বলে উঠলো,

তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে পেয়ারের হয়ে উঠেছ! ক্যাথি তো বলেছে তুমি—কি যেন বললে? খুব একটা চমৎকার কথা। যাও, ওকে খামার বাড়ি দেখিয়ে নিয়ে এস। আর ভদ্র ব্যবহার কোরো। কোনরকম খারাপ

কথা বোলো না। ওর দিকে অসভ্যের মতো তাকিয়ে থেকো না! যখনি কথা বলবে যেন আস্তে আস্তে বোলো।

ক্যাথির সঙ্গে ও চলে গেল।

হিথক্লিফ ওদের দিকে তাকিয়ে বললে, ওর জিভ আমি শাসনে রেখেছি। ও একটা কথা বলবে কিনা সন্দেহ! নেলি—ওর এই বয়সে আমার কথা মনে পড়ে! ওর মতো হাঁদা কি আমি ছিলাম?

না—ওতো হাঁদার ও সেরা হাঁদা!

তাতে আমারই আনন্দ। এ তো আমারই কীর্তি! ও যদি জন্ম থেকেই হাঁদা হোত, তাতে আমার আনন্দ হোত না। কিন্তু ওতো বোকা নয়, ওর সমস্ত অনুভূতিগুলির খবর আমি রাখি—আমি নিজেও তো অমনি সয়েছি। জানি—জানি—ওর দুঃখ জানি। কিন্তু আর তো মুক্তি নেই। ওর বাবা তো আমাকে ছোটবেলায় হাতে পায়নি, কিন্তু আমি ওকে হাতে পেয়েছি ছোটবেলায়। সব কিছুকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছি। এখন ওকে দেখলে হিণ্ডলে খুশি হোত। আর আমার ছেলেটাকে গর্ব করার মতো তৈরী করতে চাই। কিন্তু একজন হচ্ছে খাঁটি সোনা—তাকে পথ তৈরীর কাজে লাগানো হচ্ছে; আর একজন হচ্ছে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে টিনের পাত—তাকে রূপোর পাত্রের কাজে লাগানো হয়েছে। আমারটা তো কোন পদার্থের নয়। তবু দেখি—কতদূর গড়ে পিটে তুলতে পারি। ওর গুণ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সব হারিয়ে বসে আছে; এখন যা গুণ সব দোষ হয়েই দাঁড়িয়েছে। আমার দুঃখ করবার কিছু নেই আর তাছাড়া ও আমাকে ভালবাসে। সেখানেও আমি হিণ্ডলের উপর টেক্কা মেরেছি। যদি ঐ মরা শয়তানটা কবর থেকে উঠে এসে আমাকে গাল পাড়তে পারতো, আমি তো দুশো মজা পেতাম।

হিথক্লিফ শয়তানি হাসি হেসে উঠলো। আমি রা করলাম না। ও তা আশাও করেনি। এদিকে আমাদের লিণ্টন তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

হিথক্লিফ এবার বলে উঠলো, ওরে কুড়ে, ওঠ্! ওরা এখন মৌচাকের কাছে আছে, যা ওখানে ছুটে যা।

লিণ্টন যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে ছুটে চললো। ও বাইরে যেতেই শুনলাম, ক্যাথি তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করছে, বাড়ির দরজায় কার নাম লেখা! হেয়ারটন তাকিয়ে দেখে মাথা চুলকোতে লাগলো।

ও বললে, আমি তো পড়তে জানি না!

পড়তে জান না? ক্যাথি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, আমি পড়তে পারি। ওটা ইংরেজিতে লেখা, কিন্তু এখানে ওটা লেখা কেন।

লিণ্টন এরই মধ্যে এসে জুটেছে, ও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। ও উপভোগ করছে।

ও বোনকে বললে, ও কিছু জানেনা! এমন এক প্রকাণ্ড মূর্খ তুমি আর পাবে না?

ক্যাথি গম্ভীর হয়ে বললে তাই নাকি। ওকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলাম ওতো বুঝতেই পারল না। আমি ওর কথা বুঝতে পারিনা।

লিণ্টন আবার হেসে উঠলো, হেয়ারটনের দিকে ব্যঙ্গভরে তাকালো। তারপর বলে উঠলো, আর্ণশ আমার বোন তোমাকে একটা মূর্খ বলেই ঠাউরেছে, তুমি যে বইপড়া বিদ্যাকে ঘৃণা কর, দেখলে তো তার ফল কি! ক্যাথি, তুমি কি ওর উচ্চারণ লক্ষ্য করনি। একেবারে গেঁয়ো জীব।

গোল্লায় যাক্ লেখাপড়া! সে এমন ভাবে বললে, তার কথা শুনে হেসে উঠলো ক্যাথি আর লিণ্টন।

লিণ্টন বললে, কি আবার তুমি অমনি বিশ্রীভাবে কথা বলছো? বাবা না তোমাকে খারাপ কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তুমি তো আবার মুখ খুললেই খারাপ কথা বল! একটু কি ভদ্র হবে না?

ঐ ক্রুদ্ধ বর্বর চেঁচিয়ে উঠলো, তুই যদি একরত্তি বাচ্চা না হতিস, তোকে এখুনি পেড়ে ফেলতাম। অপমানে যেন ফুঁসে উঠলো হেয়ারটন। ক্রোধের সঙ্গে বিব্রতো সেখানে মিশে আছে—সে যেন আবার কেমন বিব্রত।

হিথক্লিফ কথাটা শুনে হাসলো।

বিকেল অবধি আমরা রইলাম, ক্যাথিকে তার আগে ওখান থেকে নিয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হোল না। ভাগ্য ভাল যে, আমার মনিব তখনো তাঁর ঘর থেকে বেরোননি। আমাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কথা অজ্ঞাতই রইল। বাড়ি ফেরার পথে যাদের বাড়ি থেকে এলাম, তাদের সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ক্যাথির মাথায় তখন এই কথা ঢুকেছে যে আমি ওদের উপর অকারণে বিরূপ।

ও বললে তুমি বাবার পক্ষ নিয়েছ এলেন। কিন্তু এ তোমার পক্ষপাতিত্বই বলবো। নইলে এতদিন ধরে একথা বলতে না যে লিণ্টন বহু দূরে থাকে। সত্যি সত্যি আমি খুব চটেছি। তুমি আমার পিসেমশাইয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে না বলে দিচ্ছি। বাবাকে আমি ওঁর সঙ্গে ঝগড়ার জন্যে মন্দ বলবো।

আমি ওর ভুল বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। অবশ্য সেদিন কিছু বললে না; মিঃ লিণ্টনের সঙ্গে ওর দেখাই হোল না। পরদিন কিন্তু সবই ফাঁস করে দিলে। আমি খুব দুঃখিত হইনি।

ও সকালবেলা বাবার সঙ্গে দেখা হতেই বললে, বাপি, কাল কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল জান? বাপি, চমকে উঠলে কেন? তুমি কিন্তু ভাল করনি, লিণ্টনকে আমি খুঁজে বার করেছি।

ও আদ্যপান্ত বলে গেল, মনিব আমার দিকে দু-একবার ভৎসনা দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না, তারপরে ওকে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞেস করলেন, উনি যে লিণ্টনের কথা কেন লুকিয়ে রেখেছেন—সেকথা কি ও জানে?

তুমি মিঃ হিথক্লিফকে দুচোখে দেখতে পার না তাই, ও উত্তর দিলে।

তিনি বললেন, না সেজন্য নয়, বরং ব্যাপারটা তার উল্টো। মিঃ হিথক্লিফ আমাকে দেখতে পারেন না। ও তো একটা শয়তান, যাকে ঘৃণা করে তাকে ধ্বংস করে ওর আনন্দ। আমি জানতাম, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। সম্পর্ক রাখতে গেলে ঐ লোকটার সঙ্গে সম্বন্ধ

পাতাতে হবে। ও তো আমাকে ঘৃণা করে তাই তোমাকেও ছাড়বে না। তাই সাবধান হয়েছিলাম। তোমার বয়েস হলে বলবো ভেবেছিলাম। দেখছি দেরী হয়ে গেছে।

ও কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলে না, বললে, মিঃ হিথক্লিফ বেশ ভাল লোক বাপি—আমাকে যথেষ্ট আদর করলেন: আমাদের দুজনের মধ্যে দেখা হওয়ায় তাঁর তো আপত্তি নেই। বললেন, আমি যখন খুশি ওঁর বাড়িতে আসতে পারি। শুধু তোমাকে যেন না বলি। তুমি তো তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছ। ইসাবেলা পিসিকে বিয়ে করায় ওঁকে নাকি তুমি আর ক্ষমা করতে পারনি। তোমারই তো দোষ। আমি আর লিণ্টন যাতে মেলামেশা করি—উনি তাই চান। আর তুমি তো তা চাও না!

মনিব যখন তাঁর মেয়েকে কিছুতেই হিথক্লিফ সম্বন্ধে বিশ্বাস করাতে পারলেন না, তিনি তাকে ইসাবেলার প্রতি তার ঘোর অবিচার, কি করে সে ওয়াদারিং হাইটসের মালিক হোল—সব কথাই খুলে বললেন। তাঁর মতে ইসাবেলার এই অকালমৃত্যুর কারণ ঐ হিথক্লিফ। ও হত্যাকারী, পরস্বাপহারী দস্যু। তারপর বললেন।

তুমি পরে আরও জানতে পারবে। এখন যাও পড়াশুনো করগে! ওসব কথা মগজে ঠাঁই দিওনা! ক্যাথি বাপকে চুমু খেয়ে পড়াশুনো করতে বসে গেল। তারপর বাপের সঙ্গে গেল বেড়াতে। রাতে শোবার আগে ওর পোষাক খুলতে এসে দেখি, ও কাঁদছে।

দেখেই চেঁচিয়ে উঠলাম, তোমার এত দুঃখ কিসের গো? অতো নতুন মিতালি পাতাবারই শখ কেন?

ও জবাব দিলে, এলেন, আমি তো নিজের জন্য কাঁদছি না, কাঁদছি ওর জন্যে। ও কাল আমার আশায় বসে থাকবে, আর নিরাশও হবে। আমি তো আর যাব না!

বললাম, কি বাজে বকছো ক্যাথি! তুমি ওর জন্যে যত ভাবছো; ওকি তা ভাবছে বলে মনে কর? ওর তো সঙ্গী ঐ হেয়ারটনই রয়েছে। দুবেলার

তো দেখাশুনা, তাতেই আত্মীয়ের উপর অতো দরদ হবে! লিণ্টন তোমার কথা ভুলেই যাবে!

ও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ওকে চিঠি লিখে দিলে হয় না যে আমি আসতে পারব না! যে-বইগুলো দেব বলেছিলাম, অমনি সেগুলোও ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। আমার মতো এমন সুন্দর সুন্দর বই তো ওর নেই। ও ভাল ভাল বই চায়। এলেন, শুধু তুমি কি বল—ওকে চিঠি দেব?

না, না, চিঠি লিখো না। বেশ দৃঢ়স্বরেই বললাম। ও আবার তোমাকে পাল্‌টা চিঠি লিখবে। এতো আর শেষ হবে না। কিন্তু এ মিতালি একেবারে শেষ হয়ে যাওয়াই উচিত। তোমার বাবার তাই ইচ্ছে—আর সে ইচ্ছে যাতে পূর্ণ হয় তার জন্যে রয়েছি আমি।

কিন্তু একখানা ছোট চিঠি লিখলে এমন কি দোষ হবে—ও অনুনয় বিনয় করতে লাগলো।

ওকে বাধা দিয়ে বললাম, চুপ, চুপ! তোমার ও ছোট চিঠির কথা থাক! এখন বিছানায় শুয়ে পড়!

আমি ওকে শুইয়ে দিয়ে ওর গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে দিলাম। তারপরে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। খানিকটা গিয়েই কেমন অনুতাপ হোল। তাই আবার সন্তর্পনে ফিরে এলাম। দরজা খুলেই দেখি—আমাদের শ্রীমতীটি একখানা সাদা কাগজ টেবিলের উপর রেখে পেন্সিল নিয়ে কি লিখছে। আমাকে দেখে ছুটোই লুকিয়ে ফেললে।

বললাম, চিঠি তুমি একখানা কেন, অমন বিশখানা লিখতে পার—কিন্তু চিঠি নিয়ে যাবার লোক একজনও পাবে না। আমি তোমার ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিতে এসেছি।

নিবিয়ে দিলাম বাতি, ও আমার হাতের উপর এক ঘা মেরে বসলো। এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ও দরজায় খিল আটকে দিলে। চিঠিখানা লেখা হোল, আর গোয়াল থেকে দুধ নিতে যে ছোকরা আসে তার হাত দিয়ে পাঠানোও হোল। কিন্তু সেকথা ক'দিন পরেই

জানলাম। এদিকে সপ্তাহ কেটে গেল, ক্যাথি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ও শুধু পড়াশুনো করে। ওর পড়ার সময়ে এসে পড়লে, ও চমকে ওঠে, ও বইখানা লুকিয়ে ফেলতে চায়। একদিন দেখলাম, বইয়ের পাতার ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে একখানা কাগজ। ও রোজ আবার ভোরে এসে রান্নাঘরে দেখা দেয়—যেন কিসের প্রতীক্ষা করে। লাইব্রেরী ঘরে ওর একটা ছোট্ট আলমারী আছে—সেখানেও বহুক্ষণ যেন কি করে—তার চাবিটা তো রেখেছে নিজের কাছে।

একদিন আলমারী খুলে দেখছিল। আমি পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আজকাল দেখছি আলমারীতে খেলনা থাকে না। এখন ভাঁজ-করা কাগজের স্তূপ সেখানে রয়েছে। আমার কৌতূহল আর সন্দেহ বেড়ে গেল। ওর ঐ রহস্যময় ভাণ্ডারে হানা দেব ঠিক করলাম। তাই রাত্রে ও আর মনিব যখন উপরে চলে গেলেন, আমি চাবির গোছা নিয়ে বসে গেলাম। খুঁজে খুঁজে একটা চাবি বার করলাম, যেটা ওর ঐ আলমারীর তালায় লাগে। আলমারী খুলে তার ভিতরে যা ধনসম্পত্তি ছিল সব ঝাড়নে করে নিয়ে এলাম আমার ঘরে। দেখলাম সে এক রাজ্যের চিঠিপত্র। লিণ্টনেরই চিঠি—প্রায় রোজই একখানা করে আসছে। প্রথম দিকের চিঠিগুলো ছোট—একটু যা তাতে লজ্জার ছায়া আছে—কিন্তু আস্তে আস্তে সেগুলিই বিস্তারিত প্রেমপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখকের বয়সের দরুন অনেক ছেলেমানষী আর বোকামির পরিচয় পাওয়া যায়—আবার এখানে ওখানে বেশ পাকা কথা—মুন্সিয়ানাও আছে। আমার মনে হোল এগুলো বই থেকে ধার করা। কতগুলো চিঠি শুরু হয়েছে খুবই উচ্ছ্বাসভরে। কিন্তু পরে কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে, ক্যাথি এগুলো পড়ে খুশি হয়েছে কিনা কে বলবে। কিন্তু আমার কাছে তো একেবারে বাজে বলেই মনে হোল। কতগুলো বেছে বেছে আমি একখানা রুমালে বেঁধে রেখে দিলাম, বাকীগুলো আলমারীতে রেখে এলাম।

ওর অভ্যাস মতো ও সকালবেলা উঠে রান্নাঘরে এল। ছেলেটা আসতেই ও ছুটে গেল দরজা অবধি। তারপরে কি একটা যেন ছেলেটার

পকেটে গুঁজে দিল, আবার পকেট থেকে কি যেন বারও করে নিল। আমি ঘুরে বাগানে গিয়ে ছেলেটার জন্ত ওতপেতে রইলাম। ছেলেটা তো সহজে দেবে না, অনেক ধস্তাধস্তি করে তবে বার করলাম চিঠিখানা। পড়ে দেখলাম ওর প্রেমিকের চেয়ে অনেক সহজ সরল করে লেখা, মনের ভাবের প্রকাশও চমৎকার। আবার ছেলেমানষীও আছে। চিঠিখানা নিয়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম।

বৃষ্টির দিন। পার্কে ও যায় নি। সকালে পড়া শেষ করে আলমারী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ওর বাবা বসে বসে বই পড়ছিলেন। আমি কাজের অছিলায় বার বার এলাম। জানলার পর্দাটা ছিঁড়ে গিছলো, সেটা সেলাই করছিলাম, আর তাকিয়ে দেখছিলাম ওর কাণ্ডকারখানা। লুণ্ঠিত নীড়ে ফিরে কোনো পাখী যেমন শাবকদের দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে চীৎকার করে, ডানা ঝাপটায়,—ক্যাথির হতাশা যেন তাকেও হার মানায়। ও অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো। প্রফুল্লিত মুখে বিষাদের ঘন কালিমা। মিঃ লিণ্টন মুখ তুলে তাকালেন।

তিনি বললেন, কি হোল? চোট লাগলো নাকি?

তাঁর স্বরে ও বুঝতে পারলো ওর এই গোপন ভাণ্ডারের আবিষ্কারক তিনি নন।

না, বাপি কিছু না! তারপরে বললে, এলেন উপরে এস! আমার যেন শরীরটা কেমন করছে।

ওর হুকুম তামিল করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম।

ও ঘরে এসেই আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে বললে, এলেন তুমি কি নিয়েছ নাকি? দাও, ফিরিয়ে দাও! আমি আর কখনো এ কাজ করবো না! বাপিকে বোলো না। বলনি তো? আমি যে কি দুষ্টু হয়েছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কিন্তু আর তো এমন কাজ করবো না!

ওকে উঠতে বললাম।

দেখ গো তোমার কি লজ্জা নেই! সময় পেলেই বসে বসে ঐ ছাই-

ভয়গুলো পড়—এমন কি জিনিস—ছাপা বইয়ের চেয়ে ভাল নাকি! আমি যদি ওগুলো মনিবকে দেখাই—উনি কি মনে করবেন বল তো? ভয় নেই—এখনো দেখাই নি। কিন্তু চেপেও যে রাখবো—তা মনে কোরো না। তুমিই বুঝি প্রথম লিখেছ। ওর তো প্রথম লেখার মুরোদ হবে না।

আমি নই, আমি নই! ক্যাথি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ওর বুকখানা যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছে। আমি তো ওকে ভালবাসবো একথা কখনো ভাবিনি—

চীৎকার করে উঠলাম—ভালবাসা! কেউ কখন শুনেছে নাকি! ঐ যে ব্যাপারীরা বছরে একবার করে গম কিনতে আসে, ওদের বরং ভালবাসা যায়।—কিন্তু তা বলে ওকে নয়! ভালবাসার কি মানুষ! তোমরা তো দুজনকে চারঘণ্টাও জীবনে দেখনি! দেখ, ওসব ছেলেমানষী চলবে না! আমি এই চিঠি নিয়ে লাইব্রেরী ঘরে চললাম। দেখি, তোমার বাবা ভালবাসার ব্যাপারে কি মন্তব্য করেন?

ও লাফিয়ে উঠে ওর নিজের লেখা প্রেমপত্রখানা কেড়ে নিতে গেল। আমি অমনি সেখানা মাথার উপরে তুলে ধরলাম। আবার কাকুতি-মিনতি ঝরে পড়লো। বরং চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলাও ওর সইবে, তবু বাবাকে যেন না দেখাই। ওকে বললাম, যদি পুড়িয়েই ফেলি, তুমি কি কথা দেবে যে আর চিঠি দেবে না? আর ওর কাছে বই, চুল, আঙটি বা খেলনা পাঠাবে না?

আমরা খেলনা তো পাঠাই নি! ক্যাথি গর্বভরে বলে উঠলো।

কিছুই পাঠাবে না! কথা যদি না দাও, আমি এখুনি যাব!

আমি কথা দিচ্ছি। তুমি আগুনে পুড়িয়ে ফেল! এখুনি পোড়াও!

কিন্তু যেই বাণ্ডিলটা আগুনে পোড়াতে গেলাম, ও তো সহ্য করতে পারলে না।

একখানা—দুখানাও কি রাখবে না এলেন?

আমি কথা না বলে রুমাল খানার গ্রন্থি খুলে একখানার পর একখানা আগুনের কুণ্ডে ফেলে দিতে লাগলাম। শিখা ঘিরে ঘিরে এল।

ও আগুনের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, তুমি কি নিষ্ঠুর!

কিন্তু একখানা আমি রাখবই। আঙুলে ছ্যাকা লাগিয়ে কয়েকখানা আধ-পোড়া টুকরো ও বার করলে।

বাণ্ডিলে কয়েকখানা এখনো বাকি সে গুলি দেখিয়ে বললাম বেশ তো, তোমার বাপিকেও দেখাবার মতো ক'খানা রইল। দরজার দিকে এগিয়ে চললাম।

ও আবার আধপোড়া টুকরোগুলো আগুনে সমর্পণ করলো, আমি যেন দাহকার্য ভাল করেই সমাধা করি। তাই করা হোল। ছাই ঘেঁটে ঘেঁটে সরিয়ে দিলাম, তারপর আরো খানিকটা কয়লা দিয়ে দিলাম। ও নির্বাক হয়ে দেখলো, ও যেন গভীরভাবে আহত হয়েছে। তারপর ফিরে চলে গেল ওর নিজের ঘরে। মনিবকে এবার নেমে গিয়ে বললাম, ক্যাথির অসুখ প্রায় সেরে গেছে। তবু কিছুক্ষণ শুয়ে থাকাই ওর ভাল। খেতে এল না দুপুরে। কিন্তু বিকেলের চা-পর্বে এসে দেখা দিল। ম্লান তার মুখ, চোখ লাল। কেমন স্তিমিত হয়ে গেছে। পরদিন আমিই উত্তর দিলাম, ছোট হিথক্লিফকে এই মর্মে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তিনি যেন আর মিস লিণ্টনকে চিঠিপত্র না লেখেন। তিনি চিঠিপত্র গ্রহণ করবেন না বলেই সাব্যস্ত করেছেন।

এবার থেকে ছোকরাটি খালি পকেটেই আসতে লাগলো।

বাইশ

গ্রীষ্ম চলে গেল, চলে গেল প্রথম হৈমন্তী-দিনগুলি। এবার ফসল কাটার সময় এল দেরীতে ; এখনো আমাদের বহু মাঠে শস্য কাটা হয়নি। মিঃ লিণ্টন আর তাঁর মেয়ে এখন মাঝে মাঝে ফসল নিড়ানো দেখতে যান। সন্ধ্যে অবধি থাকেন। মনিবের এমনি করে সর্দি লাগলো। একেবারে ফুসফুসে গিয়ে বাসা বাঁধলো, সারা শীতকালটা তিনি ঘরে বন্দী রইলেন।

বেচারী ক্যাথি তার ভালবাসার এই পরিণতির পর থেকে এখন আরো যেন নিমর্ষ, ম্লান হয়ে পড়েছে। ওকে এখন আর ওর বাবা বেশি পড়তে

দেন না, বরং ব্যায়াম করতেই বলেন। আর তাঁর সাহচর্যও সে পায় না। আমিই এখন ওর সঙ্গী।

অক্টোবরের এক বিকেলে, হয়তো বা নভেম্বরের শুরুতেই হবে। আর্দ্র বিকেল, ঘাস আর পথ ভেজা, শুকনো পাতা উড়ছে, সয়্সয়্ করছে হাওয়ায়। ঠাণ্ডা নীল বিবর্ণ আকাশ আধখানা মেঘে ঢাকা—বড় বড় কালো মেঘের দল পশ্চিম থেকে আসছে ধেয়ে—ওদের ভিতরে লুকিয়ে আছে প্রচুর বৃষ্টি। আমরা বেড়াতে বেরুব। আমাদের শ্রীমতীটিকে বললাম আজ আর বেড়াতে হবে না, আমার ভয় হচ্ছে এখুনি বৃষ্টি চেপে আসবে। ও কিন্তু রাজি হোল না। কি আর করি ছাতা নিয়ে ওর সঙ্গে চললাম। ও ধীরে ধীরে চললো। আর লাফিয়ে লাফিয়ে যায় না, ছোটে না। পথের একধারে ওক আর কাঠবাদামের গাছ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, গাছের শিকড় দেখা যাচ্ছে, হাওয়ায় নড়ছে ডালপালা গ্রীষ্মে ক্যাথি এসে ঐ গাছে উঠতো, ডালে বসে খেত দোল! ওখানে বসে ও দোল খেতে খেতে গাইত কত গান, কখনো বা আপন মনে দেখত পাখীর খেলা। অথবা আরামে চোখ বুজে আসত ওর।

আজ একটা পাখীর বাসা দেখিয়ে বললাম দেখ, দেখ, শীত এখনো আসেনি। তাই এখনো ব্লুবেল ফুল রয়েছে কুয়াশার মত ঐ ডালখানা ঘিরে। উঠে পেড়ে আনবে নাকি ফুল?

ক্যাথি নিস্পৃহ স্বরে বললে, না, আমি ও ফুল ছোঁব না! কিন্তু ওকে দেখে তোমার মনে হয় না এলেন ওর কত দুঃখ—ঐ নীল রং যেন ওর ব্যথা! ও যেন কত শুকিয়ে গেছে!

হাঁ, উত্তর দিলাম, ও তোমারই মতো শুকিয়ে গেছে।

ও কথা বললে না। চলতে লাগলো। শ্যাওলা বা বিবর্ণ ঘাস দেখে আর থেমে পড়ে! কোথাও ব্যাঙের ছাতা একগাদা পচা পাতার স্তূপে তার উজ্জ্বল কমলা রং মেলে তাকিয়ে আছে। অসুস্থ জলুস দেখা দিচ্ছে ও দেখছে আর দেখছে, আবার মুখ ঢাকছে।

বললাম, বাছা, কাঁদছ কেন? কাছে গিয়ে ওর হাত ধরলাম।

ও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

এলেন, বাবার তো অসুখ। ভগবান না করুন, উনি আর তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও, তখন আমি কি করবো! আমার কি দশা হবে?

উত্তর দিলাম, অতো ভাবনা কেন, তুমি যে আমাদের আগে যাবে না তাই বা কে বলবে? দেখ—ওসব কুভাব ভাবতে নেই, আমাদের তো আশা, বছরের পর বছর যাবে, তবু আমাদের কেউ কাউকে ছেড়ে যাব না। মনিবের কাঁচা বয়েস। আমার বয়েস তো পঁয়তাল্লিশ পোরেনি। আমার মা আশীবছর বেঁচেছিলেন। মিঃ লিণ্টন যদি ষাট বছরও বাঁচেন—তাহলেও হাতে এখনও বিশটি বছর আছে। এখন ও নিয়ে ভেবে কি হবে?

ও বললে, কিন্তু ইসাবেলা-পিসি তো বাবার চেয়ে ছোট ছিলেন।

বললাম, উনি তো ছিলেন ঘোর দুঃখী। তাই বাঁচেন নি। তাছাড়া সেবাও দরকার। তোমার বাবার একটু আধটু সেবা করবে, তাঁকে খুশি রাখবে। কিন্তু ক্যাথি, তুমি যদি ঐ ছোকরাকে আবার ভালবাসতে যাও, তাহলে কিন্তু উনি এ ধকল সইতে পারবেন না!

না বাবাকে অসুখী করে আমি তা করবো না, ও বললে। বাবা ছাড়া আমি আর কারো কথা ভাবি না, আমার নিজের চেয়েও আমি তাকে ভালবাসি।

বেশ তো, কথায় তো হবে না, কাজেও দেখাতে হবে।

আমরা পার্কের একটা দরজার কাছে এসে গেলাম। দরজাটা খুললেই পথ, আমাদের শ্রীমতী পার্কের রেলিঙের উপর উঠে বনগোলাপ ছিঁড়তে লাগলেন। ওকে সাবধান করে দিলাম, যেন পড়ে না যায়। এর মধ্যে ওর টুপিটা মাথা থেকে খসে পড়ে গেল।

ও চেঁচিয়ে উঠলো, দেখ তো টুপিটা এখন আনি কি করে? আমাকে দারোয়ানের কাছ থেকে চাবিটা আনতে হবে। আমি তো আর রেলিং টপকে যেতে পারবো না।

ওকে বললাম, চাবির গোছা আমার পকেটে আছে, আমিই দরজা খুলে দেব।

ক্যাথি তো অমনি নেমে ছুটে এল দরজার কাছে। আমি এদিকে একটার পর একটা চাবি লাগিয়ে গেলাম ; কিন্তু একটাও তো লাগে না। এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল।

আমি ফিসফিয়ে বলে উঠলাম, কে এল ?

এলেন, দরজাটা খুলতে পারলে হোত, আমার সঙ্গীটি বললে।

এমন সময় ঘোড়সওয়ারের স্বর বেজে উঠলো, কে—ক্যাথি নাকি ! তোমাকে পেয়ে ভালই হোল। চলে যেওনা, তোমার কাছে একটা কথা জানতে চাই।

ক্যাথি বলে উঠলো, মিঃ হিথক্লিফ আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো না। বাপি বলেছেন আপনি খারাপ লোক। আপনি আমাদের ঘৃণা করেন। এলেনও তো ঐ কথাই বলে।

হিথক্লিফ বললে, আমি তো আমার ছেলেকে ঘৃণা করি না। তারই ব্যাপারে এসেছি। হাঁ, তোমার লজ্জায় লাল হয়ে উঠার কারণ আছে বইকি ! এই দুই কি তিনমাস হোল তুমি কি লিণ্টনের কাছে চিঠিপত্র লিখতে না ? ভালবাসার খেলা কি কর নি ? তোমাদের দুজনকেই এজন্যে চাবকানো উচিত। আর তোমাকে আরো বেশি করে—তুমি তো ওর চেয়েও বড়—বুদ্ধিও ওর চেয়ে বেশি। তোমার চিঠিগুলো আমার কাছে আছে, আমি সেগুলি তোমার বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব ! তোমার বোধ হয় আর খেলায় মন ছিল না, তাই চিঠি চালাচালি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু লিণ্টন তো এরই জন্যে দুঃখে ডুবে গেল। ও তো খেলাটাকেই সত্যি বলে ভেবেছিল। সত্যি বলছি, ও তোমার জন্যে হা-হুতাশ করে মরছে। তোমার এই বিশ্বাসঘাতকতায় ওর বুক ভেঙে গেছে। যদিও বড় বড় কথা বলছি। কিন্তু কথাটা নিছক সত্যি। হেয়ারটনের ঠাট্টা বা আমার পীড়নে কিছুতেই কিছু হয় নি। যদি তুমি ওকে উদ্ধার না কর—ওতো গ্রীষ্মের আগেই কবরে গিয়ে পৌছাবে।

আমি এবার বলে উঠলাম, তুমিই বা এক কোঁটা ছেলেকে অমন মিছে কথা বলতে পারলে কেমন করে ? চলে যাওনা বাপু ! ক্যাথি, তুমি ওর কথা

বিশ্বাস করো না! তুমি নিজেই তো বুঝতে পার যে অচেনা অজানা তার জন্যে কেউ হা-হুতাশ করে মরতে পারে!

শয়তানটা বলে উঠলো, এখানে যে আর একজন আড়ি পেতে ছিল তা জানিনা। দেখ নেলি, তোমাকে আমার বেশ লাগে, তাই বলে তোমার এই ফন্দি-ফিকির আমি পছন্দ করিনে! কি করে তুমিই বা অমন মিছে কথা বললে যে, আমি ওকে ঘৃণা করি। আর এই করে ওকে আমার বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখছো। ক্যাথি, আমি এই সপ্তাহটা গোটাই বাড়ি থাকব না, তুমি বরং গিয়ে দেখো আমার কথা সত্যি কিনা। একবার যেও বাছা! দেখ, শুধু শুধু ভুল করে একটা জীবন মাটি করে দিওনা। আমি তো বলতে পারি, লিন্টনকে একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পার—আর কেউ পারে না!

আমি এবার বাইরে বেরিয়ে এলাম।

হিথক্লিফ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, খুদে লিণ্টন মারা যাচ্ছে। দুঃখ আর হতাশায় আরো তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে। নেলি, তুমি যদি ওকে একা না ছেড়ে দাও তুমি ওর সঙ্গে যেও! আমি তো এই হপ্তায় বাড়িই ফিরবো না। আমার তো মনে হয় তোমাদের মনিবও আপত্তি করবেন না!

ক্যাথির হাত ধরে ওকে ভিতরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করলাম, বললাম, এস! আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবেনা!

ও তাকিয়ে আছে। হিথক্লিফ তার ঘোড়াটা কাছে নিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে বললে,

ক্যাথি, খুদে লিণ্টনকে দেখে আমার ধৈর্য থাকে না। জোসেফ আর হেয়ারটনের তো ধৈর্য আরো কম। ও একদল নিষ্ঠুর লোকের পাল্লায় পড়েছে। ও কিন্তু মায়াদয়া, ভালবাসা চায়। তোমার কাছ থেকে দুটো মিষ্টি কথা শুনলে ঐ হবে ওর সবচেয়ে ভাল ওষুধ। নেলির কথা শুনোনা, ওর সঙ্গে দেখা করা চাই। ওতো দিবারাত্র তোমারই স্বপ্ন দেখে—তুমি যে ওকে ঘৃণা কর না, একথা ও কিছুতেই মানবেনা। তুমি ওর কাছে চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করে দিয়েছ—দেখাও ওর সঙ্গে আর কর না!

আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম পার্কের! গাছপালায় গোঙানি তুলে এল হাওয়া আর বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি ছাতাটা মেলে ক্যাথিকে তার ভিতরে টেনে নিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছতে হবে, তাই হিথক্লিফকে নিয়ে আর কোনো আলোচনা হোল না। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ক্যাথি কেমন যেন বিষণ্ণ। ও হিথক্লিফের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছে।

আমাদের বাড়ি পৌছবার আগেই মনিব চলে গেছেন তাঁর কামরায়। ক্যাথি তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হোল। তিনি তখন ঘুমিয়ে গেছেন। ও ফিরে এসে বললে লাইব্রেরী ঘরে ওর সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে। একসঙ্গে বসে চা খেলাম, তারপর ও কার্পেটের উপর শুয়ে পড়ে বললে আমি যেন কথা না বলি। ও এখন ঘুমোবে। তারপরে এক সময়ে নিঃশব্দে কান্না শুরু করে দিলে। এই এখন ওর এক বিলাস। ও মাঝে মাঝেই কাঁদে। আমি প্রথমে কিছু বলিনি, শেষে আর না বলে পারলাম না—হিথক্লিফ তার ছেলের সম্পর্কে যে কথা বলেছে সে কথা তো মিথ্যে! কিন্তু হায়, মিথ্যাও যদি হয় সেই মিথ্যাকে উড়িয়ে দেবার মতো যুক্তি কোথায়?

ও উত্তর দিলে, হয়তো তুমি ঠিকই বলছো। কিন্তু তবু ও কেমন আছে না জেনে মনে তো শান্তি পাচ্ছিনা। আর লিণ্টনকে একথাও তো আমাকে জানাতে হবে, আমি যে চিঠি লিখছি না সে তো আমার দোষ নয়। ওকে এখনো ভালবাসি আর ভালবাসবোও!

ওর এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর ক্রোধ তো নিষ্ফল। আমরা ঝগড়া করেই সে রাতে বিদায় নিলাম, কিন্তু পরদিন তো আমার খুদে মনিবানীর সঙ্গে আমাকে ওয়াদারিং হাইটস্-এ যেতেই হোল।

তেইশ

বর্ষণ মুখর রাতের পরে এসেছে কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। এখনো মিহি গুঁড়োয় ঝরছে বৃষ্টি। পথের এখানে ওখানে সাময়িক নদীর সৃষ্টি হয়েছে—উচু জমি থেকে ওরা বয়ে আসছে কলকল নাদে। আমার পা ভিজে গেল ; আমি একটু বিরক্ত। খিড়কির দরজা দিয়ে আমরা খামারবাড়িতে এসে পৌছলাম। আমার ইচ্ছে, দেখা যাক হিথক্লিফ সত্যিই আছে কি নেই। ওর উপরে আমার তো বিশ্বাস নেই।

জোসেফ তেমনি বসে আছে। টেবিলে প্রাতরাশ সাজানো। ক্যাথি আগুনের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। আমি জোসেফকে জিজ্ঞাসা করলাম, কর্তা বাড়ি আছেন কিনা! ও চুপ করে রইল। আবার চেঁচিয়ে উঠলাম।

ও বললে, চলে যাও! চলে যাও!

রুক্ষ স্বর শোনা গেল, জোসেফ তোমাকে কতবার ডাকতে হবে? এখুনি চলে এস। জোসেফ তবু বধির।

আবার রুক্ষ স্বর: জোসেফ! তুমি ঠিক চিলে কোঠায় একদিন পচে মরবে! উপোস করে মরবে!

তারপরে নিজেই এল খুদে লিণ্টন।

মিস লিণ্টন, তুমি! না, না, চুমু খেতে চেওনা—ওতে আমার দম ফুরিয়ে আসে। বাবা বলেছিলেন, তুমি আসবে।

ক্যাথির আলিঙ্গনে ওর যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, এতক্ষণে তা গেছে। ও আবার বললে, ঐ দরজাটা বন্ধ করে দাও না! তোমরা ওটা খোলা রেখেছ—এদিকে আগুনের কুণ্ডে কয়লা দিচ্ছে না।

আমি কয়লা এনে গুঁজে দিলাম কুণ্ডে, পঙ্গু লিণ্টনের তবু নালিশ ফুরোয় না; বললে, ইস্ ছাইতে যে গা ভরে গেল!

খুদে লিণ্টনের ভ্রূকুটির পালা শেষ হলে ক্যাথি বললে, লিণ্টন, আমাকে দেখে খুশি হয়েছ ?

ও জিজ্ঞাসা করলে, এত দিন তুমি আস নি কেন ? চিঠি না লিখে এলেই তো পারতে ? ঐ লম্বা লম্বা চিঠিগুলো লিখতে আমার ভারী ক্লান্তি লাগে, তার চেয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলা ঢের ভাল। এখন তো কথাও বলতে আর পারি না। তাই তো জিল্লা আবার কোথায় গেল ? (আমার দিকে তাকিয়ে) একটিবার দেখবে ?

রান্নাঘর ঘুরে এসে বললাম, জোসেফ ছাড়া ওখানে আর কেউ নেই।

আমার জল তেষ্টা পেয়েছে। বাবা বাড়ি না থাকলেই জিল্লা অমনি গিমারটনে ছোটে। দেখ তো নীচে ছুটে আসতে হয়েছে জলের জন্যে !

আমি বললাম, তোমার বাবা তোমার তত্ত্বতালাস করেন তো ?

তত্ত্বতালাস ! একটু তত্ত্বতালাস করলে তো হোত। ঐ হেয়ারটন কিনা আমাকে দেখে হাসে। আমি ওকে ঘৃণা করি—ওদের সবাইকে ঘৃণা করি।

ক্যাথি জলের খোঁজ করতে লাগলো। ও শেষে এক কোণে একটা কলসী আবিষ্কার করে ফেললে। এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে এল। ছেলেটা হুকুম করলে, টেবিলের উপর যে বোতলটা আছে ওর থেকে এক চামচে মদ ঢেলে জলে মিশিয়ে দিতে। জল খেয়ে ও শান্ত হোল।

ক্যাথি বললে, আমাকে দেখে খুশি হওনি।

হয়েছি, সত্যি হয়েছি। তোমার স্বর শুনে তো নতুন মনে হয়। কিন্তু তুমি আসতে না বলেই তো কত দুঃখ ছিল আমার। বাবা বলতেন, এ নাকি আমারই দোষ। উনি একথাও জানিয়ে দিলেন যে, তুমি আমাকে ঘৃণা কর ! সত্যিই কি কর ?

ঘৃনা করি ? না, না ! বাপি, এলেন তারপরেই যদি কাউকে ভাল বাসতে হয় সে তুমি ! কিন্তু তোমার বাবাকে আমার ভাল লাগে না। উনি ফিরে এলে আমার আর আসা হবে না। উনি কি অনেকদিন বাইরে থাকবেন ?

লিণ্টন উত্তর দিলে, না, বেশি দিন নয়। কিন্তু এখন তো শিকারের সময়। উনি তো জলায়ই বেশির ভাগ সময় থাকবেন। সেই সময় তুমি তো আমার কাছে আসতে পার। আসবে তো? তোমাকে আমি জ্বালাব না কথা দিচ্ছি। তুমি তো আমাকে কখনো জ্বালাতন করনি।

ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ক্যাথি বললে, বাপি যদি বলেন, তাহলে আমি আসব। আহা, তুমি আমার ভাই হলে না কেন খুদে লিণ্টন!

তাহলে বুঝি ভালবাসতে! কিন্তু বাবা তো বলেন, তুমি আমার বউ হলে সবার চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসবে। আমার বউ হয়ে যাও না কেন?

না, বাপির চেয়ে আমি কাউকে বেশি ভালবাসতে পারবো না লিণ্টন। ক্যাথি গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো। আর মানুষ তো বউকে সবসময়েই ভালবাসে না, আবার ঘৃণাও করে; কিন্তু ভাই বোনকে তো ঘৃণা করে না। তুমি যদি আমার ভাই হতে আমাদের সঙ্গেই তো থাকতে। তখন বাবাও তোমাকে আমার মতোই ভালবাসতেন।

লিণ্টন বিশ্বাস করে না, মানুষ বউকে ঘৃণা করে; কিন্তু ক্যাথির সেই বিশ্বাস। তাই সে ইসাবেলার প্রতি হিথক্লিফের ঘৃণার উদাহরণ দিয়ে বসলো। আমি ওকে থামাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও সবই বলে ফেললে। কিন্তু খুদে লিণ্টন চটে গিয়ে বললে, একথা একেবারে নির্জলা মিথ্যে।

ক্যাথিও চটে গেল! সে বললে, আমার বাপি বলেছেন। তিনি মিছে কথা বলেন না।

আমার বাপি তোমার বাপিকে ঘৃণা করেন, উত্তেজিত হয়ে উঠল লিণ্টন। তিনি তো ওঁকে বোকাই বলেন।

ক্যাথি পাল্‌টা জবাব দিলে, তোমার বাবা খারাপ তারই প্রমাণ দিলে। উনি অমন খারাপ বলেই ইসাবেলা-পিসি ওঁকে ছেড়ে চলে যান।

ছেলেটি বললে, মা ওকে ছেড়ে যান নি। তুমি আমার কথার উপর কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।

হাঁ, ছেড়ে চলে যান বইকি! ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠলো।

লিণ্টন বললে, তাহলে আমিও তোমাকে একটা কথা বলবো। তোমার মা তোমার বাবাকে ঘৃণা করতেন।

ক্যাথি আর কিছু বলতে পারলে না। রাগে ও কাঁপছে।

ছেলেটা আবার বললে, তিনি আমার বাবাকে ভালবাসতেন।

মিথ্যেবাদী! তোমাকে আমি ঘৃণা করি! আবেগ-রক্তিম ক্যাথি, সে হাঁফাচ্ছে।

হাঁ, হাঁ, বাসতেন বইকি! লিণ্টন চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বললে।

চুপ চুপ লিণ্টন। আমি না বলে পারলাম না—ও তোমার বাপের গাল গল্প!

ও বলে উঠলো, গালগল্প নয়! তুমি চুপ কর তো! উনি ভালবাসতেন আমার বাবাকে—তোমার বাবাকে নয়!

ক্যাথি উন্মত্ত, সে চেয়ার ধরে জোরে ঠেলে দিলে। লিণ্টন এবার ভীষণ কাশতে লাগলো।

এতক্ষণ ধরে কাশি দেখে তো ভয়ই পেলাম, আর ক্যাথি জুড়ে দিল কান্না।

দশ মিনিট কেটে গেল। এবার ও সুস্থ।

ওকে শুধালাম, কেমন আছ এখন?

উঃ, ও যদি আমার মতো ভুগতো! ক্যাথি ভারী নিষ্ঠুর! হেয়ারটন আমাকে কিছু বলেনা। কখনো আমাকে মারেনি আজ আর আমি একটু ভালই আছি—আর ও কিনা—

ক্যাথি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, লিণ্টন, আমাকে ক্ষমা কর! কিন্তু অমন একটা ধাক্কায় তোমার যে এ দশা হবে তাকি আমি জানতাম? তোমার অনিষ্ট করতে তো আমি চাইনি। আমার সঙ্গে ভাব করে দুটো কথা বল ভাই!

ও বিড়বিড় করে বললে, না বলবো না—বলতে পারবো না! এমন তুমি ধাক্কা মেরেছ যে সারা রাত কাশতে হবে। আর তুমি তো তখন আরামে ঘুমোবে। উঃ, আমার মতো যদি তোমাকে ভুগতে হয় তো বেশ হয়!

ও কান্না জুড়ে দিলে।

ওকে বললাম, তোমার তো প্রায়ই এমনি জেগেই রাত কাটে—আবার

ক্যাথিকে দুষছো কেন? আর তোমাকে বিরক্ত করতে আমরা আসব না। আমরা চলে গেলে তুমি বোধ হয় শান্ত হবে।

ক্যাথি ওর উপর ঝুঁকে পড়ে বিষাদিত দৃষ্টি মেলে বললে, সত্যিই চলে যাব লিণ্টন? তুমি কি আমাকে যেতে বল?

ও বললে, যা হয়ে গেছে, তা তো আর বদলান যাবে না। অবশ্য হাঁ তোমরা এর চেয়েও একটা কিছু বাড়াবাড়ি করতে পার বটে!

ক্যাথি আবার শুধালো, তাহলে কি চলে যাব?

ও বললে, একটু একা থাকতে দাও গো! তোমার কথা সইতে পারবো না।

ক্যাথি রয়ে গেল, কিন্তু খুদে লিণ্টন একবার ওর দিকে তাকালে না, একটি কথা বললেনা। অবশেষে ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল, আমি পেছনে। পেছনে চীৎকার শুনে আবার ফিরে তাকালাম। খুদে লিণ্টন চেয়ার থেকে উলটে পড়ে গেছে মেঝেয়—গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ওকে আমি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ক্যাথিকে বললাম, ক্যাথি এবার চল। ওর কোনো উপকারেই তুমি আসবে না। তোমার প্রেমে যে ওর এই হাল হয়েছে তা নয়। চলে এস।

কিন্তু ক্যাথি ওর মাথার বালিশটা ঠিক করে দিলে, জল দিতে চাইলে। কিন্তু ছেলেটা পাথর বা কাঠের টুকরোর মতো পড়ে রইল।

শুধু একবার বললে, বালিশটা তো তেমন উচু নয়। ক্যাথি আর একটা বালিশ এনে উঁচু করে দিলে।

এটা তো বেশি উচু হয়ে গেল?

কি করে তাহলে দেব? ক্যাথি হতাশ হয়ে বললে।

এবার খুদে লিণ্টন ক্যাথির কাঁধের উপর ভর দিয়ে রইল।

আমি বললাম, ওভাবে ও কতক্ষণ থাকবে? বালিশে ভর দিয়েই তোমাকে খুশি থাকতে হবে। আমাদের খুদে মনিবানীটি এমনিই তোমার পিছনে অনেক সময় দিয়ে ফেলেছেন; আর পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারবো না।

ক্যাথি অমনি বলে উঠলো, হাঁ, পারবো ! ও কেমন শান্ত আছে দেখছ তো। ও এখন বুঝতে পারছে, ওর চেয়ে আমার দুঃখ আজ রাতে বেশি বই কম হবে না ! আমি এলে ওর যদি অসুখ বাড়ে, তাহলে আর আসবো না।

খুদে লিণ্টন উত্তর দিলে, তুমি আসবে, আমাকে আরাম করে দেবে ! আমাকে ব্যথা দিয়েছ, তাই তোমাকে আসতেই হবে। তুমি আসার আগে এত অসুস্থ আমি ছিলাম না।

কিন্তু নিজে কেঁদেকেটেই তো এই অনর্থ করলে ?

না, আমি করিনি ; করেছ তুমি। কিন্তু এখন তো আমাদের ভাব। তুমি আমার কাছে আসবে—আসবে তো ? কালই আসতে হবে।

না, কাল তো আসবেই না, বলে উঠলাম। তার পরের দিনও না।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বললাম, মনে রেখো, কাল কিন্তু এখানে আসতে পাবে না।

ও হাসলো। তুমি নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে ভাবছ, না !

আবার বললাম, আমি আসতে দেব না। পার্কের ঐ তালাটা সারিয়ে নেব, তুমি আর কিছুতেই পালাতে পারবে না।

ও হেসে বললে, দেখো এলেন, আমি লাফিয়ে পার হয়ে যাব দেয়াল ! কিন্তু গ্রেঞ্জটা তো আর জেলখানা নয়, তুমিও আমার জেলার নও। তাছাড়া বয়েস তো প্রায় সতেরো হোল। আমি এখন ছেলেমানুষ নই। আমি যদি ওর সেবা করি লিণ্টন তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে, ওর চেয়ে আমি তো বড়, আমার বুদ্ধিও বেশি—ওর চেয়ে ছেলেমানুষও আমি নই। ওকে আদরে আবদারে আমি ঠিক কথা শুনতে বাধ্য করবো। দেখো—ক'দিন পরে আর আমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে না। ওকে তোমার ভাল লাগে না এলেন ?

ওকে ভাল লাগবে ! চেঁচিয়ে উঠলাম, তবু ভাল যে ওর যা শরীর বিশটি বছরও টিকবে না ! আসছে বসন্ত অবধি টেঁকে কিনা সন্দেহ। আর ও গেলে পরিবারের কোনো ক্ষতিই হবে না। আমাদেরও ভালই হয়েছে, ওকে ওর বাবা নিয়ে এসেছে ; যত ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা যেত, ততো

ওর জ্বালাতন আর স্বার্থপরতা বাড়তো। ক্যাথি, ওর বৌ হবার যে তোমার সম্ভাবনা নেই—এতে আমার আনন্দই হচ্ছে।

আমার সঙ্গীটি তো কথা শুনে চটেই উঠলো।

ও বললে, ও আমার চেয়ে ছোট—ওর আমার চেয়ে বেশি দিনই বাঁচা উচিত। আমার সমান ও বাঁচুক। ওর শরীর তো এখন সেরেছে। শুধু ঠাণ্ডায়ই যা ওর ভয়। তুমি না বল, বাপি সেরে উঠবেন। ও কেন সেরে উঠবে না বল!

বললাম, যাই হোক, ওয়াদারিং হাইটস্‌-এ আর আসতে চেষ্টা করো না বাপু। আমি মনিবকে সবকথা বলবো। উনি যদি না বলেন, তাহলে আর দেখাশোনা চলবে না।

এতদিন তো বন্ধ ছিল, ক্যাথি বললে, আবার চলেছে যখন—তখন চলতেই হবে। বেশ তো, দেখা যাবে।

আমরা খাওয়ার আগে এসে গেলাম। বড় ক্লান্তি লাগছিল। ক্যাথি বাপের ঘর থেকেই আমার কাছে এল। ওর মুখে দেখলাম যেন নতুন দীপ্তি এসেছে।

চব্বিশ

অসুখ করেছিল। তিন সপ্তাহ নিজের কামরা ছেড়ে নড়তে পারি নি। সেদিন সন্ধ্যেয় বসেছিলাম, এমন সময় ক্যাথি এল। ওকে কিছু পড়তে বললাম। ও আমাকে নিয়ে এল লাইব্রেরী ঘরে। মনিব তখন শুতে গেছেন; ও রাজি হোল। ওর প্রিয় গ্রন্থকারের একখানা বই নিয়ে আসতে বললাম।

ও বললে, এলেন, তুমি ক্লান্ত। তার চেয়ে শুয়ে থাক না! এতক্ষণ জেগে থাকলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।

না, না, আমি ক্লান্ত হই নি।

ও এবার নিজেই হাই তুলে বললে, এলেন, আমি নিজেই ক্লান্ত।

তাহলে বই রাখ, এস গল্প করি!

সেটা ওর পক্ষে বুঝি আরো খুবই খারাপ হোল। ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বারে বারে হাতের ঘড়ি দেখতে লাগলো। শেষে নিজের ঘরে চলে গেল। পরের রাতে ওকে আরো চঞ্চল দেখলাম। তৃতীয় রাতে মাথা ধরার অজুহাতে ও আমার কাছ থেকে বিদায় নিল! বড়ই অদ্ভুত লাগলো ওর ব্যবহার। আমি নিজেই ওর খোঁজে গেলাম। কিন্তু উপরে তো নেই। দাসীরা বললে, ওরা ওকে দেখেনি। মিঃ এড্‌গারের কামরার কাছে গিয়ে কান পেতে রইলাম। সব চুপচাপ! আবার ওর ঘরে ফিরে এসে জানালার ধারে বসলাম।

জ্যোৎস্না রাত, উজ্জ্বল চাঁদ আকাশে! মাটিতে এখনো তুষারের লেশ লেগে লেগে আছে। হঠাৎ মন হোল, ও হয় তো বাগানে গেছে। কাকে যেন দেখতেও পেলাম। কিন্তু আমার খুদে মনিবানী তো নয়। আলোয় আসতে দেখলাম, আমাদেরই এক সহিস। ও মনিবানীর টাট্টু নিয়ে এল। নিঃশব্দে সে চলে গেল আস্তাবলে। ক্যাথি ফিরে এল জানালা দিয়ে বসবার ঘরে, তার পরে নিঃশব্দে নিজের ঘরে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তুষারমাখা জুতো খুলে ফেললে, টুপীটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লো। আমার গোয়েন্দাগিরি ও লক্ষ্য করেনি। এবার আমি উঠে আত্মপ্রকাশ করলাম। ও পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল; একটা অস্ফুট চীৎকার বেরিয়ে এল ওর ঠোঁট চিরে।

ওকে ভৎর্সনা করেই বললাম, ক্যাথি, ঘোড়ায় চড়ে কোথায় গিছলে এত রাতে? আর আমাকে মিছে কথাই বা বললে কেন? বল, কোথায় গিছলে!

পার্কে। ও দ্বিধাভরে বললে, আমি তো তোমাকে মিছে কথা বলি নি। আর কোথাও যাওনি!

না।

ক্যাথি, তুমি জান না কি অন্যায় করেছ। তা না হলে মিছে কথা বলতে না। এতে আমার দুঃখ আরো বেশী। তোমার কাছ থেকে মিছে কথা শোনার চেয়ে আমি তিনমাস বিছানায় পড়ে রইলাম না কেন!

ও ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। বললে, এলেন, তোমাকে চটাতে আমার ভারী ভয়। তুমি আমার উপর রাগ কোর না! তোমাকে সব কথাই বলব, আমি তো লুকিয়ে রাখতে চাই না। আমার ঘৃণা হয়।

আমরা জানালার ধারে এসে বসলাম। ওকে জানিয়ে দিলাম, আমি গালাগালি দেব না। ওর গোপন কথা যাই হোক না কেন আমি ধৈর্য ধরে শুনবো।

এলেন, আমি ওয়াদারিং হাইটস্-এ গিছলাম। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ার পর রোজই তো যেতাম। ওই সইসটিকেও আমি বলে কয়ে রাজি করিয়েছি—ওকে তুমি গাল দিও না। আমি হাইটস্-এ সাড়ে ছটায় যেতাম, আর আটটা সাড়ে-আটটা অবধি থাকতাম। তারপরে ফিরতাম বাড়ি। আমার নিজের আনন্দে আমি যাইনি। আমার তো মনে সুখ নেই। শুধু হপ্তায় এক-আধদিন আমার মনে সুখ থাকে। প্রথমে তো ভেবেছিলাম, তোমাকে বোঝানো যাবে না—আমার যাওয়াও হবে না। তুমি অসুখে পড়লে, এদিকে আমি সইসের কাছ থেকে চাবি যোগাড় করলাম। ওকে অনেক করে বললাম, আমার ভাই অসুস্থ, আমাকে দেখতে চায়; বাবাকে বললে তিনি যেতে দেবেন না। তারপরে ঠাট্টু ঘোড়ার বন্দোবস্ত করলাম। ও বই পড়তে ভালবাসে—ওকে বই ঘুষ দিয়ে তবে কাজ হাসিল করেছি।

প্রথম দিন গিয়ে দেখলাম লিণ্টন বেশ ভালই আছে, ওর মনটাও খুশি। জিলা আমাদের বললে, জোসেফ বাইরে, হেয়ারটন গেছে কুকুর নিয়ে পাখী শিকারে। এখন আমাদেরই রাজত্ব। আমাকে কিছু খাবার এনে দিলে। লিণ্টন আরাম কেদারায় বসেছিল, আর আমি দোলনা-চেয়ারে। হাসি আর

কত কথা! বসন্তকালে কোথায় যাব, কি করবো—তোমাকে ওসব বলে তো লাভ নেই—তুমি বাজে বলে উড়িয়ে দেবে।

একবার তো আবার কথা কাটাকাটি শুরু হোল। ও বললে, জুলাইয়ের সন্ধ্যাটা জলার ধারে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিতে বেশ লাগে। তখন মৌমাছিরা গুন গুন করে ফুলে ফুলে, স্বপ্নের মতো সেই গুনগুনানি ছেয়ে যায় নীরবতায়; আর চাতক উড়ে যায় নীল আকাশে, নির্মেঘ আকাশ সূর্যাস্তের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। ও যে সুখ-স্বর্গের কল্পনা করে সে তো সেইখানে—সেইখানে। কিন্তু আমার স্বর্গ তো সেখানে নয়। যেখানে সবুজ পাতার ঝালর কাঁপে, পশ্চিমের বাতাস বয়, উজ্জ্বল, শুভ্র মেঘ আকাশের শিয়রে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। শুধু চাতক নয়, কোকিল, লিনেট আর ময়ূর যেখানে গান গেয়ে ওঠে। জলাও সেখানে দেখা যাবে কিন্তু সে জলায় তো তখন নরম অন্ধকারের ছায়া—তার ধারে ধারে দীর্ঘ ঘাসগুলি সবুজ তরঙ্গ তুলবে হাওয়ায়, আর থাকবে বন, আর কলনাদী জলধারা। সমস্ত পৃথিবী তো তখন জাগ্রত, আনন্দের উন্মাদনায় উন্মাদ। কিন্তু ও তো শুয়ে থাকতে চায় সেই স্বর্গে—আর আমি চাই নৃত্য করতে, প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে। তাই ওকে বললাম, ওর স্বর্গ তো নিষ্প্রাণ; আর আমারটাকে ও উন্মাদের স্বর্গ বলে গাল দিলে। বললাম, ওর ঐ স্বর্গে গিয়ে তো আমি আধ-মরা হয়ে থাকবো। ও পাল্টা জবাব দিলে, আমার স্বর্গে গিয়ে ওর শ্বাসরোধ হবে। এবার চটে উঠলো। তারপরে দুজনেই একে অপরের স্বর্গে গিয়ে পরখ করে দেখতে রাজি হলাম। আমরা আবার হলাম বন্ধু।

ঘণ্টাখানেক আরো কেটে গেল, মস্ত ঘরটার দিকে তাকালাম। মেঝের নেই কার্পেট—মসৃণ মেঝে। মনে হল, যদি টেবিলটাকে সরিয়ে দিই—তাহলে তো বেশ কানামাছি খেলা যাবে। লিণ্টনকে বললাম, সে জিলাকে ডাকুক—আমরা তিনজনে মিলে কানামাছি খেলব; ও আমাদের ছোঁবার চেষ্টা করবে। এলেন তুমিও তো অমনি করতে। ও রাজি হল না; ও বললে, ওতে আনন্দ নেই। তার চেয়ে বল খেলা ভাল। তাকে গাদা করা

জিনিসের ভিতরে পেলাম দুটো বল। একটায় সি আর একটায় এইচ্ লেখা। আমার এই 'সি'টা চাই—আমার নামের আদি অক্ষর, আর এইচটা তো হিথক্লিফেরই নাম। কিন্তু বলের ভিতরে থেকে খানিকটা কি সব বেরিয়ে পড়েছে তাই ওর পছন্দ হল না। যাহোক খেলা চললো। আর ও হেরে গেল। ও আবার কাসতে কাসতে চেয়ারে গিয়ে এলিয়ে পড়লো। তারপরে ওকে গান শোনালাম—ও এবার খুশি হয়ে উঠলো। যখন চলে আসি, ও বারবার বললে, তারপরের দিন আসতে। আমিও কথা দিলাম। মিনির পিঠে চড়ে ফিরে এলাম। আর সারারাত ধরে দেখলাম ওয়াদারিং হাইটস্-এর স্বপ্ন।

পরদিনটা বড় খারাপ কাটলো। তোমারও খুব জ্বর; আবার বাবাকে তো বলাই যায় না। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই জ্যোৎস্নার যেন ফিনিক ফুটলো। আমি মিনির পিঠে চড়ে বসলাম। মনের বিষাদ কেটে গেল। ওদের বাড়ির বাগানে এসে যখন পৌছলাম, তখন হেয়ারটনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও মিনির কাঁধ চাপড়ে দিল। আমাকে নিয়ে ও ভিতরে আসতে আসতে ঐ লেখাটার দিকে তাকিয়ে বললে, মিস ক্যাথেরিন! এখন আমি পড়তে পারি।

ভাল কথা—তুমি তাহলে অনেক চালাক হয়েছ।

ও বানান করে করে নামটা পড়লো—হেয়ারটন আর্ণ-শ।

আর ঐ সাল! ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম।

না—এখনো অতো শিখিনি!

নির্বোধ কোথাকার! আমি হেসে উঠলাম।

নির্বোধটা মুখ বিকৃত করলো, ওর ভ্রূতে ঘনিয়ে এল অন্ধকার; ও ভাবতে পারছে না—আমার সঙ্গে ও হেসে উঠবে কিনা। ওর সন্দেহ নিরসন করে দিলাম। গম্ভীর হয়ে বললাম, ও যেতে পারে। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি—এসেছি লিন্টনের সঙ্গে দেখা করতে। ও লাল হয়ে উঠলো—চাঁদের আলোতে দেখতে পেলাম। যেন আহতগর্বের প্রতিচ্ছবি। আহা, ও যদি

লিণ্টনের মতো হোত! কিন্তু ও যে বানান করে নিজের নামটাই পড়তে শিখেছে—ও যে একেবারে অনুপযুক্ত!

বাধা দিয়ে বললাম, তুমি থামতো ক্যাথি—তোমাকে আর বলতে হবে না! আমি গালমন্দ করবো না, কিন্তু তোমার এই ব্যবহারটা ভাল ঠেকেনি। হেয়ারটন ঐ খুদে লিণ্টনেরই মতো তোমার ভাই। ও যে খুদে লিণ্টনের মতো শিক্ষিত হতে চায়—এইটেই তো প্রশংসা করবার মতো জিনিস! বানান করে পড়ছিল বলে তুমি হেসে উঠলে! এ তো তোমার ভাল শিক্ষার পরিচয় নয়। ওর মতো যদি মানুষ হয়ে উঠতে, তোমারও কি এই রুচিজ্ঞান থাকতো! ও ছেলেবেলায় তোমারই মতো বুদ্ধিমান ছিল। ঐ শয়তান হিথক্লিফই ওর ঐ দশা করেছে।

ও অবাক হয়ে বললে, এলেন, তুমি যে ক্ষেপে গেলে? যাক গে ওকথা, ঘরে ঢুকে দেখি—লিণ্টন শুয়ে আছে। আমাকে দেখে উঠে বসলো।

ও বললে, ক্যাথি, আজ আমি অসুস্থ, আজ তুমিই কথা বলবে, আমি শুধু শুনবো। এস, আমার পাশে বোস। তুমি নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখবে, আবার আসবে আমার কাছে।

বুঝলাম, ওকে আজ আর ঘাটানো ঠিক হবে না। ও অসুস্থ। আমি আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলাম। প্রশ্ন করলাম না, ওকে বিরক্তও করলাম না। আমার নিজের থেকে বেছে কয়েকখানা ভাল বই এনেছিলাম—তার থেকে ও পড়ে শোনাতে বললে। পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় হেয়ারটন দরজা ঠেলে এসে ঢুকলো। ও এসেই লিণ্টনকে হাত ধরে টেনে তুললে।

ও বলে উঠলো, যাও—নিজের ঘরে যাও! যদি দরকার থাকে তো ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও! যাও, দূর হও!

ও গাল দিয়ে উঠলো, লিণ্টনকে উত্তর দেবার কোনো সময় দিলে না। একরকম ঠেলেই বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করলে। এবার হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। দেখি, জোসেফ হাসছে রান্না ঘরে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে।

আচ্ছা হয়েছে গো—আচ্ছা হয়েছে!

লিণ্টনকে জিজ্ঞেস করলাম, এবার আমরা কোথায় গিয়ে বসবো।

লিণ্টন কাঁপছে, ফ্যাকাশে মেরে গেছে! ওকে ভীষণ বিশ্রী দেখাচ্ছিল এলেন। ওর শীর্ণ মুখখানা, ওর ঐ বড় বড় চোখ যেন নিষ্ফল ক্রোধে বিকৃত। ও দরজার হাতল ধরে ঠেলতে লাগলো, কিন্তু তখন ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

আমাকে ঢুকতে দাও—দরজা খোল! না খুললে খুন করে ফেলবো! শয়তান, শয়তান!

জোসেফ আবার হেসে উঠলো।

হাঁ, হাঁ, যত খুশি গাল পাড়—ভয় নেই—ও তো দরজা বন্ধ করে আছে।

আমি হেয়ারটনকে টেনে নিয়ে আসতে চাইলাম, কিন্তু ও এমন চীৎকার জুড়ে দিলে যে আনে কার সাধ্য! তারপরেই কাসির দমক; রক্ত উঠছে মুখে! জিল্লাকে চেঁচিয়ে ডাকলাম। ও চীৎকার শুনতে পেল। দুধ দোহাচ্ছিল মেয়েটা, সেখান থেকে ছুটে এল। আমার তখন বুঝিয়ে বলার সময় নেই। ওকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে এলাম। হেয়ারটনও ছুটে এল। সে এসে ওকে উপরে নিয়ে গেল। জিল্লা আর আমি ওর পিছনে পিছনে এলাম; কিন্তু ও আমাকে সিঁড়ির গোড়ায় থামিয়ে দিয়ে বললে, আমাকে ভিতরে যেতে সে দেবে না। আমার এখন বাড়ি যাওয়াই উচিত। ওকে চেঁচিয়ে উঠে বললাম, ও লিণ্টনকে খুন করেছে, আমি এবার ঢুকবই। ওরা আমাকে নীচে নিয়ে গেল।

এলেন, তখন চুল ছিঁড়ি এমনি আমার দশা! আমি ফোঁপাতে লাগলাম, চোখ দিয়ে এত জল ঝরছিল যে অন্ধ হয়ে গেলাম। কিন্তু হেয়ারটনটা তখনো বললে, সম্পূর্ণ আমার দোষে এই কাণ্ডটা ঘটেছে। শেষে যখন শাসালাম, আমার হাকিম বাবা ওকে জেলে পুরবেন, ফাঁসি দেবেন, তখন ও ছুটে পালালো। কিন্তু তখনো কি বাপু রেহাই আছে! শেষে তো বাধ্য হয়ে চললাম বাড়ি ফিরে। ও পথের ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আমার টাট্টু ঘোড়ার লাগাম ধরলে।

মিস ক্যাথি, ও বলে উঠলো।

চাবুক তুলে মারলাম ওকে এক ঘা। ভয় পেলাম—ও আমাকে খুন করবে নাকি। ও আবার গালাগাল দিয়ে উঠলো। 'আর আমি জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

সেদিন আর রাতে তোমার কাছে আসিনি: আর পরদিন যাইও নি। কিন্তু শুধু মনে হচ্ছিল, লিণ্টন যদি না বাঁচে! আবার হেয়ারটনের কথা মনে পড়েও ভয়ে শিউরে উঠছিলাম। তিনদিনের দিন আমার সাহস বাড়লো। ছুটে চললাম। পাঁচটায় বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

ভাবলাম হয়তো সবার অলক্ষ্যে লিণ্টনের ঘরে চলে যেতে পারবো, কিন্তু কুকুরগুলো ডেকে উঠলো। জিল্লা ছুটে এসে বললে, লিণ্টন এখন ভালই আছে। ও আমাকে ছোট একখানা কামরায় নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি লিণ্টন সোফায় শুয়ে আমারই দেওয়া একখানা বই পড়ছে। কিন্তু ও ঘণ্টাখানেক আমার সঙ্গে কথাই বললে না, বা একটিবার ফিরেও তাকালো না। এমনই তখন ওর মেজাজ। যখন মুখ খুললে, সেও আমাকেই দুষতে। বললে, সেদিনকার ঘটনার জন্যে আমিই না কি দায়ী, হেয়ারটন নয়! আমি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ও অস্ফুট স্বরে ডাকলো, ক্যাথি! কিন্তু আমি ফিরেও তাকালাম না। তারপরের দিনটা আমি বাড়িতে কাটালাম। কিন্তু শুতে বসতে ওর কথাই মনে পড়তে লাগলো। মাইকেল্ এসে বললে, মিনিকে তৈরী করে রাখবে কি না। শেষে বলেই ফেললাম, হাঁ তৈরী কর। টিলার উপর দিয়ে যেতে যেতে মনে হোল আমি আমার কর্তব্য করতে যাচ্ছি।

আজকে জিল্লাই আমাকে প্রথম দেখতে পেল। বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। হেয়ারটন ঘরে ছিল, আমাকে দেখেই চলে গেল। লিণ্টন তখন আরাম কেদারায় আধ-ঘুমে। ওর কাছে গিয়ে বললাম,

লিণ্টন, তুমি যখন ভাবছ আমি তোমাকে ভালবাসি না, শুধু আঘাত করতেই ছুটে আসি, তাই আর দেখা করতে আসবো না বলে ঠিক করেছি। এই আমাদের শেষ দেখা। আমরা বিদায় নেব। মিঃ হিথক্লিফকে জানিয়ে

দিও, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখার তোমার ইচ্ছে নেই, তাঁকেও আর মিথ্যে গল্প সৃষ্টি করতে হবে না।

ও বললে, ক্যাথি তুমি টুপীটা খুলে বোস! তুমি তো আমার চেয়ে ঢের ভাল আছ। বাবা আমার দোষত্রুটি নিয়েই ব্যস্ত, গালও দেন। তাই ভাবি, আমি কি সত্যই এত অপদার্থ? ভেবে ভেবে সবার উপরে চটে উঠি। আমি খারাপ, আমার সঙ্গে আর তুমি দেখা নাই করলে। আপদের হাত থেকে তুমি তো নিষ্কৃতিই পাবে। শুধু একটা ভিক্ষা ক্যাথি, আমার উপর একটু সুবিচার কোরো! তোমার মায়াদয়া একটুখানি পেলে আমি তো ভাল হতে পারি। আমি তো তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার মন্দ স্বভাবের জন্য অনুতাপ করি, আর এই অনুতাপের জের চলবে আমার মৃত্যুর দিন অবধি।

মনে হোল, ও সত্যি কথাই বলছে, তাই ওকে ক্ষমা করলাম। আমাদের আবার ভাব হয়ে গেল। কিন্তু মনে তো শান্তি পেলাম না। আবার ঝগড়া শুরু হোল। দুজনেই কাঁদলাম। ও ঘোর স্বার্থপর, ওর মনে আছে ঈর্ষা, ঘৃণা। স্বার্থপরতা সহ্য হয়, কিন্তু ঈর্ষা আর ঘৃণা কি করে সহ্য করবো? মিঃ হিথক্লিফ তো এখন আমাকে এড়িয়ে চলেন। ওঁকে দেখা যায় না। এই তো গত রোববার, উনি লিন্টনকে কেন যেন ধমকাচ্ছিলেন, আমি গিয়ে তখনই হাজির। উনি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন। এলেন, তুমি তো সবই শুনলে। আমি তো ওখানে না গিয়ে পারিনি। কিন্তু তুমি বাবাকে কিছু বোল না—বলতে পাবে না!

উত্তর দিলাম কাল আমি সেকথা ভাববো। ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

মনিবের কাছে সমস্ত ঘটনাই বললাম। মিঃ লিন্টন ভয় পেলেন। পরদিন ভোরে ক্যাথি জানতে পারলো আমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি! গোপন দেখাশুনার পর্ব তার সাঙ্গ হোল। ও কাঁদলো, আদেশের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠলো; বাবাকে বারবার বললে, লিন্টনের প্রতি করুণা করতে। শুধু একমাত্র সান্ত্বনা পেলে যে, তিনি ওকে চিঠি লিখে গ্রেঞ্জে আনাবার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু ওয়াদারিং হাইটস্-এ ক্যাথির আর যাওয়া চলবে না।

পঁচিশ

এখনো মনিবের খুদে লিণ্টনের প্রতি স্নেহ আছে। তিনি আমাকে ক'দিন পরে বললেন, এলেন, আমার ভাগ্নে যদি চিঠি লেখে বা এখানে আসে তাতে আমার আপত্তি নেই। ওকে তোমার কেমন মনে হয়? ও কি একটু সেরেছে, বয়েস হলে কি ওর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হবে?

বললাম স্বাস্থ্য তো বড়ই খারাপ। তবে বাপের মতো ও কখনো হবে না! আর একটা কথা কর্তা, ক্যাথির যদি ওকে বিয়ে করার দুর্ভাগ্য হয়, তাহলে ও তো ক্যাথির হুকুমে ওঠবস্ করবে। অবশ্য বেশী আদর দিলে সে আলাদা কথা। যাহোক, এখনো তো ঢের সময় আছে ভেবে দেখুন ক্যাথির ও উপযুক্ত কি না। ওর যা বয়েস—তাতে এখনো চার বছর অপেক্ষা করতে হবে।

মিঃ লিণ্টন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে তাকালেন। কুয়াশাময় অপরাহ্ণ। ফেব্রুয়ারী সূর্যের স্তিমিত বিবর্ণ আলো। উঠোনের দুটো ফার গাছ আর দুরে কবরখানায় প্রস্তর ফলক আবছা দেখা যায়।

উনি যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, আমি এইটাই আশা করছিলাম, কিন্তু যতই দিন ঘনিয়ে আসছে, ততই ভয় পাচ্ছি। আর ক'দিন পরে হয়তো ঐ গোরস্থানে আমাকে যেতে হবে। ওখানে যাবার কথা তো ভাবি। ওর মার ঐ কবরের পাশে আমি শুয়ে থাকবো। কেটে যাবে দিন···দিনের পর দিন। কিন্তু ক্যাথি? ওকে কি করে ছেড়ে যাব? লিণ্টন যে হিথক্লিফের ছেলে, ও যে আমার কাছ থেকে ক্যাথিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তার জন্যে তো ভাবি না—কিন্তু আমাকে হারিয়ে যে ক্ষতি হবে—সে ক্ষতি কি সে পূরণ করতে পারবে? হিথক্লিফের স্বার্থসিদ্ধ হবে, আমার শেষ সম্বল কেড়ে নেবে—তাও আমি ভাবি না! কিন্তু লিণ্টন যদি ওর অনুপযুক্ত হয়—যদি ওর বাবার হাতের অক্ষম পুতুল হয়—তাহলে আমি ক্যাথিকে ওর হাতে সঁপে দিতে পারব না।

এতে যদি তরুণ মন দলে-পিষে যায়, তবু তো তাই করতে হবে। আমি যতদিন বাঁচবো ও মনমরা হয়ে জীবন কাটাবে, আমার মৃত্যুর পরে কাটাবে নিঃসঙ্গ জীবন।

বললাম ভগবান না করুন, আপনার যদি কিছু হয়—আমি ওর বন্ধু হয়ে ওর পাশে পাশে থাকবো। ক্যাথি ভাল মেয়ে। ও বয়ে যাবে না, ওকে বয়ে যেতে দেব না!

বসন্ত এল। কিন্তু মনিব তখনো দুর্বল। তবু মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন, ওর সতেরো বছরের জন্মদিনে উনি গীর্জায় গেলেন না। সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছিল। ওঁকে বললাম, আজ নিশ্চয়ই আপনি বেরুবেন না।

না, এবার আর হোল না।

আবার লিণ্টনকে আসার জন্যে চিঠি লিখলেন। খবর এল, হিথক্লিফের অনুমতি নেই। তবে হয়তো বেড়াতে বেরুলে তার সঙ্গে দেখাও হতে পারে।

উনি বললেন ও লিখেছে—ক্যাথি এখানে আসুক তা আমি চাইনে। আমার বাবার নিষেধ আমিও তো ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবো না। আপনি ওকে সঙ্গে করে যদি কখনো হাইটসের দিকে আসেন তো দেখা হবে। বাবা তো বলেন, আমি বাবার চেয়ে মামার ধারা পেয়েছি বেশী। আমি ক্যাথির অনুপযুক্ত কিন্তু সে তো সব জেনেই আমাকে ক্ষমা করেছে। আপনিও ক্ষমা করবেন। আমার স্বাস্থ্যের খবর জানতে চেয়েছেন—ভালই আছি। কিন্তু সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে একা কি করে ভাল থাকবো?

এডগার লিণ্টন ছেলেটিকে ভালবাসেন—তবু তার প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পারলেন না। ক্যাথির সঙ্গে যাবার তখন তাঁর শক্তি নেই। তিনি জানালেন, এখন তাঁর পক্ষে বেড়াতে বেরুনো সম্ভব নয়। চিঠিপত্র চলতে পারে। লিণ্টন তাই মেনে নিলে। কিন্তু ওর বাবা যদি নজর না দিতেন, চিঠি ওর অভিযোগ আর আর্তনাদে ভরে উঠতো। ও তাই সংযত হয়ে শুধু জানিয়ে গেল, ওরা শুধু

কর্তব্যের খাতিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এও জানালে যে, শীঘ্রই দেখা হওয়া দরকার, নইলে তো মিঃ লিণ্টনের প্রতিশ্রুতি শূন্যগর্ভ মনে হবে।

ক্যাথি তো আবার নাছোড়বন্দা। সে মনিবকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চাইলে সপ্তাহে একদিন আমার সঙ্গে সে জলার ধারে দেখা করতে যাবে। কিন্তু তখনো মনিব রাজি হলেন না।

ছাব্বিশ

বসন্তের প্রথম দিকটা কেটে গেল। এড্গার শেষে রাজি হলেন। আমরা বেরুলাম প্রথম সন্দর্শনে। গুমোট দিন। রোদ নেই, আকাশে মেঘে মেঘে ডোরাকাটা, আবছা। বৃষ্টিরও সম্ভাবনা নেই। আমাদের সাক্ষাতের স্থান দুই রাস্তার মুখে নিশান-পাথরের কাছে। সেখানে এসে হাজির হতেই একটি চাষীর ছেলে এসে বললে,

খুদে কর্তা তো এত দূরে আসতে নারবে গো, আপনাদের আর এট্টু এগিয়ে যেতে বললে।

আমি বললাম, লিণ্টন দেখছি তার প্রথম শর্ত ভঙ্গ করছে। আমার মনিবের হুকুম গ্রেঞ্জের থেকে আমরা বেশীদূর যাব না। আমরা তাহলে চললাম!

ক্যাথি বললে, ওর কাছে যাওয়া যাক, তারপর ঘোড়া ফিরিয়ে নিলেই হবে। ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসবে।

হাইটস্ থেকে মাইল খানিক দূরে ওর সঙ্গে দেখা হোল। দেখলাম ও ঘোড়া নিয়ে আসেনি, বাধ্য হয়ে নামতে হোল। ও বসেছিল, আমাদের দেখে উঠে দাঁড়াল। বিবর্ণ ওর মুখ, হাঁটছে টলতে টলতে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

মাষ্টার হিথক্লিফ, তোমার বেড়াতে বেরুনো উচিত হয়নি!

ক্যাথি ওকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, ওর আনন্দ তখন ভীতিতে রূপান্তরিত। ওর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সম্ভাবণ উদ্বিগ্ন প্রশ্ন হয়ে ঝরে পড়লো।

ও কাঁপতে-কাঁপতে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললে, না—ভাল আছি—ভাল আছি।

না না ভাল নেই, আগের চেয়েও তোমাকে খারাপ দেখছি! তুমি কত রোগা হয়ে গেছ!

ও তাড়াতাড়ি বললে, আমি বড় ক্লান্ত, চলতে আর পারি না, এস এখানে বসি! সকালবেলা তো আমার শরীরটা খুব খারাপ হয়।

ক্যাথি বসে পড়লো, ওর পাশে লিণ্টন।

ওকে একটু আনন্দ দেবার জন্যে ক্যাথি বললে, এই তো তোমার স্বর্গ। মনে আছে; সেই যে দুজনে আমরা স্বর্গের কথা নিয়ে ঝগড়া করেছিলাম। ঠিক এমনি ছিল তোমার স্বর্গ। শুধু এখানে আছে মেঘ—কিন্তু এ মেঘ তো নরম, কোমল মেঘ···সূর্যের আলোর চেয়েও একে ভাল লাগে। আসছে সপ্তাহে আমরা দুজনে গ্রেঞ্জের পার্কে যাব—সেখানে আমার স্বর্গ একবার দেখে আসবে।

লিণ্টনের মনে নেই সে কথা। সে যেন উদাসীন হয়ে গেল। ক্যাথি হতাশ। ও বুঝতে পারলে ওর এই সাহচর্য যেন ওর কাছে শাস্তি। ও বাধ্য হয়েই ফেরার কথা বললে। অপ্রত্যাশিতভাবে লিণ্টন অলসতা থেকে জেগে উঠলো। হাইটস্-এর দিকে ভীত দৃষ্টি ওর নিবদ্ধ। ও আমাদের কাছে অনুনয় বিনয় শুরু করলে আরো আধ ঘণ্টা যাতে আমরা থেকে যাই।

ক্যাথি বলে উঠলো, কিন্তু ঘরে গেলে ঢের আরাম পাবে। আমি তো তোমাকে এখানে গান, রূপকথা বা বক্ বক্ করে আর খুশি করতে পারবো না। এই ছমাসে তুমি ঢের জ্ঞানী হয়ে উঠেছ। আমার এই তুচ্ছ গল্প কি আর তোমার ভাল লাগবে! তোমাকে যদি আনন্দ দিতে পারতাম, তাহলে থাকতাম।

ও বললে, বোসো, বোসো! আমি অসুস্থ একথা বোলো না। এই গরমে এমনি হয়েছে। তোমরা আসার আগে অনেকটা হেঁটেছি। মামাকে বোলো, এখন একটু ভালই আছি!

লিণ্টন, তোমার কথাই আমি বলবো। কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি সুস্থ নও। ক্যাথির দৃষ্টি ওর দিকে নিবদ্ধ।

লিণ্টন আবার বললে, সামনের বৃহস্পতিবারে এস। মামাকে বোলো তিনি যে তোমাকে আসতে দিয়েছেন এর জন্য ধন্যবাদ। আর শোনো, যদি আমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়, আর উনি যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করেন—বোলো—আমি বোকার মতো চুপ করে থাকিনি, তোমার সঙ্গে কথা কয়েছি। তিনি তো শুনলে চটেই উঠবেন।

ক্যাথি চীৎকার করে উঠলো, আমি ওঁর রাগকে ভ্রূক্ষেপ করি না।

আমি তো করি।

আমি বললাম, উনি কি তোমার উপর কঠোর ব্যবহার করেন?

লিণ্টন আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। আরো মিনিটদশেক ও বসে রইল। ওর মাথা তখন ঝুলে পড়েছে বুকের উপর, মুখে অস্ফুট গোঙানি। ক্যাথি তখন বুনো জাম খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ও আমাকে এবার বললে, এলেন, আধ ঘণ্টা হোল। আর এখানে বসে থেকে কি হবে! ও তো ঘুমিয়ে গেছে, এদিকে বাবা আমাদের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

বললাম, ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে রেখে তো আর যাওয়া যায় না। ও আগে জেগে উঠুক। একটু সবুর কর। তুমি দেখছি এখন রওনা হতে পারলে বাঁচ। লিণ্টনকে দেখার সাধ কি এরই মধ্যে মিটলো।

ক্যাথি বললে, ওর এই দেখা করার সাধ কেন? আগে ও যখন চটতো, তখন ওকে ভাল লাগতো। কিন্তু এ কি অদ্ভুত ব্যবহার। এ যেন বাধ্য হয়ে দেখা করতে এসেছে—খালি ভয়—ওর বাবা রাগ করবেন। কিন্তু মিঃ হিথক্লিফকে খুশি করবার জন্য আমি তো আর আসবো না। লিণ্টন বেচারাকে এই দুঃসাধ্য তপস্যা করতে তিনি কেন পাঠিয়েছেন জানি না! ও ভাল হয়ে উঠেছে এইটুকু জেনেই আমি খুশি।

তোমার কি মনে হয় ওর শরীর একটু সেরেছে? আমি বললাম।

হাঁ। মোটামুটি ভাল নয়, বেশ সেরে গেছে।

আমি বললাম, এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার অমিল। আমার মনে হয়, শরীর ওর আরো খারাপ হয়েছে।

লিণ্টন এবার জেগে উঠলো। অবাক হয়ে চারদিকে তাকালো। সে জিজ্ঞেস করলে, কেউ তার নাম ধরে ডেকেছে কি না।

ক্যাথি জানালে, কেউ ডাকে নি, অবশ্য স্বপ্নে যদি ডাক শুনে থাক!

ও বললে, বাবার স্বর মনে হোল। সত্যি, কেউ ডাকে নি?

ক্যাথি বললে, সত্যি, সত্যি! আমি আর এলেন শুধু তোমার স্বাস্থ্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। গত শীতের চেয়ে এখন ভাল আছ তো লিণ্টন? কিন্তু একটা ব্যাপারে তুমি উদাসীন—আমার কথা তুমি আর ভাব না। তাই না?

লিণ্টনের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। ও উত্তর দিলে, হাঁ, আমি, আমি...

ক্যাথি উঠে পড়ে বললে, আজ আসি। তোমার কাছে লুকাব না—আমি বড় হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। একথা কাউকে বলবো না—বলা যায় না। কিন্তু মিঃ হিথক্লিফকে আমি ভয় করিনা। সে ভয়ে নয় লিণ্টন, সে ভয়ে নয়! এমনিই আমি বলবো না!

চুপ, চুপ, লিণ্টন অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, দোহাই তোমার! ঐ উনি আসছেন! ও ক্যাথির হাত চেপে ধরলো। কিন্তু ক্যাথি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে টাট্টু ঘোড়াটাকে শিস দিয়ে ডাকলে। পিঠে চড়ে বসে বললে।

আসছে বৃহস্পতিবার দেখা হবে! এলেন জলদি চল!

ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর বাপ আসবে, সেই ব্যাপারেই ও মগ্ন। বাড়ি ফেরার পথেই ক্যাথির এই অসন্তোষ গলে গেল, রূপান্তরিত হোল করুণায়—দুঃখে। ও তখন লিণ্টনের কথা ভাবছে। আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম, আসছে বারের সাক্ষাতে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ও ততদিন অপেক্ষা করুক। আমরা বাড়ি পৌঁছতেই মনিব আমাদের ডেকে পাঠালেন, খবর শুনবেন। আমরা বিশেষ কিছুই বললাম না। আমার কথা বলি, কি বলবো, কি বলবো না—বুঝে উঠতে পারলাম না।

সাতাশ

সাতদিন চলে গেল। এই সাতদিনে এড্‌গার লিণ্টনের অবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন হোল। আগে মাসে মাসে পরিবর্তন হোত, এখন ঘণ্টায়। ক্যাথি ওঁর শারীরিক এই অবস্থা বুঝেও বুঝতে চায় নি। কিন্তু এখন তো সেও আসন্ন দুর্ভাগ্যের আশংকায় অস্থির। তাই বৃহস্পতিবারের কথা সে বাপকে বলতে পারলে না। আমিই বলে অনুমতি নিলাম।

মনিবের এক ধারণা হয়েছে, ভাগনে তাঁরই মতো যখন দেখতে, তখন মনের দিক থেকেও হবে তাঁরই সামিল। আমি তাঁর এ ভুল শুধরে দিই নি। কি হবে তাঁর শেষ মুহূর্তগুলি বিস্বাদ করে দিয়ে!

বিকেল অবধি আমরা যাওয়া মুলতবী রাখলাম। বিকেল এল। স্বর্ণাভ আগস্টের বিকেল। পাহাড় থেকে ঝলকে ঝলকে আসছে হাওয়া—তাতে জীবনের চাঞ্চল্য আছে, জীবনদাত্রী শক্তি আছে। মনে হয়, মুমূর্ষুও বুঝি এ হাওয়ায় বেঁচে উঠবে। ক্যাথির মুখখানা যেন প্রকৃতিরই পটভূমি। ছায়া আর আলোর সেখানে লুকোচুরি খেলা চলছে। কিন্তু ছায়া যেন দীর্ঘস্থায়ী, আলো তো ক্ষণিকের।

আমরা দেখলাম, লিণ্টন সেই আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাথি নেমে পড়ে বললে, সে থাকবে কম সময়। আমি যেন আর না নামি। কিন্তু আমি নেমেই পড়লাম। ওকে চোখের আড়াল করতে আমি রাজি নই। দুজনেই ঢালু জায়গাটায় এগিয়ে এলাম। খুদে লিণ্টন একটু ঘটা করেই আমাদের অভ্যর্থনা করলে। তাতে প্রাণের প্রাচুর্য নেই, আনন্দের সাড়া নেই, আছে যেন ভীতির তাড়না।

তোমাদের বড় দেরী হয়ে গেছে। তোমার বাবা খুব অসুস্থ নন? আমি তো ভেবেছিলাম, তোমরা আর এলে না।

ক্যাথি সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে থেমে গেল। গলায় আটকে বুঝি গেল তার কথা, গিলেই বুঝি ফেললে কথাগুলো। তুমি সোজাসুজি কথা বলতে পার না লিণ্টন? এখুনি বল না কেন যে তোমাকে আমি চাই না। তুমি এই দ্বিতীয়বার কি আমাকে অকারণেই ডেকে আনলে—কষ্ট দিতেই কি ডেকে আনলে?

লিণ্টন কেঁপে উঠলো। ও যেন লজ্জিত, আবার কাকুতি-মিনতিতেও আনত। কিন্তু ক্যাথির তো ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো ওর এই রহস্যময় ব্যবহারে।

ও বললে, বাবা খুবই অসুস্থ। আমাকে তাঁর বিছানার কাছ থেকে কেন ডেকে আনলে বল তো? আমাকে বলে পাঠালে না কেন, তোমার কথা রাখতে হবে না। এস—আমার কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। খেলা আমি পছন্দ করি না। তোমার এই লীলাখেলার আমি পুতুল নই?

আমার লীলা-খেলা! ও বিড়বিড় করে বললে। ক্যাথি, দোহাই তোমার, তুমি রেগে যেও না! আমাকে যত খুশি ঘৃণা কর। আমি অপদার্থ, ভীরু, হতভাগ্য। আমাকে অবজ্ঞা করতেও তোমার লজ্জা হবে, আমি অতি হীন। কিন্তু ঘৃণা আমাকে কোরো না! আমার বাবাকে তুমি ঘৃণা কর।

ক্যাথি গর্জে উঠলো, কি বাজে বকছো! অতো কাঁপছ কেন? তোমাকে আমি ছোঁব না। যাও—দূর হয়ে যাও! আমি এবার বাড়ি ফিরবো। ছাড়—আমার পোষাক ছাড়! এলেন, ওকে বলে দাও—একি ওর ব্যবহার! নিজেকে আর ছোট কোরো না—ওঠ!

অশ্রুসিক্ত মুখে, ব্যাথাতুর বুকে লিণ্টন এলিয়ে পড়লো। ও কাঁপছে। কিন্তু এ তো ত্রাসের কম্পন।

ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ক্যাথি, ক্যাথি, আমি বিশ্বাসঘাতক। তোমাকে সে কথা বলতে পারবো না! জানি, আমি খুন হবো। আমার জীবন তোমার হাতে। তুমি না বলেছিলে তুমি আমাকে ভালবাস; যদি তুমি তাই বেসে থাক, তাহলে যেও না! ক্যাথি···ক্যাথি···তুমি যদি রাজি হও—

ক্যাথির ভিতরে আবার উথলে উঠলো সেই পুরনো ভালবাসা। ও জিজ্ঞেস করলে, কিসে রাজি হবো? এখানে থাকতে? আমাকে বল, এ অদ্ভুত কথার মানে কি? তাহলে আমি থাকবো! তুমি যে উলটো পালটা কথা বলছ, আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছ। শান্ত হও, সরল হও! তোমার মনে যত কথা চেপে বসেছে, সব নামিয়ে দাও। আমার ক্ষতি তুমি করবে না লিণ্টন—তা আমি জানি। কোন শত্রু আমার অনিষ্ট করতে চাইলে তুমি তা হতে দেবে না! তুমি নিজে ভীরু হলেও, বন্ধুকে বিকিয়ে দেবার মতো ভীরুতা তোমার দেখা দেবে না!

ও বললে, আমার বাবা শাসিয়েছেন—আমি তাঁকে ভয় করি—ভয় করি! না-না বলতে আমি পারব না! আমি পারব না!

ক্যাথি বিদ্রূপ করে উঠলো, থাক, থাক! তোমার গোপন কথা তোমার কাছেই থাক! আমি ভীরু নই জেনো। তুমি নিজেকেই বাঁচাও। আবার বলি, আমি ভীরু নই।

ক্যাথির নির্ভিকতায় ও মুগ্ধ, বিস্মিত। ঝরঝর করে ঝরছে অশ্রু। ওর হাতের উপর আবেগ ভরে চুমু খাচ্ছে, কাঁদছে, তবু কথা বলার সাহস নেই। এর তাৎপর্য কি তাই ভাবছিলাম। আমি যতক্ষণ আছি ক্যাথির তো কোনো ভয় নেই। হঠাৎ শব্দ শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখি হিথক্লিফ এসে হাজির। সে আমাকে সহজ স্বরেই বললে, নেলি, আমার বাড়ির এত কাছে যে তোমাকে দেখতে পাব ভাবি নি। গ্রেঞ্জে কেমন আছ তোমরা? শুনলাম এডগার লিণ্টন নাকি মৃত্যু শয্যায়। যত গুজব! বোধহয় লোকে বাড়িয়েই বলছে অসুখের কথা।

উত্তর দিলাম, না, মনিব মরতে বসেছেন। আমাদের পক্ষে যত দুঃখের হোক, উনি তো শান্তি পাবেন।

কতদিন টিকবেন? ও শুধালো।

বললাম, জানি না।

ও দুটি তরুণ তরুণীর দিকে তাকালে। লিণ্টন যেন মাথা তুলে তাকাতে

পারছে না। আর ও এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছে যে, ক্যাথিও নড়তে পারছে না।

হিথক্লিফ বললে, এই বাচ্চাটা আমাকে হার মানাবে দেখছি ; ওর মামা যে ওর আগেই যাচ্ছেন—ভালই বলতে হবে। ওকি ক্যাথির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি ?

ভাল ব্যবহার! উত্তর দিলাম, বরং কেঁদে ককিয়ে সারা হয়ে যাচ্ছে। এই টিলার উপরে ওর ভালবাসার মানুষের সঙ্গে থাকার চেয়ে ওকে এখন ঘরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারের হেপাজতে ছেড়ে দাও।

হিথক্লিফ বলে উঠলো, তাই দেব। এই লিণ্টন—ওঠ বলছি—ওঠ! অমনি করে মাটিতে পড়ে থেকো না! ওঠ!

লিণ্টন ভীত হয়ে উঠতে চেষ্টা করলে বারবার, আবার পড়েও গেল। গোঙাচ্ছে। হিথক্লিফ এগিয়ে এসে ওকে জোর করে টেনে তুললে।

শোন, আমি খুব চটে গেছি—হিথক্লিফ বলে উঠলো, ওঠ! ওঠ!

ও হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, বাবা, আমি উঠছি। কিন্তু আমাকে একটু একা থাকতে দাও গো, একা থাকতে দাও! তোমার কথা মতোই তো কাজ করেছি। ক্যাথিকে জিজ্ঞেস কর—ও বলবে আমি কত হাসিখুশি ছিলাম। ক্যাথি, আমার কাছে থাক! তোমার হাতখানা দাও।

ওর বাবা বললে, আমার হাত ধর! ওঠ! এই তো! এবার ক্যাথি তোমার হাত ধরবে। ওর দিকে মুখ তুলে তাকাও! ক্যাথি, এমন কাণ্ড করলাম, তুমি হয়তো ভাবছো আমি একটা আস্ত শয়তান, চল না, ওর সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত যাবে! ওকে আমি ছুঁলেই ও অমনি কেঁপে উঠবে।

ক্যাথি ফিস ফিস করে বললে, লিণ্টন, প্রিয় আমার, আমি তো ওয়াদারিং হাইটস্‌-এ যেতে পারব না। বাবার বারণ। অতো ভয় পাচ্ছ কেন? উনি তো তোমার কোনো ক্ষতি করবেন না!

ও উত্তর দিলে, আমি তো তোমাকে নিয়ে ছাড়া বাড়ি ঢুকতে পাব না!

ওর বাবা চীৎকার করে উঠলো, এই চোপরও! আমরা ক্যাথির বাবার

বারণ মেনে চলবো ! নেলি, ওকে ভিতরে নিয়ে এস। তোমার পরামর্শ মতো আর দেরী না করে ওকে এখুনি ডাক্তার দেখাতে হবে।

উত্তর দিলাম, দেখানোই তো ঠিক হবে। কিন্তু আমার এই খুদে মনিবানীকে ছেড়ে আমি তো কোথাও যাব না! তোমার ছেলের পরিচর্যা করা তো আমার কাজ নয়।

হিথক্লিফ বলে উঠলো, তোমার যে বাঁকা ঘাড় তা আমি জানি, তাহলে বাচ্চাটাকে একটু ধকলই সইতে হবে। ওহে আমার পুরুষ পুঙ্গব, এস! আমার সঙ্গে ফিরবে কিনা বল! আবার এগিয়ে এল হিথক্লিফ, মনে হোল ঐ ভঙ্গুর দেহটাকে সে এখুনি ঝাপটে ধরবে কিন্তু লিণ্টন তো ক্যাথিকে আঁকড়ে ধরলো। বারবার মিনতি করলো, ওর সঙ্গে যেতে হবে। এমন সে-আবেগ অস্বীকার করা তো যায় না। কিন্তু আমার তবু আপত্তি। কিন্তু বাধা দেওয়া হোল না। ও কি করে প্রত্যাখ্যান করবে সে মিনতি? কিসে ওর ভয় সেকথা কিন্তু জানা হোল না। কিন্তু ও যে ভীত সে কথা বুঝতে পারলাম না। মনে হোল এই ভয় যদি আরো বেড়ে যায়, ও চিরদিনের মতো হাবা হয়ে যাবে। উঠোনে এসে হাজির হলাম। ক্যাথি ওকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে পঙ্গুর জন্য ব্যবহৃত চেয়ারে বসিয়ে দিলে। আমি প্রতীক্ষায় রইলাম। ও এখুনি বেরিয়ে আসবে। হিথক্লিফ এসে ঠেলে দিয়ে বলে উঠলো, নেলি, আমার বাড়িতে কারো প্লেগ হয় নি। আজ আমি অতিথি বৎসল হয়ে উঠবো। রোসো-দরজাটা বন্ধ করে দিই।

ও দরজায় তালা চাবি বন্ধ করে দিলে। আমি চমকে উঠলাম।

ও বললে, বাড়ি যাবার আগে, চা খেয়ে যাবে। আমি একাই আছি। হেয়ারটন গরু নিয়ে মাঠে গেছে, জোসেফ আর জিলা ছুটি নিয়ে চলে গেছে। আছি একা আমি। এবার তোমাদের সঙ্গ পাব। ক্যাথি, তুমি ওর কাছে গিয়ে বস। আমার যা আছে তোমাকে দিয়েছি। উপহার অবশ্য তেমন কিছু নয়, কিন্তু এর বেশী তো আমার কাছে কিছু নেই। আমি লিণ্টনের কথাই বলছি। ও কি ক্যাথি, অমন করে তাকাচ্ছ কেন! ও হঠাৎ টেবিল চাপড়ে বলে

উঠলো, অমন করে তাকালে আমার ঘৃণা বেড়ে যায়, আমি ঘৃণা করি!

ক্যাথি ওর সব কথা শুনতে পায় নি। শেষ কথাটা শুনে বললে, আমি আপনাকে ভয় পাই না। ও কাছে এগিয়ে এল। ওর কালো চোখে ক্রোধ আর দৃঢ়সংকল্পের ছায়া। ওই চাবিটা আমাকে দিন! ওটা আমার চাই! আমি এখানে কিছু খাব না—উপোস করে থাকলেও খাব না।

হিথক্লিফের হাতের চাবিটা টেবিলের উপর রয়েছে। হিথক্লিফ মুখ তুলে তাকাল। ওর সাহস দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। বুঝি স্বর শুনে মনে পড়ছে ও যার কাছ থেকে পেয়েছে এমন সাহস—তার কথা। ক্যাথিও চাবিটা ছিনিয়ে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, হিথক্লিফের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু হিথক্লিফের বিস্ময়ের ঘোর শীঘ্রই কেটে গেল।

ও বললে, ক্যাথি, তুমি সরে দাঁড়াও, নয়তো তোমাকে আমি মেঝেয় পেড়ে ফেলতে বাধ্য হবো। নেলি তো পাগল হয়ে যাবে।

কিন্তু ও তো শুনলে না, ওর সেই বদ্ধ মুষ্টির উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে দাবি জানালে, চাবি চাই! আমাকে যেতে হবে। হিথক্লিফের ঐ লৌহদৃঢ় মাংসপেশী শিথিল করে দেবার জন্যে কি প্রচণ্ড ওর প্রচেষ্টা। ওর নখে হবে না ভেবে ও এবার দাঁতের সাহায্য নিলে। হিথক্লিফ আমার দিকে তাকাল। ক্যাথি তখন ব্যস্ত বলেই সে দৃষ্টি দেখতে পায় নি। হিথক্লিফ চাবিটা রেখে দিলে। কিন্তু ক্যাথির নিয়ে নেবার আগেই ওকে সিবলে নিজের হাঁটুর উপর টেনে নিয়ে এসে আর একখানা হাত দিয়ে ওর মাথায় অজস্র চড়-চাপড় বর্ষণ করতে লাগলো। ও-যদি পড়ে যেত তাহলে বুঝি হিথক্লিফের ভীতিপ্রদর্শন সফলই হোত। এই অত্যাচারে আমি ছুটে এলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, ওরে শয়তান! ওরে শয়তান! বুকের উপর এসে পড়লো ঘুষি। আমার তাকদ আছে—কিন্তু আমারও দম আটকে এল। টলতে টলতে গিয়ে ঠিকরে পড়লাম, মনে হোল বুঝি মূর্চ্ছা যাব। দু মিনিটে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। ক্যাথি মুক্তি পেয়েছে। ও কপালে হাত দিয়ে আছে। শর গাছের মতোই কাঁপছে,

টেবিলে ভর দিয়ে। একেবারে বিভ্রান্ত। চাবিটা পড়ে গিয়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে ঐ শয়তানটা বললে, কি করে ছেলেমেয়েদের শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি। যাও, এখন লিণ্টনের কাছে গিয়ে বসে বসে মনের সুখে কাঁদ! আমি কাল থেকে তোমার বাবা হবখন—ক'দিনের ভিতরে আমিই একমাত্র বাবা থাকবো—অন্য বাবার অস্তিত্বও থাকবে না। সইতে তোমাকে ঢের হবে। তা পারবেও। তুমি দুর্বল নও। আবার যদি অমন মেজাজ দেখি, রোজ এই দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করবো।

ক্যাথি লিণ্টনের কাছে গেল না। সে আমার কাছে ছুটে এসে কোলে মাথা গুঁজে কেঁদে উঠলো। খুদে লিণ্টন তো এক কোণে পড়ে আছে। হিথক্লিফ এবার উঠে নিজেই চা তৈরী করে নিলে। আমাকে এক পেয়ালা দিয়ে বললে, তোমার প্লীহাটা চা দিয়ে আচ্ছাসে ধুয়ে নাও! ভয় নেই; চায়ে বিষ নেই। আমি এবার তোমাদের ঘোড়ার খোঁজে চললাম!

ও চলে যেতে আমাদের প্রথম ভাবনা হোল, যে করে হোক পালাতে হবে। রান্নাঘরের দরজাটায় ধাক্কা মেরে দেখলাম, সেটা বাইরে থেকে বন্ধ। জানালার দিকে তাকালাম। বড় ছোট জানালা—ক্যাথিও সেখান দিয়ে গলে যেতে পারবে না।

আমরা বন্দী।

চেঁচিয়ে উঠলাম, লিণ্টন, তুমি তোমার বাবার কি ফন্দি জান—সত্যি করে বল—নইলে এখুনি ক্যাথিকে তোমার বাবা যেমনি করে মেরেছে, অমনি করে তোমাকেও মারবো।

ক্যাথিও বললে, লিণ্টন, তোমাকে বলতে হবে! তোমার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। তুমি না বললে সে হবে তোমার অকৃতজ্ঞতা!

ও বললে, আমার বড় তেস্টা, আমাকে এক-পেয়ালা চা দাও! আমি বলবো। কিন্তু মিসেস ডীন তোমাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক—এ আমি চাই না। ক্যাথি, তোমার চোখের জল যে

আমার পেয়ালায় ঝরে পড়ছে। আমি এ চা খাব না! আমাকে আর-এক পেয়ালা চা দাও!

ক্যাথি আর-এক পেয়ালা চা ওর দিকে ঠেলে দিলে। নিজের চোখের জল মুছে ফেললো। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। জলার ধারে যে উদ্বেগ ওর মুখে দেখেছিলাম তা তো এখন মুছে গেছে। মনে হোল, ও যদি ভুলিয়ে নিয়ে আসতে না পারে এই আশংকায়ই ও আকুল হয়েছিল। এখন তো সে আশংকা দূর হয়েছে, তাই আর ভয়ও নেই।

ও চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, বাবা আমাদের বিয়ে দিতে চান। তোমার বাবার তো এখন বিয়ে দিতে ঘোর আপত্তি। উনি এদিকে আমি কবে মারা যাব সেই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাই কাল ভোরেই বিয়ে হবে। তোমাকে এখানে সারারাত থাকতে হবে। যদি ওঁর কথা মতো চলো, পরশুই বাড়ি ফিরতে পারবে। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, কি—তোমার মতো বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে? লোকটা কি পাগল, না বোকা? ও ভেবেছে কি! আর তুমি কি মনে কর, অমন সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে তোমার মতো একটা বাঁদরকে বিয়ে করবে? তোমাকে কি কেউ বিয়ে করবে? আমাদের এখানে নিয়ে আসার জন্যে তোমাকে চাবকে লাল করা উচিত। এখানে অমন বোকা সেজে থেকো না! তোমাকে ধরে কি যে করতে ইচ্ছে করছে আমিই জানি।

ওকে ধরে একটু ঝাঁকুনি দিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কাসির দমক উঠলো। আবার সেই কান্না আর গোঙানি শুরু হোল। ক্যাথি আমাকে ভর্ৎসনা করলে!

ও চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো সারারাত এখানে থাকতে হবে! না, না! এলেন, ঐ দরজা পুড়িয়ে ফেলতে হয় তাতেও রাজি, তবু এখানে থাকবো না! বেরুতে হবেই।

তখন-তখনি ও কথা মতো কাজ করতো, কিন্তু লিন্টন নিজের জন্যই ভীত হয়ে উঠলো, ও দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো।

তুমি কি আমাকে চাওনা—আমাকে বাঁচাবে না? আমি কি তোমার সঙ্গে গ্রেঞ্জে যাব না? ক্যাথি, আমাকে ছেড়ে তুমি যেও না! আমার বাবার কথা তোমাকে শুনতে হবে।

ও জবাব দিলে, তোমার নিজের কথাই আমি শুনি, মানি। সারারাত থাকতে হবে! উনি কি মনে করছেন বল তো? এর মধ্যে বাবা হয়তো অধীর হয়ে উঠেছেন। ভেঙে বা পুড়িয়ে যে করে হোক আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। শান্ত হও! তোমার কোনো বিপদ হবে না; কিন্তু যদি বাধা দাও—লিণ্টন, বাবাকে আমি তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসি!

ক্যাথি বিভ্রান্ত; তবু সে বলতে লাগল, বাড়ি তাকে যেতেই হবে, আর লিণ্টনের কাকুতি-মিনতির পালা চললো, ওরা যখন এমনি ব্যস্ত, এমন সময় এল হিথক্লিফ।

তোমার ঘোড়া পালিয়েছে, সে বললে। এই লিণ্টন, তুমি এখনো অমনি করছো? ও তোমার কি করেছে?—যাও, শুয়ে পড়গে। একমাস কি দুমাস পরেই ওর এই অত্যাচারের তুমি কড়া প্রতিশোধ নেবে। একেবারে বিশুদ্ধ প্রেমে পড়ে হাহুতাশ করছিলে না? আর কিছুই পৃথিবীতে চাইতে না—শুধু ওকে চাইতে! তাই হবে। যাও বিছানায় শুয়ে পড়গে। জিলা আজ এখানে নেই! নিজের পোষাক নিজেই ছেড়ে নিও! চুপ, চুপ গোলমাল কোরো না। একবার তোমার কামরায় ঢুকতে পারলেই তো নিশ্চিন্ত হলে। আমি তো তখন কাছেও ঘেঁষবো না! ভয় নেই। যাহোক ভাগ্য ভালো কোনোরকমে ব্যাপারটা উতরে দিয়েছ! এখন বাকি কাজটুকু আমার।

ও দরজা খুলে দিলে। ওর ছেলে স্প্যানিয়েলের (একজাতের কুকুর) মতো বেরিয়ে গেল। আবার চাবি পড়লো দরজায়। হিথক্লিফ এবার আগুনের ধারে এলো। আমার খুদে মনিবানী আর আমি সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ক্যাথি মুখ তুলে তাকাল। ওর হাত আপনা থেকে উঠে এল গালে; ও কাছে এসেছে বলেই বুঝি ব্যথার স্মৃতি জেগে উঠেছে।

হিথক্লিফ ভ্রূকুটি করে বললে, কি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ না? তোমার সাহস তাহলে একটা ছদ্ম আবরণ মাত্র; মনে তো হচ্ছে যথেষ্ট ভয় পেয়েছ?

ক্যাথি উত্তর দিলে, আমি সত্যই ভয় পাচ্ছি। যদি এখানে থেকে যাই, বাবা তো অস্থির হয়ে উঠবেন—ওঁকে কষ্ট দিয়ে কি করে সইব—যখন উনি—মিঃ হিথক্লিফ আমাকে বাড়ি যেতে দিন। আমি কথা দিচ্ছি, লিণ্টনকে আমি বিয়ে করবো। বাবাও বিয়েতে অমত করবেন না, আর আমি তো ওকে ভালই বাসি। আমি যা নিজের ইচ্ছায় করবো, আপনি জোর করে তা করতে চাইছেন কেন?

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, ও জোর করে তোমার বিয়ে দিক্ না! দেশে আইন বলে একটা জিনিস আছে। এই বনদেশেও আইন আছে বই কি! ও যদি আমার নিজের ছেলে হোত, তাহলেও আমি সরকারে খবর দিতাম। আর পাদ্রী না ডেকে কি করে বিয়ে দেয় দেখি! সে তো হবে ঘোর বেআইনী ব্যাপার।

ঐ পাজিটা বলে উঠলো, চুপ, চুপ! তোমার ঐ গোলমাল থামাও! তোমার সঙ্গে কথা বলছি না। ক্যাথি তোমার বাবা যে অধীর হবেন, কষ্ট পাবেন এতেই আমার আরো আনন্দ। আনন্দে আমার ঘুম হবে না। চব্বিশ ঘণ্টা এই বাড়িতে তোমাকে থাকতে হবে। আর লিণ্টনকে বিয়ে না করা পর্যন্ত এবাড়ি ছেড়ে যাওয়াও চলবে না।

ক্যাথি কেঁদে উঠলো, তাহলে এলেনকে অন্তত পাঠিয়ে দিন, ও গিয়ে বাবাকে জানাক, আমি ভাল আছি। না হয়তো এখুনি বিয়ে দিয়ে দিন! আহা, বেচারী বাবা! উনি তো ভাবছেন, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি! এখন কি যে করবো জানি না!

না, উনি তো ভাবছেন, ওঁর সেবা করে করে তোমরা ক্লান্ত, তাই একটু ফুর্তি করছো, হিথক্লিফ বললে। তোমাদের নিজের ইচ্ছেয় যে আমার বাড়িতে এসেছ একথা তো অস্বীকার করতে পারবে না। ওঁর কথা তো তোমরা মাননি! আর তোমার এই বয়সে একটু আধটু আনন্দ করা ভাল। একজন রোগীর

সেবা করতে আর কাঁহাতক ভাল লাগে। ক্যাথি তোমার দিন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সুখের দিন তো চলে গেছে। তুমি যে ছুনিয়ায় এসেছ, এর জন্যে নিশ্চয়ই উনি তোমাকে অভিশাপ দেন (অন্তত আমি তো দিই); তাই অভিশাপ দিতে দিতে মারা গেলে এমন কিছু বেমানান হবে না। আমিও তো ওঁর কাছেই যাব! তোমাকে আমি ভালবাসি না! কেমন করে বাসব? কাঁদ, কাঁদ! আমার দৃষ্টি যতদূর যায়, আমি তো দেখতে পাচ্ছি—এইটেই এখন থেকে তোমার প্রধান সান্ত্বনা হয়ে উঠবে; অবশ্য লিণ্টন যদি অন্যগুলোর ক্ষতিপূরণ করতে পারে। তোমার বাপ মনে করেন, সে তা করবেও। চিঠিপত্রে ওঁর পরামর্শ বা সান্ত্বনা দেখে আমার মজা লাগছিল। উনি নিজের ধনটিকে আমার ধনের হাতে সঁপে দিয়ে যত্ন করতে বলেছেন। সদয় হতে বলেছেন। সদয় হওয়া-যত্ন নেওয়া সে তো পিতার কর্তব্য। লিণ্টনের নিজেরই ওগুলো চাই। লিণ্টন যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে জানে। ও বেড়ালগুলোকে কি ভাবে যন্ত্রণা দেয় দেখো! ওর মামাকে বাড়ি গিয়ে সে কথা বোলো।

আমি বললাম, তোমার ছেলের চরিত্রের বেশ চমৎকার ব্যাখ্যা করছো! তোমার সঙ্গে যে ওর মিল আছে এ তারই প্রমাণ। তা এমন বোল-বোলা কাকাতুয়াকে গ্রহণ করতে গেলে ক্যাথির তো দ্বিধা হবেই।

হিথক্লিফ জবাব দিলে, ওর এমন নম্র স্বভাবের উদাহরণ দিতে আমার আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। এখন তো ক্যাথি আমার হাতে। হয় সে বিয়ে করবে, নয়তো এখানে তোমার সঙ্গে ওর বাপের মৃত্যু অবধি বন্দী হয়ে থাকবে। দুজনকে গুম্ করে রাখার শক্তি আমার আছে। ওকে যদি তুমি কথা ফিরিয়ে নিতে বল, গুম্ করে রাখতে পারি কি না তা দেখতে পাবে।

ক্যাথি বললে কথা ফিরিয়ে নিতে আমি চাইনা। যদি বিয়ের পরেই আমি থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জে যেতে পাই, তাহলে আধঘণ্টার ভিতরেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চাই। মিঃ হিথক্লিফ আপনি নিষ্ঠুর হতে পারেন, কিন্তু শয়তান তো আপনি নন। আপনি শুধু ঈর্ষার বশে আমার সমস্ত সুখ ধ্বংস করে দেবেন না। বাবা যদি ভাবেন, আমি ইচ্ছা করে তাঁকে ফেলে চলে এসেছি,

আর আমার যাবার আগেই তিনি যদি মারা যান, আমি কি সে আঘাত সইতে পারব? কান্না আমি থামালাম, কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, আমার দিকে না তাকালে, আমাকে দয়া না করলে, আমি আপনার পা ছাড়ব না। আপনাকে তো আমি ঘৃণা করি না। আমাকে আঘাত করেছেন বলে তো আমি চটিনি। আপনি কি জীবনে কাউকে ভালবাসেননি পিসে-মশাই? কখনো না? একবার—দেখুন—কত বড় হতভাগী আমি! আমাকে তো দয়া না করে আপনি পারবেন না!

হাত সরিয়ে নাও, নইলে লাথি মারব, হিথক্লিফ বর্বরের মতো গর্জে উঠলো। এর চেয়ে সাপে জড়িয়ে ধরা ঢের ভাব! তুমি কি করে আমাকে সোহাগ দেখাতে সাহস পেলে। তোমাকে আমি ঘৃণা করি!

সে গা ঝাড়া দিলে। যেন কি এক ক্লেদ সারা গায়ে লেপটে আছে। আমি এবার উঠে পড়ে এবার গালমন্দ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শুরু করতেই ও আমাকে চুপ করিয়ে দিলে। আমাকে শাসালে, আর একটি কথা বললেই ও আমাকে একটা কামরায় নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখবে। আঁধার হয়ে এল। বাগানের ফটক থেকে ভেসে এল স্বর: আমাদের গৃহস্বামীটি স্বর শুনে তখনি বেরিয়ে গেল। দু-চার মিনিট বাইরে কি কথা হোল, ও একাই ফিরে এল।

ক্যাথিকে বললাম, ভাই হোয়ারটন আসবে ভেবেছিলাম। ও এখন এসে পড়লে হয়? ও হয়তো আমাদের পথও নিতে পারে।

হিথক্লিফ আমার কথা শুনে বললে, গ্রেঞ্জ থেকে তিনজন চাকর এসেছিল তোমাদের খুঁজতে। তখন জানালা দিয়ে ডাকলেই সাড়া পেতে। যাহোক, তা হয়নি।

সুযোগ এসেছিল, অথচ সে সুযোগ আমরা হারিয়েছি এই ক্ষোভে আমরা তখন আত্মহারা। ও আমাদের নটা অবধি এখানে বসিয়ে রাখলো। তারপরে উপরে জিলার ঘরে যাবার জন্যে আমাদের উপর হুকুম হোল। ক্যাথিকে ওর কথা মেনে চলতে বললাম। হয়তো জানালা, কি উপরের আকাশের আলো আসার ঝিলিমিলি দিয়ে আমরা বেরিয়ে যেতে পারব। কিন্তু জানালা সরু।

আর ঝিলিমিলি হাতে পাওয়াও আমাদের তখন দুঃসাধ্য। আমরা দুজনেই বসে রইলাম। ক্যাথি জানালার ধারে বসে রইল ভোরের প্রতীক্ষায়। আমি একখানা চেয়ারে বসে দোল খেতে লাগলাম। আমার কর্তব্যে অবহেলা নিয়ে নিজেকে দুষলাম। আমার নিজের চেয়ে হিথক্লিফকে কম অপরাধী বলে মনে হোল।

সকাল সাতটায় এল হিথক্লিফ। সে এসে জিজ্ঞেস করলে, ক্যাথি উঠেছে কিনা, ক্যাথি দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জানলে, হাঁ ও উঠেছে। দরজা খুলে ওকে টেনে বার করে নিলে। আমি ছুটে যাচ্ছিলাম, এরই মধ্যে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি দরজা খোলার দাবি জানালাম। ও বললে, একটু সবুর কর এলেন। তোমার ছোট হাজিরি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শার্সিতে ঘা দিলাম। ছিটকিনি ধরে টানলাম, ক্যাথি জিজ্ঞেস করলে, এখানে আমাকে বন্দী করে রেখেছে কেন? ও জানালে আরো একঘণ্টা এমনি বন্দী হয়েই আমাকে থাকতে হবে। ওরা চলে গেল।

দুঘণ্টা কি তিনঘণ্টা ধরে সইলাম এই বন্দীজীবন; অবশেষে পায়ের শব্দ শোনা গেল। হিথক্লিফের তো নয়।

কার স্বর যেন! ছোট হাজিরি এনেছি—দরজা খোল!

ব্যগ্র হয়ে দরজা খুলে হেয়ারটনকে দেখলাম। ওর হাতে এক গাদা খাবার। সারাদিনেও বুঝি ফুরোবে না।

ও ট্রেখানা আমার হাতে দিয়ে বললে, নাও!

ওকে বলতে গেলাম, এক মিনিট সবুর কর না বাপু?

না, না! ও রেগে চলে গেল।

সারাদিন কেটে গেল বন্দী অবস্থায়। রাতটাও, তারপরে আর একদিন আর রাত। তারপরেও আর একদিন। চারদিন পাঁচ রাত আমি বন্দী হয়ে রইলাম। শুধু সকালে আসতো খাবার নিয়ে হেয়ারটন। সে তো আদর্শ জেল রক্ষক। যেমন বদমেজাজী, তেমনি একেবারে বোবা কালা। কোন সুবিচার বা সহানুভূতি তার কাছ থেকে আশা করা তো বৃথা।

আঠাশ

পাঁচ দিনের দিন ভোরে, নয়তো বিকেলে অন্য পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। হাল্কা শব্দ। এবার ঘরে ঢুকলো মানুষটি। সে জিল্লা। লাল শাল জড়িয়েছে; মাথায় কালো টুপী। হাতে একটা চুপড়ি।

ও আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো, আরে মিসেস ডীন না? তোমাকে নিয়ে তো গিমারটনে কত গুজব। শুনলাম, তুমি আর মিনিবাবা নাকি হাওরের পাঁকে ডুবে মরেছ। মনিব অবিশ্যি বললেন, তোমাদের তিনিই উদ্ধার করেছেন। তারপরে ক'দিন এখানে আছ? মনিব কি সত্যি বাঁচালো নাকি? কই, তুমি তো তেমন রোগা হয়ে যাও নি।

উত্তরে বললাম, তোমার মনিবটি তো পেজোমিতে দড়! কিন্তু এর জবাবদিহি ওকে করতেই হবে। মিথ্যে গুজব রটিয়ে ওর তো কোন লাভ নেই, সবই ফাঁস হয়ে যাবে।

জিল্লা জিজ্ঞেস করলে, কি বলছো গো? এ তো ওঁর গল্প নয়—গাঁয়ে শুনে এলাম গো! হেয়ারটনের সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তাকিয়ে রইলেন অবাক হয়ে। কিছুই শোনেন নি। তখন গুজবের কথা বললাম। মনিবও ছিলেন। তিনি শুনে হাসলেন। বললো, যদি হাওরের পাঁকে ডুবে গিয়ে থাকে, এখন উদ্ধার পেয়েছে। নেলিকে তোমার ঘরেই পাবে। তবে ওর মগজে হাওরের জল ঢুকে মাথা বিগড়ে গেছে। ওকে আমার কাছ থেকে খবর নিয়ে গ্রেঞ্জে যেতে বলবে। ওর খুদে মনিবানী জমিদারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে আসছেন।

মিঃ এডগার কি মারা গেছেন? চেঁচিয়ে উঠলাম।

ও উত্তর দিলে, না, গো না, কেনেথ ডাক্তার বলেছেন, আরো একদিন তিনি টি'কবেন। পথে আসতে আসতে দেখা হোল, তখন জিজ্ঞেস করলাম।

উঠে পড়ে তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। কেউ বাধা দিলে না।

ক্যাথিকে খুঁজতে লাগলাম। সারা বাড়ি রোদে ভরে গেছে। ফটকের দরজা খোলা। কিন্তু কেউ নেই। ভাবছিলাম, চলেই যাব, না ক্যাথির খোঁজ করবো, হঠাৎ কাসির শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। লিণ্টন শুয়ে শুয়ে মিছরি চুষছে, ওর কাছে গিয়ে বললাম, বল, ক্যাথি কোথায়? ও আপনমনে মিছরি চুষতে লাগলো।

বললাম, সে কি চলে গেছে?

না, উত্তর দিলে। ও উপরে আছে। ও যাবে না। আমারা যেতে দেব না।

ওরে হাঁদা, তুই যেতে দিবি না কি রে! ওর ঘরে আমাকে নিয়ে চল্! নইলে মজা টের পাবি!

ও বললে, তুমি একবার যেতে চেষ্টা করেই দেখ না, বাবা, তোমাকে মজাটা দেখিয়ে দেবেন। উনি বলেছেন, ক্যাথির সঙ্গে আর অমন ভাল ব্যবহার করলে চলবে না। সে এখন আমার স্ত্রী। ও আমাকে ছেড়ে যেতে চায়—ওর একি নির্লজ্জ ব্যবহার! তিনি বলেন, ও নাকি আমাকে ঘৃণা করে, আমার মৃত্যু চায়। ও তাই ওর তো বাড়ি ফেরা হবে না! কখনো ফেরা হবে না! কাঁদে কাঁদুক, শত অসুখ হয় হোক—তবু না!

আবার চোখ বুজে মিছরি চুষতে লাগলো। বুঝি ঘুমিয়েই পড়ে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, দেখ, লিণ্টন, তুমি কি ক্যাথির মায়া-মমতার কথা সব ভুলে গেছ। তখন তো ও তোমাকে বই এনে পড়াত, গান গেয়ে শোনাত—আর তুমিও ওকে ভালবাসতে। ও ঝড় বাদল বরফ তুচ্ছ করে তোমার কাছে ছুটে ছুটে আসতো! আর এখন তুমি তোমার ঐ বাপের কথা সত্যি বলে ধরে নিয়েছ। তুমি নিজেই জান, তোমার বাবা, ক্যাথি আর তুমি তোমাদের দুজনকেই ঘৃণা করে। তুমি কিনা শেষে তারই দলে গিয়ে ভিড়লে! কৃতজ্ঞতা বটে!

লিণ্টন ত মুখ থেকে মিছরিখানা বার করে নিলে এবার।

আমি আবার বলে চললাম, তোমাকে ঘৃণা করে বলেই কি ও ওয়াদারিং হাইটস্-এ ছুটে ছুটে আসতো? নিজেই ভেবে দেখ। তুমি না বললে, ও অসুস্থ। তুমি তাহলে একা বসে আছ কেন? তুমি তো অবহেলা করে বসে

তা জান। নিজের অসুখ নিয়ে তো সারা হয়ে গেলে। আর অন্যের অসুখে একটু মায়াদয়া দেখাবে না! অথচ ও তো তোমার অসুখে ভেবে সারা হয়ে যায়। আমি সামান্য দাসী, আমিই ওর জন্যে চোখের জল ফেলছি—আর তুমি এত ভাবনার ভান করে এখন এখানে শুয়ে আছ? ওরে নিষ্ঠুর, ওরে স্বার্থপর ছেলে!

ও রেগে উঠলো, ওর কাছে কি থাকা যায়! ও তো খালি কাঁদে, আমি সইতে পারি না। আমি যত বলি বাবাকে ডাকবো, ও তবু থামে না। একবার তো তাকে ডেকেও নিয়ে এলাম। তিনি এসে ওর গলা টিপে মেরে ফেলবেন বলে শাসালেন। কিন্তু তবু তো শান্ত হোল না, উনি চলে যেতেই আবার শুরু করলো। সে কি গোঙানি! সারা রাতই এমনি করে কাবার হয়ে গেল। আমি তো ঘুমোতে পারিনি।

মিঃ হিথক্লিফ কি বাইরে গেছেন? জিজ্ঞেস করলাম, ও ক্যাথির মানসিক যন্ত্রণায় সহানুভূতি জানাতে অক্ষম বলেই মনে হোল।

উনি এখন উঠোনে আছেন। কেনেথ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি তো বললেন, মামা আর বাঁচবেন না। যাহোক, আমি তো খুশি, ওঁর পরেই আমিই হবো গ্রেঞ্জের মালিক। ক্যাথি সব সময়েই ওখানকে নিজের বাড়ি বলে। ওখানা ওর নয়। আমার। বাবা বলেন, ওর যা কিছু আছে সব আমার। ওর সুন্দর সুন্দর বইগুলোও আমার। ও দিতে চেয়েছিল ওর পোষাপাখী, টাট্টু ঘোড়ার মিন্নি, আমি ওকে বলেছি, ওর আর দেবার কিছু নেই। এখন সবই আমার। শুনে কেঁদে উঠলো। তারপরে নিজের গলার পদক থেকে একখানা খুদে ছবি বার করে বললে, ওখানা আমি পাব না। পদকের ভিতরে ওর মা আর বাবার ছবি, ওদের যখন অল্প বয়েস ছিল তখনকার ছবি। আমি বলে বসলাম, ও দুখানাও আমার। ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঐ মেয়েটা দিলে না, ও আমাকে ঠেলে ফেলে দিলে। আমাকে মারলে। চেঁচিয়ে উঠলাম। ও অমনি ভয় পেল। বাবা আসছেন টের পেয়ে ও পদকখানার কব্জা খুলে আমাকে ওঁর মার ছবিখানা দিলে; আর

বাবারখানা লুকিয়ে রাখতে গেল। বাবা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার। আমি বলে দিলাম। আমার কাছ থেকে ছবিখানা নিয়ে নিলেন, ওর খানা আমাকে দিতে বললেন। ও রাজি হল না। এবার উনি ওকে ফেলে দিলেন মেঝেয়, তারপর ছিনিয়ে নিয়ে পা দিয়ে দলে-পিষে দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওকে যে উনি মারলেন, তাতে খুশি হলে ?

বাবা কুকুর কি ঘোড়াকে যখন মারেন, তখনো আমার ভয় হয়। উনি এত জোরে মারেন! কিন্তু তবু প্রথমে খুশিই হলাম। আমাকে ও ধাক্কা মেরেছিল তার শাস্তি তো হওয়া উচিত। কিন্তু বাবা চলে যেতে ও আমাকে জানালার কাছে এনে গালখানা দেখালে। উঃ, ভিতরে দাঁতে কেটে কেটে গেছে, মুখে রক্ত। তারপরে ও ছবির টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। আমার সঙ্গে সেই থেকে কথাও বলেনি। আমার তো মনে হয়, ব্যাথায় কথা বলতে পারেও না। কিন্তু ও ভারি দুষ্টু। ওকে এমন দেখাচ্ছে, যে আমি তো ওকে ভয়ই পাই।

ওকে বললাম, ঘরের চাবিটা তুমি ইচ্ছে করলেই যোগাড় করতে পার ?

ও উত্তর দিলে, উপরে গেলে পারি। কিন্তু এখন তো উপরে যেতে পারব না! কোথায় আছে বল ? ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

ও চেঁচিয়ে উঠলো, বলবো না। আমাদের গোপন কথা তোমাকে বলবো কেন ? হেয়ারটন, জিল্লা—কাউকে জানানো বারণ! তুমি বক্ বক্ করে আমাকে জ্বালাতন করছো কেন—যাও-দূর হও! ও আবার চোখ বুজলো।

ভাবলাম, হিথক্লিফের সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাওয়া ভাল। তারপরে ক্যাথিকে উদ্ধার করতে দলবল নিয়ে আসবো গ্রেঞ্জ থেকে। আমাকে ফিরে আসতে দেখে সবাই তো অবাক। ওরা আবার খুশিই হোল। ওরা যখন শুনলে, ওদের খুদে মনিবানীটিও নিরাপদে আছেন। ওরা ছুটে যেতে চাইল মনিবকে খবর দিতে। কিন্তু আমি ওদের বারণ করে নিজেই গেলাম। এই ক'দিনে কি পরিবর্তন হয়েছে। উনি যেন মৃত্যুর কাছে আত্মনিবেদন করেছেন। উনি দেখতে তরুণ। ওঁর বয়েস উনচল্লিশ, কিন্তু ওঁকে দেখলে

দশবছরের ছোট বলেই মনে হবে। ক্যাথির কথাই তিনি বুঝি ভাবছিলেন। বিড় বিড় করে তার নাম উচ্চারণ করলেন। আমি হাতে হাত রেখে বললাম, কর্তা, ক্যাথি আসছে, ফিসফিস করে বললাম। ও বেঁচে আছে, ভাল আছে। আজ রাতেই ফিরে আসবে।

এই খবরের প্রথম ফলাফল দেখে শিউরে উঠলাম। তিনি উঠে পড়তে গেলেন। ঘরের চারদিকে ব্যগ্রতার দৃষ্টি। আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সুস্থ হয়ে উঠলে, সব কথাই বললাম।

উনি বুঝলেন, শত্রুর ওঁর সম্পত্তি গ্রাস করবারই ইচ্ছা। কিন্তু কেন যে ওঁর মৃত্যু অবধি সে সবুর করলে না এই ভেবেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি তো জানতেন না যে তিনি আর তাঁর ভাগ্নে প্রায়ই একই সঙ্গে পৃথিবী ছেড়ে যাবেন। তিনি উইল বদলাতে চাইলেন। ক্যাথিকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি না দিয়ে তিনি ট্রাস্টির হাতে দিয়ে যাবেন। ও জীবিত অবস্থায় ভোগ দখল করবে। তারপরে যদি ছেলেপুলে হয় তারা পাবে। লিণ্টন মারা গেলে সম্পত্তি হিথক্লিফের হাতে পড়বে না।

ওঁর হুকুম মতো, য়্যাটর্ণিকে আনতে পাঠালাম। আর চারজনকে পাঠালাম উপযুক্ত হাতিয়ার দিয়ে আমার মনিবানীব উদ্ধারে। কিন্তু দু'দলেরই আসতে দেরী হতে লাগলো। যাকে একা পাঠিয়েছিলাম, সে এসে খবর দিলে, য়্যাটর্ণি বাড়ি ছিলেন না তাই তাকে পুরো দুঘণ্টা বসে থাকতে হয়। তিনি এসে বলেন যে আর একটা কাজ আছে, সেটা সেরে ভোরের আগেই এখানে এসে পৌছবেন। আর চারজন ফিরে এল, ক্যাথিকে না নিয়ে, ওরা খবর দিলে ক্যাথি অসুস্থ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। হিথক্লিফ তাদের ঘরে ঢুকতে দেয় নি। আমি ঐ খোকাদের গালাগাল দিলাম। কিন্তু এ খবর তো মনিবকে দেওয়া যায় না। তাই ঠিক করলাম, দলবল নিয়ে নিজে গিয়ে হানা দেব। তারপরে বন্দীকে সমর্পণ করলে ফিরে আসবো। ওর বাবা মৃত্যুর আগে ওকে দেখতে পাবেন। মনে মনে শপথ করলাম, ঐ শয়তানটা শত বাধা দিক, ওকে ওর দোরগোড়ায় খুন করে ফেলতে হলেও কসুর করবো না।

ভাগ্য ভাল, আমাকে আর হাঙ্গামা পোয়াতে হোল না। আমি রাত তিনটের সময় এক জাগ্ জল আনতে নীচে গেলাম। জল নিয়ে ফিরে আসছিলাম হলঘরের ভিতর দিয়ে, এমন সময় শুনলাম, কে যেন দরজায় ঘা মারছে। চমকে উঠলাম। নিজেকে তখন সামলে নিয়ে ভাবলাম, এ নিশ্চয়ই গ্রীন এসেছেন। আমি চলে আসছিলাম—ভাবলাম অন্য কেউ খুলে দেবে দরজা, কিন্তু ধাক্কা পড়ছে ক্রমাগত, জোরে নয় কিন্তু তবু কানে যাচ্ছে। জাগ্‌টা রেখে নিজেই খুলে দিতে গেলাম। বাইরে চাঁদের আলো। না, ম্যাটর্ণি তো নয়। আমার খুদে মনিবানী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে, গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

এলেন, বাবা, বেঁচে আছেন তো ?

হাঁ গো, কর্তা বেঁচে আছেন। আর তুমিও ভালয়-ভালয় ফিরে এসেছ !

ও তখনি রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যেতে চায় মিঃ লিণ্টনের ঘরে। আমি ওকে জোর করে আটকে রাখলাম। এনে বসালাম চেয়ারে। ওকে জল খাওয়ালাম, জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে আমার ঝাড়নখানা দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। এবার বললাম, আমি গিয়ে দেখি—কর্তাকে বলি ওর আগমনের কথা। একথাও বললাম, ও যেন বলে, খুদে লিণ্টনকে স্বামীরূপে পেয়ে ও খুশি হয়েছে। ও তাকিয়ে রইল, তারপরেই বুঝলো, কেন আমি ও কথা বলেছি।

আমি ওঁদের সাক্ষাৎকারের সময় ছিলাম না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘরে ঢুকতে সাহস হয়নি। কিন্তু শান্তভাবেই শেষ হোল সাক্ষাৎকার, ক্যাথির হতাশা তো ওর বাপের আনন্দের মতোই মৌন হয়েই রইল। শান্ত ভাবেই ও বুঝি তাকিয়েছিল বাপের দিকে, উনিও বুঝি শান্ত ভাবেই তুলে ছিলেন মেয়ের দিকে চোখ। আনন্দ সে চোখে ঝরে ঝরে পড়ছিল। বুঝি বা আরক্ত হয়ে উঠেছিল আনন্দে।

মিঃ লকউড, উনি শান্তিতেই মারা গেলেন। ওর গালে চুমু খেয়ে শুধু বিড়বিড় করে বললেন, বাছা, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি, তুমিও একদিন আমাদের

কাছে আসবে। আর তো নড়লেন চড়লেন না—আর তো কথা বললেন না। শুধু ঐ আয়ত দুটি চোখ তাকিয়ে রইল। তারপর কখন থেমে গেল নাড়ির শেষ স্পন্দন, প্রাণপাখী চলে গেল। কেউ বুঝতে পারলাম না—একটু কষ্ট পেলেন না।

কে জানে ক্যাথি তার চোখের জল উজাড় করে দিয়ে এসেছিল কিনা, নয়তো ওর বুকের ব্যাথার তখন এত ভার যে সে উৎসাহিত হয়ে ফেটে পড়তে পায়নি। সূর্যোদয় অবধি তো সে ঠায় বসে রইল। শুষ্ক ওর চোখ। দুপুর বয়ে গেল। হয়তো তখনো মৃত্যু শয্যার পাশে বসে থাকতো, কিন্তু আমি ওকে চলে আসবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। ও গিয়ে বিশ্রাম করুক। ওকে শেষ পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে গেলাম। খাবার সময় এসে পৌঁছলেন য়্যাটর্ণি। তিনি আগে-ভাগে ছুটেছিলেন ওয়াদারিং হাইটস্-এ, সেখান থেকে পরামর্শ নিয়ে তবে এলেন। উনি হিথক্লিফের কেনা লোক। তাই মনিবের ডাকে আসতে পারেন নি। কিন্তু এও ভাগ্য বলতে হবে, মেয়ে আসার পর থেকে উনি আর সংসারের কথা ভাবেন নি। দুদণ্ড আনন্দেই ছিলেন।

মিঃ গ্রীন এবার ঢালাও হুকুম শুরু করলেন। বাড়ির একটা সিজিল-মিছিল করতে হবে। চাকর-দাসীদের বরখাস্ত করা হোল—রইলাম শুধু আমি। এড্‌গারের শেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর স্ত্রীর পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হবে—সেটাও তিনি বাতিল করে দিয়ে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানেই চালান দিতেন। কিন্তু উইল বাদ সাধলো, আর বাদ সাধলো আমার প্রতিবাদ। দাবি জানালাম—ওঁর শেষ ইচ্ছা বর্ণে-বর্ণে পালন করতে হবে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাড়াতাড়িই শেষ হোল।

ও আমাকে জানালে যে ওর বাপের জন্ত উদ্বেগ দেখে লিণ্টনই ওকে মুক্তি দেবার ঝুঁকি নেয়। আমি যাদের পাঠিয়েছিলাম, তাদের তর্ক-বিতর্কও শুনেছিল। হিথক্লিফ কি বলেছিল তাও আঁচ করে নেয়। তখন ওতো হতাশ হয়েই পড়ে। আমি চলে যাবার পরই লিণ্টন বসবার ঘরে ফিরে আসে। ওর বাপ উপরে আসার আগেই ও চাবি যোগাড় করে। ও কৌশল করে দরজা

খুলে রাখে। তাই ক্যাথি ভোরের আগেই বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল। দরজা দিয়ে বেরোয় নি। কি জানি কুকুরগুলো যদি ডেকে ওঠে। একটা ফাঁকা ঘরের জানালা দিয়ে ও কাছের ফার গাছটার উপরে চলে যায়। সেখান থেকে নেমে ছুটে আসে। ওর এই কাজের সাহায্য যে করেছে, সে এতক্ষণে বহু নিগ্রহ ভোগ করছে।

উনত্রিশ

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর আমি আর আমার মনিবানী সন্ধ্যের সময় লাইব্রেরী ঘরে বসেছিলাম। দুজনে শোকে মুহ্যমান, আবার অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েও শিউরে উঠছিলাম। আমরা দুজনে ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, ক্যাথি গ্রেঞ্জে থাকার অনুমতি চাইবে। অন্তত লিণ্টন যে ক'দিন বেঁচে আছে। এই ব্যবস্থাই ভাল হবে। ওকে যদি হিথক্লিফ চলে আসার অনুমতি দেয়, আর আমি যদি ঘর-সংসার দেখি তাহলে একরকম নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যবস্থা হওয়া তো আশাতীত। তবু আশা ছাড়লাম না। আমার বাড়ি, আমার মনিবানী, আমার চাকুরী সবই তাহলে বজায় থাকবে বলে আপন মনেই খুশি হয়ে উঠলাম। বরখাস্ত চাকরদের একজন তখনো চলে যায় নি। সে ছুটে এসে খবর দিলে, সেই শয়তানটা বাড়ির দিকে আসছে। সে দরজা বন্ধ করে দেবে কিনা ওর মুখের উপর ?

অমন হুকুম দেবার মতো পাগলামি যদি বা পেয়ে বসতো তবু সময় তো ছিল না। ও দরজায় ধাক্কাটা পর্যন্ত দিলে না, নিজের নামটাও জোরে জানান দিলে না। ও এখন মালিক। মালিকের মতোই সোজা এসে ঢুকলো কথাটি না বলে। চাকরটির স্বর শুনে ও ঠিক লাইব্রেরী ঘরে এসেই হাজির। ওকে ইসারায় বাইরে যেতে বলে দরজা বন্ধ করে দিলে।

এই সেই ঘর। অতিথিরূপে এইখানেই সে এসেছিল আঠারো বছর আগে। তেমনি চাঁদ আকাশে। তেমনি তার জ্যোৎস্নাধারা এসে চলকে

পড়ছে জানালা দিয়ে। বাইরে তেমনি হৈমন্তীরাত, তেমনি হৈমন্তী দৃশ্য। আমরা তখনো মোম জ্বালিনি সামাদানে। কিন্তু ঘরের সমস্তটাই দেখা যায় বাইরের জ্যোৎস্নায়। এমনকি দেয়ালের ছবিগুলো অবধি। মিঃ লিণ্টনের কমনীয় মুখ, মিসেস লিণ্টনের সুন্দর তনুদেহ। হিথক্লিফ এগিয়ে এল। ওর কিছুই পরিবর্তন হয়নি। সেই আঠারো বছর আগেকার তেমনি মানুষ,—তেমনি তামাটে ওর মুখ, একটু বা গাল বসে গেছে। তবে আগেকার চেয়ে এখনও একটু যেন ধীর স্থির। ওজনেও বেড়েছে। কিন্তু আর কিছু বদলায় নি। ক্যাথি ছুটে বেরিয়ে যাবে বলেই বুঝি ওকে দেখে উঠে পড়লো।

ও হাত চেপে ধরে বললে, থাম। আর পালানো চলবে না! কোথায় বা পালাবে? আমি তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি এবার থেকে কর্তব্যপরায়ণা বধূ হবে এই তো আমার আশা। আমার ছেলেকেও আর অবাধ্য করে তুলবে না। যখন ওর কাছে সব শুনি, কি শাস্তি যে ওকে দেব ভেবে পাই নি। ও তো মাকড়সার জালের চেয়েও ঠুনকো, একটা চিমটি কাটলেও মরে যাবে। কিন্তু তুমি ওর মুখ দেখলে বুঝতে পারবে ওর দাওয়াই আমি দিয়েছি। ওকে পরশু থেকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে রেখেছিলাম। তারপরে আর ওকে ছুঁইনি। তারপর হেয়ারটন আর আমি ওখানে বসে গল্প করি। জোসেফ যখন ঘণ্টা দুয়েক পরে ওকে তুলে নিয়ে যেতে এল, তখনো ও ধকল সামলে উঠতে পারে নি। হেয়ারটন তো বলে রাতে ও বার বার চেঁচিয়ে উঠেছিল। তোমার অমন মূল্যবান স্বামীকে তোমার ভাল লাগুক চাই না লাগুক, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। এখন ও তোমার জিনিস! আমি তোমার হাতে ওকে সঁপে দিয়েছি।

আমি ওকে অনুনয় করে বললাম, তারচেয়ে ক্যাথি এখানেই থাকুক না কেন? লিণ্টনকেও এখানে পাঠিয়ে দাও, ওদের দুজনাকেই তো তুমি দেখতে পার না, ওরা চলে এলে তোমার তো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। তোমার কাছে তো ওর উৎপাত ছাড়া কিছুই নয়।

ও উত্তর দিলে, আমি গ্রেঞ্জের জন্য ভাড়াটে খুঁজছি। আমার ছেলে-বৌকে

আমার কাছে রাখব বই কি ; তাছাড়া ঐ ছুঁড়িটা তো ওর রুজির জন্ত আমার ওখানে দাসীবৃত্তি করবে। এড্‌গার চলে গেছে, এখন কে ওকে আলসে-বিলাসে বসিয়ে বসিয়ে গেলাবে ? এই জলদি কর ! আমাকে আবার জোর করতে না হয় দেখো !

ক্যাথি বলে উঠলো, জোর করতে আপনাকে হবে না। আমি নিজেই যাব। এখন আমার ভালবাসার মতো লিণ্টন ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। ওকে যাতে ঘৃণা করি, তেমনিই আপনি ওকে করে তুলেছেন—কিন্তু তবু আমার তো আর কেউ নেই। জানি, ওকেও আমায় ঘৃণা করবার জন্তই তৈরী করেছেন। তবু একথা বলবো, আপনি তা পারবেন না ! আমি যখন ওর পাশে থাকব, আপনি ওকে আঘাত করতে পারবেন না। আবার আমাকেও আপনি ভয় দেখাতে পারবেন না। আমি আপনাকে উপেক্ষা করতে জানি, তুচ্ছ করতেও পারি।

হিথক্লিফ গর্জে উঠলো, ভাল, তুমি যে গর্বের অবতার দেখছি। তোমাকে এত ভালবাসিনে যে ওকে আঘাত করে তোমাকে শিক্ষা দেব। বরং তুমিই পাবে চরম শাস্তি। আমি তোমাকে ওর কাছে ঘৃণার পাত্র করে তুলবো না, বরং ও নিজের ইচ্ছায়ই তোমাকে ঘৃণা করবে। তুমি চলে গেছ বলে ও তো ক্ষেপে গেছে। আবার তার ফলটাও ওর উপরে শুভ হয়নি। তাই ও একেবারে পাগল হয়ে আছে। তোমার এই অসীম ভালবাসার প্রতিদানে ধন্তবাদ আশা করো না। ও জিল্লাকে বলছিল, আমার মতো গায়ে জোর থাকলে তোমার কি দশা করতো ! ইচ্ছেটা আছে, তবে জোর নেই। কিন্তু ওর এই দেহের দুর্বলতাই তোমার উপরে অত্যাচার করবার উপায় ওকে বাত্‌লে দেবে।

ক্যাথি বললে, ও আপনার ছেলে। ওর মন্দ স্বভাবের কথাও আমি জানি, আবার এও জানি আমার স্বভাব ভাল, আমি ওকে ক্ষমা করতে পারব। ও আমাকে ভালবাসে একথা জানি বলেই ওকে আমি ভালবাসি। আপনি আমাদের যতই দুঃখ দিন, আমরা তবু এই বলে প্রতিশোধের তৃপ্তি পাব যে—

আপনার এই নিষ্ঠুরতা বিরাট দুঃখ থেকেই এসেছে। আপনি কি দুঃখী নন? আপনি কি শয়তানের মতোই নিঃসঙ্গ নন, তারই মতো ঈর্ষায় কি আপনি পুড়ে মরছেন না। কেউ তো আপনাকে ভালবাসে না। আপনি মারা গেলে, কেউ তো আপনার জন্যে কাঁদবে না। আপনার মতো হতে আমি চাই না!

ক্যাথির এ যেন এক বিজয়োল্লাস! সে যেন তার এই ভবিষ্যৎ বংশের মানসের ভিতরে ডুবুরীর মতো সন্ধান করে বেড়াচ্ছে—তার শত্রুর দুঃখই তার আনন্দ।

ওর শ্বশুর রেগে বললে, নিজের জন্যেই তোমার দুঃখের অন্ত থাকবে না। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেই তো দেখতে পাবে। ডাইনী, তোর তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে চলে আয়!

ক্যাথি চলে গেল। আমি ওর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, হাইটস্‌-এ জিল্লার জায়গায় কাজ করতে চাইলাম। বললাম, ও আমার জায়গায় এখানে কাজ করবে। কিন্তু ও শুনলো না। আমাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিলে। এবার ওর চোখ পড়লো দেয়ালের ছবির উপর। মিসেস লিণ্টনের ছবিখানা দেখে বললে,—

আমি এই বাড়ি চাই। আমার দরকার নেই, তবু চাই। হঠাৎ আগুনের কুণ্ডের দিকে মুখ ফেরালে। তারপর বুঝি কথা খুঁজে না পেয়ে একটু হাসলো—তোমাকে বলি—কাল আমি কি করেছি। লিণ্টনের কবর যারা খুঁড়ছিল, তাদের দিয়ে ওর শবাধারের উপরের মাটি খুঁড়ে ফেলে শবাধারটা খুলেছিলাম। আবার দেখলাম ওর মুখখানা—এখনো ওরই মুখ—অবিকল ওর মুখ। লোকটা আমাকে শেষে বললে, হাওয়া লাগালে নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তাই শবাধারের একটা ধার খসিয়ে ওর মুখখানা ঢেকে রাখলাম। লিণ্টনের পাশে রাখিনি। ও মরুক, গোল্লায় যাক! ওকে রাঙঝাল করে তার ভিতরে রাখলে হয়। লোকটাকে ঘুষ দিয়ে শবাধারটা সরিয়ে নিয়ে যেতে বললাম। আমি যখন মরবো, আমারটা যেন ওর পাশে রাখে।

চেঁচিয়ে উঠলাম, তোমার কি লজ্জা হয় না। মরা মানুষের শান্তি ভঙ্গ করলে!

ও উত্তর দিলে, আমি কারো শান্তি ভঙ্গ করিনি নেলি। নিজেকে একটু খুশি করলাম। এখন থেকে মনে শান্তি পাব। আর তোমরাও মরলে আমাকে কবরের নীচে রাখতে পারবে। নইলে তো কবে ভূত হয়ে উঠে আসবো—তার কি ঠিক আছে! না, না, শান্তি আমি ভাঙিনি। বরং ওই তো আমার দিনরাতের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। আঠারোটি বছর ধরে এমনি চলেছে। একদিনও কামাই যায়নি—শুধু কাল রাতটা ভাল কেটেছে। আমি শান্তিতে কাটিয়েছি। স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার শেষ ঘুম নেমে এল, বুকের স্পন্দন নীরব। ওর তুষারের মতো ঠাণ্ডা গালের উপর গাল রেখে আমি যেন শুয়ে আছি।

বললাম, ও যদি মাটির নীচে পচে গলে মিশে যেত, তখন কি করতে, কি স্বপ্ন দেখতে?

উত্তর দিলে, স্বপ্ন দেখতাম, ওর সঙ্গে আমিও পচে গলে গেছি। বরং তখন আরো আনন্দ হোত! তুমি কি ভাবো ঐ পরিবর্তনকে আমি ডরাই? আমি তো শবাধারের ডালা খুলে তা-ই আশা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম তা হয়নি। আর আমার মৃত্যুর আগে তা হবেও না। তাছাড়া ওর ঐ কামনাহীন দেহ যদি না দেখতাম, আমার ভিতর থেকে ঐ অদ্ভুত অনুভূতি তো মিলিয়ে যেত না। জান তো, ওর মৃত্যুর পরে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ভেবেছি, ওর আত্মা আমার কাছে ফিরে আসুক। ভূতে আমার খুব বিশ্বাস। আমার তো মনে হয়, ওরা আমাদের ভিতর এই পৃথিবীতে এসে থাকতে পারে। ওকে যেদিন কবর দেওয়া হয়, সেদিন তুষার ঝরছিল। আমি সন্ধ্যের দিকে গীর্জায় গেলাম। উঃ, কেমন শীতকাল আর কি। চারদিক নিরিবিলি, নিঝুম। আমার ভয় ছিল যে ওর ঐ হাঁদা স্বামীটা এখনো ওখানে ঘুরঘুর করে বেড়াবে। আর অন্য কারো তো কোনো দরকার নেই সেখানে আসবার। একা আমি। তখন আমি একা! হঠাৎ আমার খেয়াল হোল—আমাদের ভিতরে দুহাত মাটির মাত্র ব্যবধান। মনে মনে বললাম, ওকে জড়িয়ে ধরবো; ও যদি ঠাণ্ডা হয়ে

যায়, আমার মনে হবে উত্তুরে হাওয়া আমাকে ঠাণ্ডা করে দিলে। ও যদি অনড় হয়ে যায়, আমি মনে করবো এতো ওর মৃত্যু নয়—ঘুম। একটা শাবল নিয়ে এসে খুঁড়তে লাগলাম। শবাধারের উপর বারবার আঘাত পড়তে লাগলো। এবার হাত দিয়ে শুরু করলাম। কাঠ স্ক্রুর চারদিকে মড় মড় করে উঠলো, প্রায় কাজ হাঁসিল করে এনেছি—এমন সময় মনে হোল কে যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তখনো নুয়ে পড়ে আছি। বিড়বিড় করে বললাম, ডালাটা যদি খুলতে পারি—তারপর দিক না ওরা ওকে আর আমাকে মাটি চাপা। আরো জোরে ডালা ধরে টানা-হেঁচড়া করতে লাগলাম। আবার দীর্ঘনিশ্বাস। এবার আরো কাছে। মনে হোল, খানিকটা গরম নিশ্বাস যেন কে আমার উপর বুলিয়ে দিয়ে গেল। তখন কোনো রক্তমাংসের জীব তো কাছে ছিল না। অন্ধকারে যেন এক অ-দেহী দেহ ফুটে উঠলো। দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। আমার মনে হোল—এতো ক্যাথি, কেমন যেন স্বস্তি পেলাম—সমস্ত দেহে চারিয়ে পড়লো। টানা-হেঁচড়া খান্ত হোল, শান্তি এল মনে। ও আছে আমার কাছে। মাটি আবার চাপা দিলাম। বাড়ি ফিরে এলাম। তুমি হাসতে পার নেলি, কিন্তু আমি তো ওকে ঠিক দেখেছিলাম। ও ছিল আমার কাছে, ওর সঙ্গে আমি কথাও বলেছিলাম। হাইটস্-এ পৌঁছে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। বন্ধ দরজা। দুই আপদ আর্ণ-শ আর আমার স্ত্রী পথ জুড়ে এসে দাঁড়াল। হেয়ারটনকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে সোজা ছুটে গেলাম আমার ঘরে। এই তো ওর কামরা। চারদিকে অস্থির হয়ে তাকালাম—ওকে আমার পাশে যেন অনুভব করছি। যেন দেখতেও পেলাম—আবার বুঝি পেলামও না। কামনায় বুঝি আমার সমস্ত রক্ত ঘাম হয়ে ঝরে পড়ছিল—অনুনয় বিনয়ে তখন আমি অধীর। ওকে এক ঝলক দেখতে চাই—এক পলক দেখতে চাই! কিন্তু দেখা তো পেলাম না। ও আমার কাছে তেমনি শয়তান হয়ে দেখা দিল—যেমন জীবনে দেখা দিয়েছিল। সেই থেকে প্রায়ই তো ওর ঐ অসহ্য নির্যাতনের আমি ক্রীড়নক হতাম। উঃ, কি নরক যন্ত্রণা! আমার স্নায়ু যদি পশুর নাড়ির মতো শক্ত না হোত, এতদিনে বোধ হয় আমার ঐ লিন্টনের

দশাই হোত। হেয়ারটনের সঙ্গে যখন বাড়িতে বসে থাকতাম, মনে হোত বাইরে গেলে বুঝি ওর সঙ্গে দেখা হবে। আবার জলার ধারে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে হোত, বাড়িতে বুঝি ওর দেখা মিলবে। বাড়ি থেকে কোথাও গেলে, মনে হোত ও বুঝি হাইটস্-এ আমার জন্যে বসে আছে। যখন ওর ঘরে আমি ঘুমোতে যেতাম, কিছুতেই ঘুম আসতো না। হাই তুলে চোখ বুঝতাম, ও অমনি জানালার বাইরে এসে দাঁড়াত। নয়তো খড়খড়ি তুলতো, নয়তো এসে আমারই পাশে বালিশে মাথা এলিয়ে দিত। আবার চোখ খুলে দেখতে হোত। রাতে হাজার বার এমনি চোখ খোলা আর বোজা চলতো। শুধু নিরাশা—আর নিরাশা! খেপে যেতাম! কখনো বা গর্জে উঠতাম। জোসেফ পাজিটা ভাবতো, আমার বিবেকের তোলপাড় শুরু হয়েছে। কিন্তু ওকে দেখার পরে তো আমি শান্ত হয়েছি। একটু বুঝি শান্তি পেলাম। এমনি অদ্ভুতভাবে ও আমাকে খুন করছিল। তিলে তিলে নয়। আশা দিয়ে আর বঞ্চনা করে দগ্ধে দগ্ধে মেরেছে ও আমাকে এই আঠারো বছর ধরে।

হিথক্লিফ থামলো। কপালের ঘাম মুছলো, চুল নেতিয়ে পড়েছে, ঘামে লেগে লেগে আছে। দগ্ধ কাঠের শেষ রক্তরাগের দিকে তাকিয়ে আছে। ভ্রূকুটি নেই। শুধু উপরে তোলা ভ্রূ। এতে যেন মুখের ভীষণতা আর নেই, যেন কেমন বিভ্রান্ত হিথক্লিফ। ব্যথাতুর হিথক্লিফ, ভাবগম্ভীর হিথক্লিফ! ও তো আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেনি একথা। এতো আমাকে উপলক্ষ্য করে ওর স্বগতোক্তি! আমি তাই চুপ করেই রইলাম। ওর কথা শুনতে ভাল লাগছে না! ও আবার ছবিখানা দেখতে লাগলো। খুলে নিয়ে এল দেয়াল থেকে, সোফায় হেলান দিয়ে বসিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেল। ও যখন এমনি বিভোর, এমনি সময় ঢুকল ক্যাথি। ও বললে, ও তৈরী। ওর টাট্টুঘোড়া এখন তৈরী হলেই হয়।

হিথক্লিফ আমাকে বললে, ওটা কাল পাঠিয়ে দিও। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে, টাট্টুঘোড়া ছাড়াও তোমার চলবে। রাত তো চমৎকার। আর ওয়াদারিং হাইটস্-এ টাট্টু নিয়ে কি করবে, যা চলা ফেরা করবে পায়ে হেঁটেই তা পারবে। এবার চল!

আমার খুদে মনিবানী আমার কাছে এসে ফিস ফিস করে বললে, এলেন, আমি আসি! ও চুমু খেল, ওর ঠোঁট যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। এলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে তো? ভুলো না যেন!

ওর নতুন বাপ বললে, দেখ মিসেস ডীন, অমন কাজও কোরো না। তোমার সঙ্গে কথার দরকার থাকলে আমিই এখানে আসবো। আমার বাড়িতে গোয়েন্দাগিরি করতে তুমি আসতে পারবে না।

ও ইসারা করলে চলে আসতে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে মেয়ে চলে গেল। উঃ, বুকে দাগা দিয়ে গেল ওর চাহনি! জানালা দিয়ে দেখলাম, বাগানের পথে ওরা চলেছে। হিথক্লিফ ওর হাত ধরে আছে। ও প্রথমে হয়তো আপত্তিই করেছিল। কিন্তু ওর আপত্তি তো টেকেনি।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ওকে নিয়ে পথে গিয়ে উঠলো। এবার মিলিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

তিরিশ

আমি হাইটস্-এ গেলাম বটে, কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হোল না। ওর দরজার কাছে যেতেই জোসেফ পথ রোধ করে দাঁড়ালো। যেতে দেবে না। ও বললে, মিসেস লিণ্টনের সঙ্গে দেখা হবে না। মনিবের বারণ। জিলা আমাকে কিছু কিছু বলেছে। তা নইলে জানতাম না কে বেঁচে আছে কে মরেছে। ক্যাথি ওর কাছে দেমাকী মেয়ে, ও তাই ওকে পছন্দ করে না।

ওর কথা শুনেই টের পেয়েছি। আমাদের ক্যাথি এসে ওর কাছে কোনো ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু হিথক্লিফ ওকে বলেছে নিজের কাজ করতে। আর ক্যাথিকেও নিজের কাজ করতে হুকুম দিয়েছে। জিলা ঘোর স্বার্থপর মেয়ে। ও তাতেই রাজি। কিন্তু ক্যাথি ওর এই হুকুমের অবহেলায় খুশি হয় নি। তাই ও তাকে ঘৃণা করে। আমার সংবাদদাত্রী ওর এখন শত্রু। আপনার

আসার সপ্তাহ ছয়েক আগে জিল্লার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জলার ধারেই দেখা। তখন ও অনেক কথাই বললে।

ও বললে, যেদিন মিসেস লিণ্টন হিথক্লিফ প্রথম গেলেন, উনি তো আমাকে আর জোসেফকে কোনো কথা না বলেই সোজা গিয়ে উঠলেন উপরে। লিণ্টনের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর সেখানে রাত কাটালেন। সকালে হেয়ারটন আর মনিব বসে ছোট হাজিরি খাচ্ছেন, এমন সময় এসে কাঁপতে কাঁপতে বললেন ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হবে কিনা। তাঁর স্বামীর ভীষণ অসুখ। হিথক্লিফ উত্তর দিলেন, আমরা তা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু ওর জীবনের আর কানাকড়িও দাম নেই। ওর জন্যে তাই আর কানাকড়িও ব্যয় করবো না।

উনি বললেন, কি উপায় হবে! কেউ যদি না এসে দেখে, ও যে মরবে!

মনিব চেঁচিয়ে উঠলেন, ঘর থেকে বেরিয়ে যাও! ওর কথা আমি শুনতে চাইনা। ওর কি হবে না হবে তা নিয়ে কেউ এখানে মাথা ঘামায় না। তোমার যদি এতই মাথাব্যথা, বেশ তো গিয়ে সেবা কর। যদি না ইচ্ছে হয় তো, ওকে ঘরে চাবি বন্ধ করে অন্য ঘরে গিয়ে বসে থাক।

উনি তো আমাকে বিরক্ত করতে লাগলেন। আমি মুখের উপর জবাব দিলাম, ঐ আপদটিকে নিয়ে আমি ঢের সয়েছি আর সইব না। আমার ঢের কাজ। উনি বরং নিজের সোয়ামীকে নিয়ে থাকুন গে! মনিব তো আমাকে সেই কথাই বলে দিয়েছেন।

কি হোল, কি করে বলবো। রাতদিন কাতরানি আর গোঙানি! তোমার খুদে মনিবানীর তো আর সুস্থির নেই। ওর ফ্যাকাশে মুখ আর ফোলা চোখ দেখেই তা বোঝা যেত। উনি মাঝে মাঝে পাগলের মতো এসে হাজির হতেন রান্নাঘরে। মনে হোত সাহায্য পেলে বুঝি খুবই খুশি হন। কিন্তু মনিবের হুকুম কে অমান্য করবে বল! কখনো তা করিনি, কিন্তু তবু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো—কেনেথ ডাক্তারকে ডাকলেই বুঝি ভাল হোত। তবু আমার তো ব্যাপার নয়। আমি নালিশ করবারই বা কে, সলাপরামর্শ দেবারই বা কে বল! আমি কেন উপর পড়া হয়ে গিয়ে নাক গলাই! নিজের ঘরে শুতে গিয়ে

দরজা খুলে মাঝে মাঝে দেখতাম, দেখতাম নিশুথি রাতে সিঁড়িতে বসে বসে কাঁদছেন। কি জানি মন যদি হঠাৎ ওঁর দুঃখে গলে যায়, তাই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিতাম। কাজ কি বাপু ওসব হাঙ্গামায় আমার তখন ওঁর জন্যে একটু মায়া হচ্ছিল কিন্তু মায়া দেখাতে গেলে যে চাকরী থাকে না।

একদিন শেষে উনি সাহস করে আমার ঘরে এলেন। আমাকে ভয় পাইয়েই দিলেন,

তোমার মনিব মিঃ হিথক্লিফকে বল, তাঁর ছেলে মারা যাচ্ছে! এ যাত্রায় আর বাঁচবে না। যাও, এখুনি গিয়ে বল!

এই কথা বলে উনি চলে গেলেন। আমি মিনিট পনেরো ধরে কান পেতে রইলাম। বাবাঃ, সারা গা থর থর করে কাঁপছিল। বাড়ি তো নিঝুম, কারও সাড়া শব্দ নেই।

আপন মনে ভাবলাম ওঁর ভুল হয়েছে! নিশ্চয়ই আমাদের ছোট কর্তা ধকল সামলে উঠেছেন। এখন আর বিরক্ত করে লাভ নেই। ঝিমুনি এল। কিন্তু আমার ঘুম ঘন্টির জোর আওয়াজে ভেঙে গেল। এইটেই ছোট কর্তার জন্যে ব্যবস্থা। মনিব আমাকে ডেকে পাঠালেন, কি ব্যাপার দেখতে, আর এও জানিয়ে দিতে বললেন, দুপুর রাতে এত আওয়াজ যেন দোসরা বার না হয়।

আমি ওর দেওয়া খবরটা বললাম। উনি রেগে মেগে অস্থির। শেষে মোম জালিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। চললেন ওদের ঘরের দিকে। আমি পেছনে। গিয়ে দেখি, মিসেস হিথক্লিফ বিছানার পাশে বসে আছেন। ওঁর শ্বশুর কাছে গিয়ে আলোটা তুলে ধরলেন লিণ্টনের মুখের উপর। তাকে ঠেলা দিলেন। তারপর ছেলের বৌয়ের দিকে ফিরে বললেন,

এখন—এখন কেমন বুঝছো ক্যাথি?

ক্যাথি তো তখন বোবা বনে আছে।

উনি আবার বললেন, এখন কেমন হোল?

ক্যাথি জবাব দিলেন, ও বেঁচেছে, এখন আমার স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো—

কিন্তু নিজের রাগতো চেপে রাখতে পারলেন না, বললেন, আপনি আমাকে এতদিন একা মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এমনি করে আমি মৃত্যুকে অনুভব করবো, দেখবো। শুধু মৃত্যুই হবে আমার সাথী। সত্যি, সত্যি তাই হয়েছে। আমি নিজেই মরে গেছি।

সত্যিই গো, উনি তখন তো যেন মরার মতো। একটু মদ এনে দিলাম তাড়াতাড়ি। হেয়ারটন আর জোসেফ ঘণ্টি শুনে জেগে উঠেছিল, ওরা এসে ঢুকলো। জোসেফ তো খুশি। হেয়ারটন যেন বিরক্ত। ও তখন ক্যাথির দিকেই তাকিয়ে আছে। লিণ্টনের দিকে তাকাবার ওর ফুরসৎ নেই। মনিব তাকে চলে যেতে বললেন। তার কোনো দরকার নেই জানিয়ে দিলেন। জোসেফকে দিয়ে মৃতদেহটি নিজের কামরায় নিয়ে এলেন। এবার আমার উপর নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়বার হুকুম হোল। মিসেস হিথক্লিফ তাঁর ঘরে একা রইলেন।

ভোরে মনিব আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন উনি যেন ছোট হাজিরির সময় আসেন। উনি তখন পোষাক ছেড়ে সবে শোবার যোগাড় করেছেন। বললেন, অসুস্থ আছেন। আমি অবাক হলাম না। মনিবকে গিয়ে সেই কথাই বললাম।

বললেন, অন্তত এই ক'টা দিন সুস্থ থাক! যাও, গিয়ে দেখ, ওর কি দরকার। সুস্থ হলেই আমাকে জানাবে।

ক্যাথি পুরো একপক্ষ ধরে নিজের কামরায় রইল। জিল্লা তো তাই বলেছে, জিল্লা দিনে দুবার ওর কাছে যেত। একটু যেন বন্ধুত্বও হোল। কিন্তু যত ভাব করতে যাক, ক্যাথি ওকে আমলই দিলে না।

হিথক্লিফ নিজে একবার ওর ঘরে গেলেন লিণ্টনের উইলখানা দেখাতে। সে তার সমস্ত সম্পত্তিই—ক্যাথির সম্পত্তিও বলতে পারেন—তার বাপকে দিয়ে গেছে। ক্যাথি এক সপ্তাহ ছিল না, এর মধ্যে বাপ শাসিয়ে, ভয় দেখিয়ে এই কাজটা হাসিল করে নিয়েছে। ও নাবালক বলেই স্থাবর সম্পত্তি দান করতে পারেনি। কিন্তু হিথক্লিফ সেগুলির উপরও তার স্ত্রীর অধিকার হিসেবে দাবি

জানালো। আইনত ব্যাপারটা সঙ্গতই হবে। তাছাড়া ক্যাথির তো টাকাকড়ি বন্ধু বান্ধব কিছুই নেই। কে ওর দাবি অগ্রাহ্য করবে ?

জিল্লা বলেছিল, তখন তো কেউ ওঁর ঘরের ছায়া মাড়ায় না। শুধু আমিই যেতাম গো! উনি এক রোববার বিকেলে বহুদিন পরে বেরিয়ে এলেন! যখন খাবার নিয়ে গিছলাম উনি বলেছিলেন; বড় ঠাণ্ডা। আমি বললাম, মনিব থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জে যাচ্ছে, আমি আর হেয়ারটন তাঁকে বাধা দেব না। উনি স্বচ্ছন্দে নেমে আসুন না নীচে। মনিবের ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতেই কালো পোষাক পরে উনি নেমে এলেন। হলদে চুল সেদিন কানের পাশে আঁচড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু গোছা গোছা এসে পড়ছিল মুখে।

জোসেফও তখন গীর্জায়। আমি যাইনি। আমি হেয়ারটনকে জানালাম আমাদের সঙ্গে এসে বস্‌তে পার। হেয়ারটন তো শুনে নিজের কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। সাফ-সুতরো হয়ে নেবে এই ওর ইচ্ছে। ও যেন ফিটফাট হতেই চায়। আমি তো হেসেই খুন। মনিব থাকলে তো হাসতে পারিনে। শেষে আমিই বললাম, আমি সাফা হতে সাহায্য করতে পারি। ওকে ঠাট্টাও করলাম। অমনি ওর মুখখানা গোমড়া হয়ে গেল।

জিল্লা বলে গেল, ওগো তুমি তো ভাব, তোমার খুদে মনিবানীটির হেয়ারটন একেবারে যোগ্য নয়। কিন্তু ওর ঐ দেমাক ভেঙে দেবারই আমার ইচ্ছা হোল। ওর এমন রুচি, এমন বিদ্যাবুদ্ধি থেকে কি হোল বলত? ওতো তোমার আমার মতোই ফকির বনে গেল। বরং আমাদের চেয়েও ফকির। তোমার আমার তো তবু দু-এক পয়সা পুঁজি আছে।

হেয়ারটন জিল্লার সাহায্য নিলে। ক্যাথি যখন এল, সে যে ওকে ভ্রূক্ষেপ করে না, বরং অপমানই করে একথা ভুলে গিয়ে ও নিজেকে মানিয়ে নিতে চাইলে।

জিল্লার কথায়ই বলি। সে বললে, আমাদের ছোট কর্ত্রী তো এসে হাজির হলেন। ঠাণ্ডা যেন বরফ আর দেমাকে যেন রাজার ঝিয়ারী। আমি উঠে ওকে চেয়ারখানায় বসতে বললাম। ও আমার ভদ্রতা দেখে নাক কুঁচকে রইল।

হেয়ারটনও উঠে পড়ে ওকে আগুনের কাছে আসতে বললে। ওর ধারণা, ক্যাথি বহুদিন উপোস করে আছে।

ও জবাব দিলে, আমি একমাসের উপরে উপোস করে আছি। আজ নতুন জানলে নাকি!

স্বরে কি ঘৃণা!

নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমাদের থেকে দূরেই গিয়ে বসে পড়লো। চারদিকে তাকাচ্ছে। কতগুলি বই দেখতে পেয়ে তখুনি সেগুলি দেখবার জন্যে উঠে পড়লো। হাত বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু উঁচুতে রাখা হয়েছে। হেয়ারটন শেষে সাহস করে ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল! ও নিজের পোষাক পেতে রইল, আর হেয়ারটন যা হাতের কাছে পায় ওর পোষাকের উপর ফেলে দেয়। আঁজলা ভর্ত্তি হয়ে গেল।

হেয়ারটন যথেষ্ট সাহস দেখালে। কিন্তু ও মুখে ধন্যবাদটাও দিলেনা। তবু হেয়ারটন খুশি। ওর সাহায্য চেয়েছে, ওকে নিজের পেছনে দাঁড়াতে দিয়েছে এতেই ওর আনন্দ! এমন কি ও ঝুঁকে পড়ে ছবিও দেখতে লাগলো। হেয়ারটন এবার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললে। ছবি দেখা ভুলে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ক্যাথি পড়ছে, নয়তো কিছু বেছে নিয়ে পড়বার জন্য পাতা উলটে যাচ্ছে। হেয়ারটনের দৃষ্টি ওর রেশমের গোছার মতো চুলে। মুখও দেখতে পাচ্ছে না, ক্যাথিও দেখতে পাচ্ছে না ওর মুখ। হেয়ারটন কি করছে সে নিজেই জানে না। মোমের বাতি দেখলে শিশু যেমন তাতে হাত বাড়িয়ে দেয়, ও তো তেমনি চুলের উপর হাত বুলিয়ে দিলে। এ যেন পাখীর মতো হালকা হাতের ছোঁয়া—আলতো ছোঁয়া। ক্যাথি এমনভাবে ফিরে তাকাল, মনে হোল যেন ওর গলায় ছুঁরি বিঁধেছে।

দূর হও! কি সাহস তোমার! আমাকে ছুঁলে? এখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? না, না, তোমাকে আমার সহ্য হয় না। আমার কাছে এলে আমি এখুনি উপরে চলে যাব।

হেয়ারটন বেচারী তো বোকা বনে গেল। ও চুপ করে বসে রইল। আর

এদিকে ক্যাথি পাতার পর পাতা উল্‌টে-পাল্‌টে চললো। এবার হেয়ারটন আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বললে,

জিল্লা, ওকে আমাদের কিছু পড়ে শোনাতে বল না! আমার তো হাতে এখন কাজ নেই। তাছাড়া ওর পড়া শুনতে ভালও লাগবে। আমি যে বলেছি, একথা বোলো না। তোমার নিজের ইচ্ছে তাই বল।

আমি তখুনি বলে ফেললাম, ঠাকরুন গো, মিঃ হেয়ারটন তোমাকে কিছু পড়ে শোনাতে বলছেন। উনি তো শুনে বর্তে যাবেন!

উনি ভ্রূকুটি করে বললেন,

দেখ তোমাদের এসব ভণ্ডামি আমি ঘৃণা করি। তোমাদের আমি ঘৃণা করি—তোমাদের কাছে পড়া তো দূরের কথা—কথা বলতেও আমার ইচ্ছে করে না। যখন তোমাদের একটা কথা শুনলে, তোমাদের কারো মুখ দেখতে পেলে বর্তে যেতাম, তখন তো তোমরা আমাকে এড়িয়েই চলতে। না, না, তোমাদের কাছে ও নালিশ করে ফল নেই। তবে বলি শোন, ঠাণ্ডা থেকে রেহাই পাবার জন্য এখানে এসেছি—তোমাদের চাঙ্গা করে রাখতে আসিনি।

হেয়ারটন বলে উঠলো; আমি কি করলাম! আমার দোষ কি?

ক্যাথি বলে উঠলো, তুমি ওদের দলছাড়া নাকি! তাইত—তাতো জানতাম না!

ওর ব্যঙ্গে লজ্জিত হয়ে বললে, বারে, আমি কতবার হিথক্লিফকে বলেছি, আমি তোমাকে গিয়ে সাহায্য করি—

চুপ, চুপ! তোমার ঐ কথা শোনবার চেয়ে আমি এখুনি বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

হেয়ারটন বিড় বিড় করে বললে, ও গোল্লায় যাক না! এইবার যেন ওর জিভের ধার বেড়ে গেল। আর ক্যাথি আবার চুপ করে রইল। বাইরে তুষারপাত শুরু হয়েছে। ওর যতই গর্ব থাক ওকে আমাদের সঙ্গে বসতে হোল। ও এখন ক্ষেপে আছে। কাউকে গ্রাহ্যি করে না! মনিবও যদি তেড়ে আসে, ও রুখে দাঁড়াবে। যত ব্যথা পাচ্ছে, তত যেন ওর বিষ বাড়ছে।

জিলার কাছ থেকে খবরটা শুনে মনে হোল, এ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ক্যাথিকে নিয়ে আমি ছোটখাটো বাড়ি ভাড়া করে থাকবো। কিন্তু তা তো হবার জো নেই। ও আবার বিয়ে না করলে স্বাধীনতা পাবে না। কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থা আমি কি করে করবো! এক যদি আপনি করেন।

মিসেস ডীনের গল্প শেষ হোল।

ডাক্তারের ভবিষ্যদ্‌বাণী বিফল করে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠছি। ভাবলাম, জানুয়ারী মাসে যাব ওয়াদারিং হাইটস্‌-এ। আমার বাড়িওয়ালাকে জানাব ছ'মাস আমাকে লণ্ডনে থাকতে হবে। অক্টোবরের পরে তিনি আর একজন ভাড়াটে এনে বসাতে পারেন। আর একটা শীত এখানে আমার পক্ষে কাটানো সম্ভব নয়।

একত্রিশ

গতকাল ছিল উজ্জ্বল, শান্ত দিন। হাইটস্‌-এ আমি গেলাম। মিসেস ডীন অনুরোধ করলে, তার ক্যাথির হাতে একখানা চিঠি দিতে হবে। আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। সদর দরজাটা খোলাই ছিল। কিন্তু ফটক বন্ধ। আমি ধাক্কা মারতেই বাগান থেকে এল হেয়ারটন। ও এসে ফটকের শেকলটা খুলে দিলে। এবার আমি ঢুকে পড়লাম। ওর দিকে এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। উদ্ধত, বর্বর, কিন্তু ও সুশ্রী। শুধালাম, হিথক্লিফ বাড়িতে আছেন কিনা। ও না-ই বললে। খাবার সময় ফিরবেন। এগারোটা বাজে তখন। বললাম, আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবো। ও তখনি আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

ক্যাথেরিন সেখানে ছিল। ও শাক-সব্জী রান্না করছিল। থমথমে ওর মুখখানা, আর কেমন যেন মনমরা। গতবারে যেমন জীবন্ত দেখেছিলাম, তেমনটি নেই। আমাকে দেখে একবার চোখ তুললো-কি-তুললো না। অভ্যর্থনার বালাই নেই। নিজের কাজ করে চললো। আমার অভিবাদনের কোনো প্রত্যুত্তর নেই।

আপন মনেই ভাবলাম, মিসেস ডীন যা-ই বলুক, ও মোটেই ভদ্র নয়। তবে সুন্দরী বটে, কিন্তু দেবদূত নয়!

হেয়ারটন ওকে বেশ রুক্ষস্বরেই ওর হাঁড়িকুড়ি নিয়ে রান্নাঘরে যেতে বললে। ও রান্নার পালা শেষ করে সেগুলিকে ঠেলে সরিয়ে রেখে বললে, হাঁড়িকুড়ি নিয়ে চলে যেতে হয়, তুমি যাও! জানালার পাশে একখানা টুলের উপর এসে বসলো। সেখানে বসে ডুমুরের খোসা দিয়ে পাখী বা জীবজন্তু তৈরী করতে লাগলো। আমি কাছে এগিয়ে এলাম। যেন বাগান দেখতেই এলাম, তারপর বেশ কৌশলেই মিসেস ডীনের চিঠিখানা ওর কোলের উপর ফেলে দিলাম। হেয়ারটন দেখতেই পেলে না। কিন্তু ও বেশ জোরেই জিজ্ঞেস করে বললো, ওটা কি? তারপর তুলে নিলে।

আপনার পরিচিত বন্ধুর লেখা—ঐ যে গ্রেঞ্জে যে কাজ করে, একটু বিরক্ত হয়েই বললাম। আবার ভয়ও হোল, ও যদি আমার চিঠি বলেই মনে করে। ও হয় তো এই সংবাদ পেয়ে লুকিয়েই ফেলতো, কিন্তু হেয়ারটন ওর চেয়ে ক্ষিপ্র, সে চিঠিখানা নিয়ে নিজের ওয়েস্টকোটের পকেটে পুরলো। বললে, আগে মিঃ হিথক্লিফ পড়বেন, তবে আর কেউ। ক্যাথেরিন নিঃশব্দে আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, তারপর অলক্ষ্যে রুমাল বার করে চোখ মুছলে। ওর ভাই নিজের কোমল অনুভূতি দমনের প্রচেষ্টা করলো, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে চিঠিখানা। ক্যাথেরিন ব্যগ্র হয়ে তুলে নিয়ে পড়লো। এবার আমাকে ওর বাড়ি সম্বন্ধে কতগুলি প্রশ্ন করলে। সংলগ্ন আর অসংলগ্ন প্রশ্নের ভিড়। তারপর পাহাড়ের দিকে চেয়ে আপন মনে বললে, ওখানে গিয়ে মিনির পিঠে সওয়ার হতে ইচ্ছে করে! ওখানে চলে যেতে চাই। আমি ক্লান্ত। ও জানালার কাঠের উপর মাথা রাখলো। হাই তুলে চুপ করে গেল।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, মিসেস হিথক্লিফ, আপনি হয়তো চিনতে পারেন নি—আমি আপনার পূর্ব পরিচিত। আপনার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে, আমি আসতেই কথা বলেন নি—এতেই আমার অদ্ভুত লাগছে।

মিসেস ডীন তো আপনার কথাই বলে। আপনার যদি কোনো খবর নিয়ে না যাই ওতো নিরাশই হবে।

ও কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এলেন আপনাকে বলেছে? আপনার সঙ্গে ওর কি বন্ধুত্ব?

যথেষ্ট—যথেষ্ট!

ওকে বলবেন আমি ওর চিঠির উত্তর দেব। কিন্তু লেখার সরঞ্জাম আমার কিছুই নেই। একখানা বইও নেই যেখান থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখবো!

বই নেই! সে কি, এখানে আছেন কি করে? আমার বইয়ের সংগ্রহ তো বেশ বড় তবু গ্রেঞ্জের জীবন আমার এক ঘেয়ে ঠেকে! আমার বইগুলো যদি এখন কেউ কেড়ে নিয়ে যায়, তাহলে ক্ষেপে যাব।

ক্যাথি বললে, বই থাকতে তো খুবই পড়তাম। কিন্তু মিঃ হিথক্লিফ কখনো বই পড়েন না। তাই তিনি আমার বইগুলো সব কেড়ে নিয়েছেন। আজ ক' সপ্তাহ ধরে একখানা চোখেও দেখিনি। জোসেফের তো একগাদা ধর্মের বই। তবে হেয়ারটন—তোমার ঘরে কতকগুলো বই লুকানো আছে দেখেছিলাম। আমি নিয়ে আসতেই তুমি আবার সেগুলি নিয়ে চলে গেলে। তোমার তো ওগুলো কোনো কাজেই আসবে না। নিজে যা উপভোগ করতে পারনা, অন্যকে তা দেবে না এই কি তোমার ইচ্ছে! না, তোমার ঐ মনিবের হুকুমে একাজ করেছ। কিন্তু আমার মগজে বহু বইয়ের ছাপ আছে, সেগুলো তো আর কেড়ে নেওয়া যাবে না।

হেয়ারটন লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো, সে অস্বীকার করলে এ অভিযোগ।

আমি ওকে বললাম, মিঃ হেয়ারটন হয়তো তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়াতে চান। আপনার উপরে ওঁর ঈর্ষা নেই বরং আপনার প্রেরণায় উনি উদ্বুদ্ধ। ক' বছরের ভিতরে উনি হয়তো মস্ত বিদ্বান হয়ে উঠবেন।

ক্যাথি উত্তর দিলে, আর এর মধ্যে আমি হবো মহামূর্খ! হাঁ, বানান করে পড়তে মাঝে মাঝে শুনি বটে—ভুলও বেশ করে। হেয়ারটন, তোমাকে রোজই

দেখি, শক্ত কথার মানে বার করার জন্ত অভিধান ঘাঁটছো—আবার মানেটা বার করে বুঝতে না পেরে আপন মনে গাল পাড়ছ।

যুবক ওর কথায় লজ্জিত। সে চায় না, কেউ ওকে উপহাস করুক। তাই সে উঠে পড়ে লেগে গেছে ওর নিজের অজ্ঞানতা ঘুচাতে। মিসেস ডীনের বলা সেই ঘটনাটা মনে পড়লো। অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে ও পালিত। ওর ভিতরে আলোর আমদানির জন্ত ওর সেই প্রথম প্রচেষ্টা। আমি তাই মন্তব্য করলাম,

মিসেস হিথক্লিফ, আমরা সবাই তো প্রথমে এমনি করে শুরু করি। কিন্তু আমাদের শিক্ষকরা আমাদের বিদ্রূপ তো করেনই না বরং উৎসাহই দেন।

ক্যাথি উত্তর দিলে, আমি ওকে বিদ্রূপ করি না। কিন্তু আমার বই ও কেড়ে নেবে কেন? আর যত ভুল উচ্চারণ করে করে আমাকে জ্বালাবে কেন? আমার কাছে কাব্য আর গদ্য হচ্ছে পবিত্র জিনিস। সেগুলি ওর মুখে তো বিকৃত উচ্চারণে অপবিত্র হয়ে ওঠে। আমি যে-সব কবিতা সব সময়েই আওড়াই ও হিংসে করে সেইগুলি আমাকে বিকৃত করে অহরহ শোনায়।

হেয়ারটন নীরব। বিবাদ আর ক্রোধের সংগ্রাম চলছে ওর বুকে। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর খানছয়েক বই এনে ক্যাথির কোলের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, নাও, নাও—আমি কখনো ও বই পড়বো না, ও বইয়ের কথা ভাববো না, কানে শুনতে চাই না ওদের নাম!

ক্যাথি উত্তর দিলে, আমিও চাইনা, তোমার সংস্পর্শে এসে ও বইগুলো আমার কাছে এখন অস্পৃশ্য। আমি ওদের ঘৃণা করি।

ক্যাথি একখানা বই খুলে বসলো। তারপরে প্রথম পড়ুয়ার সুরেলা স্বরে পড়ে চললো। এবার হেসে বইখানা ছুড়ে ফেলে দিলে।

হেয়ারটনের নিজের উপর মমতা যথেষ্ট—আর অত্যাচার ওর সহ্য হোল না। ও ক্যাথির অমন খর জিহ্বার জন্তে শারীরিক পুরস্কার দিতে ছাড়লো না। ও শারীরিক যুক্তিটাই বোঝে অন্ত যুক্তি ওর নেই। এবার বইগুলো জড়ো করে

নিয়ে আগুনে ফেলে দিলে। তবু ওর মুখে যে ব্যথা ফুটে উঠলো তা আমার নজর এড়িয়ে গেল না।

ক্যাথি গালে হাত বোলাতে বোলাতে অলস দৃষ্টি হেনে বলে উঠলো, তোমার মতো জংলীর উপযুক্ত কাজই হয়েছে !

চুপ, চুপ ! গর্জন করে উঠলো হেয়ারটন।

থর থর কাঁপছে, কথা বলার সামর্থ নেই ; ও এবার চলে যাচ্ছে। এমন সময় হিথক্লিফ এসে ওর ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,—

কি করছিলে ?

না, না, কিছু না ! ও চলে গেল ওর দুঃখ আর ক্রোধ নিরিবিলিতে রোমন্থন করতে।

হিথক্লিফ ওর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

সত্যিই আমি যদি ব্যর্থ হই, সে বড় অদ্ভুত ব্যাপার হবে, তিনি বিড় বিড় করে বলে উঠলেন। আমি যে পেছনে আছি তা টের পেলেন না। ওর বাবার ছবি যখন ওর মুখে দেখতে পাই, দেখি আর একখানা মুখ সেখানে ফুটে আছে। শয়তানটা ওর মতো দেখতে গেল কি করে ! ওকে তো আর সহ্য হয় না।

উনি মুখ নীচু করে ভিতরে এসে ঢুকলেন। মুখ ওর উদ্বিগ্ন, অস্থির দৃষ্টি। এমন তো আগে কখনো দেখিনি। ওঁর ছেলের বৌ জানালা দিয়ে ওকে দেখে রান্নাঘরে পালিয়ে গেলেন। আমি রইলাম একা।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি আবার বাইরে বেরুতে পারছেন জেনে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু বহুদিন ভেবেছি, এমন বনদেশে আপনি এলেন কেন ?

আমার উত্তর এল, একটা খেয়াল। কিন্তু আসছে সপ্তাহেই চলেছি লণ্ডনে। বারো মাসের আমার যে চুক্তি ছিল, তার বেশি আর আমি গ্রেঞ্জ রাখব না। আর আমার ওখানে থাকার একদণ্ডও ইচ্ছে নেই।

তিনি বলে উঠলেন, তাহলে আপনি হাঁফিয়ে উঠেছেন দেখছি। আপনি যদি এখন বাড়িটা গছিয়ে দিতে চান—আমি তাতে রাজি নই। আমার পাওনা আমি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেব।

বিরক্ত হয়ে বললাম, আপনার কাছে সে ওকালতি করতে আসি নি। আপনি যদি বলেন, এখুনি আমি আমার চুক্তি মতো দেনা মিটিয়ে দিয়ে চলে যাব।

তিনি শান্ত স্বরে বললেন, না, না, তার দরকার নেই। আপনি তো জিনিসপত্র সব রেখেই যাচ্ছেন। আপনি না এলে সেগুলো দিয়েই দেনা শোধ হবে। অতো তাড়া নেই। আমাদের এখানে খেয়ে যান। জানেন তো, যে অতিথি ঘন ঘন আসেন না, তিনি চিরদিনই সমাদর পেয়ে থাকেন। ক্যাথি, নিয়ে এস সব!

ক্যাথি একটা ট্রে-ভর্তি কাঁটা-চামচ নিয়ে ফিরে এল।

হিথক্লিফ ওর দিকে তাকিয়ে জনান্তিকে বিড় বিড় করে বললেন, তুমি জোসেফের সঙ্গে বসে খাও গে। উনি না যাওয়া পর্যন্ত রান্নাঘর থেকে বেরিও না।

ক্যাথি মেনে নিল ওঁর আদেশ। হয়ত অমান্য করার ইচ্ছেও তার নেই। ও এই দুঃখবাদীদের সঙ্গে থেকে এঁচে নিয়েছে, পৃথিবীর সবাই এমনি।

হিথক্লিফ তো ভয়ংকর আদমী, আর হেয়ারটন তো বোবা—দুয়ের সঙ্গে বসে ভোজন-পর্বটা নিরানন্দেই কাটলো। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আসতে আসতে ভাবছিলাম…ঐ বাড়িখানায় জীবন তো দুর্বহ হয়ে ওঠে। এদিকে ওর দাই-মা তো ভাবছেন, আমি আর ক্যাথি যদি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি শহরে গিয়ে সংসার পাতাই, তাহলে কত ভাল হয়। কিন্তু সে তো রূপকথারই ব্যাপার।

বত্রিশ

১৮০২—

উত্তর অঞ্চলে আমার এক বন্ধুর আমন্ত্রণে এই সেপ্টেম্বরে যেতে হয়েছিল। পথে এক সরাইখানায় নামলাম। ঘোড়ার দানাপানি, আমার খাদ্য দুয়েরই ব্যবস্থা হোল।

এরই মধ্যে দেখলাম নতুন কাটা ফসল নিয়ে চলেছে একখানা গরুর গাড়ি। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথা থেকে আসছে গাড়ি? ও বললে, গিমারটন থেকে।

মনে মনে কথাটা আউড়ে গেলাম—গিমারটন! এরই মধ্যে ঐ অঞ্চলের স্মৃতি আবছা হয়ে এসেছে। স্বপ্নের মতো মনে হয়। শুধালাম, এখান থেকে কতদূর?

পাহাড়ী পথে ভেঙে গেলে মাইল চোদ্দ হবে···

হঠাৎ আমার ইচ্ছে হোল থ্রাসক্রসগ্রেঞ্জ দেখে আসি। তখন দুপুরও হয়নি। ভাবলাম, চাই কি রাতটা ওখানেই কাটিয়ে আসবো। আমার নিজের বাড়ির ছাদের নীচে এক রাতের পান্থশালার জীবন কাটানো যাবে'খন। তাছাড়া ভূস্বামীর সঙ্গেও বোঝাপড়া হবে। আবার এ অঞ্চলে ফিরে আসতে হবে না। একটু বিশ্রাম করেই রওনা হলাম। পৌছতে তিন ঘণ্টা লাগলো।

ভৃত্যকে গ্রেঞ্জে রেখে, একাই চললাম পথ বেয়ে। গীর্জাটি যেন আরো পুরানো ঠেকছে। পরিত্যক্ত গীর্জার অঙ্গন। কবরখানার উপরে ঘাস গজিয়েছে। একটা ভেড়া আপন মনে সেই ঘাস চর্বন করছে। ওয়াদারিং হাইটস্-এ এসে গেলাম। ঢুকে পড়লাম।

পক্ষান্তরে। ওঃ তুমি একটা কি বোকারাম, আর আমি বলবো না। না পারলে, চুল ধরে টেনে দেব! কি মিষ্টি স্বর—মনে হয় যেন ঘণ্টার রুপোলী ধ্বনি কানে ভেসে এল। স্বরটি যেন রুপোলী ধ্বনি।

কে একজন স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে বললে, বেশ তো তোমার কথাই ঠিক—ওটার উচ্চারণ না হয় অমনি হোল। এবার আমাকে একটা চুমু দাও তো!

না, আগে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে পড়, একটি ভুল করলেও চলবে না!

পুরুষটি পড়তে লাগলো। দেখলাম, যুবা, পরনে সম্ভ্রান্ত পরিচ্ছদ, টেবিলের কাছে বসে আছে—সামনে বই খোলা। ওর চোখ দুটি বার বার বইয়ের পাতা থেকে কাঁধের উপর রাখা দুখানি শুভ্র সুকুমার হাতের দিকে চলে চলে যাচ্ছে। আর সেই হাত দুখানি চাপড় হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে, যখন অমনোযোগী হচ্ছে

পড়ুয়াটি। হাতের মালিকানী আছেন পিছনে। ঝুঁকে পড়ে যখন পড়া দেখছেন, ওঁর সুন্দর কেশগুচ্ছ এসে মিলছে যুবকের কেশে। অলকে—অলকে মিলন। ওঁর মুখ—মুখখানা যে দেখতে পাচ্ছে না ভালই—নইলে তো স্থির থাকতে পারত না। ওই সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে গেলাম।

পড়া শেষ হোল নির্ভুলভাবে, ছাত্রটি এবার পুরস্কার দাবি করে বসলো। অন্তত পাঁচটা চুম্বন তো লাভ করলো। কিন্তু সেও উদারভাবে চুম্বন ফিরিয়ে দিতে কসুর করলে না। ওরা এবার এল দরজার কাছে, ওদের কথাবর্তা থেকে বুঝতে পারলাম, ওরা এখুনি বেরিয়ে আসবে, জলার ধারে যাবে বেড়াতে। এখানে যদি এখন থাকি, তাহলে ঐ যুবক আমাকে শাপান্ত করে ছাড়বে। হেয়ারটনের সেই গালাগালের স্বভাব কি আর গেছে! আমি তাই রান্না ঘরে চলে এলাম। দেখি, দরজা জুড়ে বসে আছে পুরানো দিনের বান্ধবী নেলি ডীন, বুনছে আর গুনগুন করে গান গাইছে। আবার ভিতর থেকে আসছে রুক্ষস্বর ভেসে।

রুক্ষ স্বর স্পষ্ট শোনা গেল, আর পারিনে বাপু! ভগবান, তুমিই দেখো, ধম্মে সইবে না গো, সইবে না, নরকের আগুনে পুড়ে মরবে না!

আমাদের গায়িকাটি উত্তর দিলে, না গো না, আগুনের উপর আরামে চেপে বসে জিরিয়ে নেব। কিন্তু তুমি বাপু বাইবেল পড় না! আমার ভাল লাগছে, তাই গান গাইছি।

আবার শুরু করতে যাচ্ছিল নেলি, এরই মধ্যে আমি এগিয়ে এলাম, আমাকে দেখে ও চেঁচিয়ে উঠলো, আপনি মিঃ লকউড! আপনি এসেছেন! থ্রাসক্রস তো বন্ধ, আমাদের একটা নুটিশ দেওয়া আপনার উচিত ছিল।

বললাম, কালই আবার সব বিলিব্যবস্থা করে চলে যাচ্ছি। তারপরে তুমি এখানে এলে কি করে?

জিলা চলে গেল, আপনি লণ্ডনে যাবার পরেই হিথক্লিফ আমাকে এখানে চলে আসতে বললে। আপনার ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবার কথা হোল। আসুন, ভিতরে আসুন! গিমারটন থেকে এলেন নাকি?

গ্রেঞ্জ থেকেই এলাম, ওখানে আমার চাকর রাতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সব ঠিক করে রাখছে। তোমার মনিবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে এলাম। আর তো এখানে আসা হবে না।

নেলি বললে, কি বোঝাপড়া? উনি তো এই মাত্র বেরিয়েছেন, শীগ্‌গীর ফিরবেন না।

এই ভাড়ার ব্যাপার আর কি।

তাহলে মিসেস হিথক্লিফ মানে ক্যাথির সঙ্গেই হিসেব-নিকেশ হবে—আমার সঙ্গেও বলতে পারেন। এখনো তো মেয়ে নিজেরটা বুঝেশুনে নিতে শিখলো না। আমাকেই সব করতে হয়। আর কেউ তো নেই।

অবাক হলাম।

সে কি হিথক্লিফের মারা যাবার কথা কারো কাছে শোনেন নি!

হিথক্লিফ মারা গেছেন! অবাক হয়ে বললাম। কতদিন আগে?

তা মাস তিনেক হোল। বসুন আপনি, আমি আপনার টুপীটা রেখে দিই। সব কথাই বলবো, আপনার নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয় নি?

না, না, কিছু দরকার নেই। বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা করতে বলেছি। তুমি বসো। উনি যে মারা যাবেন, ভাবতেই পারি নি! কি ব্যাপার বল তো! তুমি না বলছিলে, আমাদের যুগল শীগ্‌গীর ফিরছেন না।

না, তাদের আমি কত বকি—রাত করে ফিরো না, তা ওরা কি গ্রাহ্যি করে! একটু অন্তত আমাদের বাড়ির পুরানো মদ খান। আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সুস্থই হয়ে উঠবেন।

আমি বাধা দেবার আগেই ও আনতে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরেই রুপোর পাত্রে করে নিয়ে এল মদ, এবারও শুরু করলো হিথক্লিফের ইতিহাস। অদ্ভুত ওঁর মৃত্যু বিবরণ।

ও বললে, আপনি চলে যাবার পক্ষকাল পরেই আমার ডাক পড়লো। ওয়াদারিং হাইটস্-এ যেতে হবে, ক্যাথির কাছে থাকতে পারব ভেবে খুশি হলাম, কিন্তু ওকে দেখে মনে ঘা খাই পেলাম। ও অনেকখানি বদলে গেছে।

হিথক্লিফ আমাকে কিছুই বলেনি, শুধু বলেছিল, আসতে হবে। ক্যাথিকে নিয়ে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমি যেন ওকে নিয়ে থাকি। দরকার হলে দিনে একবার কি দুবার হিথক্লিফ ওর সঙ্গে দেখা করবে। ক্যাথি তো এই ব্যবস্থায় খুশিই হোল। আমি আস্তে আস্তে গ্রেঞ্জ থেকে ওর বইপত্র গোপনে নিয়ে আসতে লাগলাম। কিন্তু এ মোহ বেশি দিন টিকলো না। ক্যাথি প্রথমটায় খুশিই ছিল, কিন্তু আবার বিরক্ত হয়ে উঠলো, বাগানে সে যেতে পাবে না। ঐ খুদে ঘরখানায় বসে থাকে আর এদিকে বসন্ত এল তার মন্ত্র নিয়ে গাছের লতায় পাতায়। তাছাড়া মাঝে মাঝে অন্য কাজে যেতে হোত, ও তখনো একা থাকতো, ও এবার হেয়ারটনকে নিয়ে পড়লো। তার সঙ্গে বক্‌বক্‌ করে, তাকে বোকামির জন্যে গাল দেয়। ও কি করে এমন জীবন কাটাচ্ছে—কি করে সারা সন্ধ্যেটা আগুনের পাশে বসে ঝিমোয়—এমনি সাত-সতেরো কথা!

একদিন তো বলেই বসলো, ও একটা আস্ত কুকুর—তাই না এলেন? নয়তো গাড়ি-টানা ঘোড়া? কাজ করে খায় আর ঘুমোয়। উঃ, কি ফাঁকা ওর মন। হেয়ারটন, তুমি কখনো স্বপ্ন দেখ? দেখলে বলতো, কি দেখ স্বপ্নে? তুমি তো আবার কথা বলতে পার না।

হেয়ারটন চুপ করে রইল।

ও আবার বললে, ও নিশ্চয়ই এখন স্বপ্ন দেখছে।

বললাম, তুমি যদি অমনি কর, তাহলে হেয়ারটন গিয়ে মনিবকে ডেকে আনবে।

হেয়ারটন হাত মুঠো করে রইল। এইবার বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর একদিন।

ও বললে, আমি যখন রান্নাঘরে থাকি, হেয়ারটন কেন কথা কয় না জান! ওর ভয়, পাছে আমি ওর কথা শুনে হাসি। এলেন, ভাব তো ব্যাপারখানা! একবার লেখাপড়া শুরু করেছিল, আমি হাসতেই বই সব পুড়িয়ে ফেললে, ইস্তাফা দিলে লেখাপড়ায়। ও বোকা নয়তো কি!

আমি বললাম, তুমিও তো দুষ্টু কম নয়—সে কথা কে বলে!

হয় তো দুষ্টু, কিন্তু তাই বলে ও অমন বোকা হবে কেন? হেয়ারটন, তোমাকে যদি এখন একখানা বই দিই—নেবে তো? দেখি না একবার পরখ করে!

ও নিজে যে বইখানা পড়ছিল, সেইখানাই তুলে দিল হেয়ারটনের হাতে। হেয়ারটন ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর বিড়বিড় করে বললে, যদি ও এই সব বাঁদরামি না থামায়, ও ওর ঘাড় মটকে দেবে।

ক্যাথি শেষে বললে, আমি বইখানা এখানে এই টানার ভিতরে রাখলাম—এখন গিয়ে শুয়ে পড়বো।

ও আমার কানে কানে বললে, আমি যেন নজর রাখি, ও কি করে; তারপর চলে গেল, কিন্তু হেয়ারটন কাছেও ঘেঁষলো না। আমি ক্যাথিকে ভোরবেলা সেকথা জানালাম, ও যেন হতাশই হোল। বললাম, হেয়ারটনের এই অলসতা ওকে পীড়া দেয়। ও যাতে সজাগ হয়ে ওঠে তাই এমন পীড়ন করে। ও এবার আর এক পন্থা আবিষ্কার করলে, আমি যখন কাপড়-চোপড় ইস্ত্রি করতাম, তখন আমাকে কত বই পড়ে পড়ে শোনাত। হেয়ারটন থাকলে, একটা খুব কৌতূহলের জায়গায় এসে বই মুড়ে রাখতো। ও প্রায়ই এমনি করতো, কিন্তু হেয়ারটনও একবগ্‌গা ছেলে, টোপ কখনো গিলতো না। শীতের দিনেও বসে বসে জোসেফের সঙ্গে তামুক টানতো। দুটি যেন পুতুল বসে আছে মনে হোত। একদিন হেয়ারটন গেল শিকারে। সেদিন আর ক্যাথির পড়ায় মন নেই। সে খালি হাই তোলে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, ও উঠে চলে গেল।

মিঃ হিথক্লিফও একেবারে কারো সঙ্গে মেলেমেশে না তখন! হেয়ারটনের পাত্তাই নেয় না।

এদিকে হেয়ারটনের আবার এক দুর্ঘটনা ঘটলো। পাহাড়ে গিয়েছিল শিকারে, হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলী আপনা থেকে ছুটে গিয়ে ওর বাহুতে লাগে। যথেষ্ট রক্তপাত ও হয়। ক'দিন তো বাড়ীতে আগুনের ধারে বসে রইল। ক্যাথির পক্ষে ব্যাপারটা ভালই হোল। উপর তলায় আর যায়ই না।

ঈস্টারের দিন। জোসেফ গেছে গিমারটনে। আমি কাপড়-জামা কাচায় ব্যস্ত। হেয়ারটন চুপচাপ বসে আছে। ক্যাথি জানালার শার্সিতে ছবি এঁকে সময় কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে গেয়ে উঠছে গান, কখনো বা হেয়ারটনের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। বসে পাইপ টানছে তো টানছেই। শুনলাম, ও এক সময়ে বলে উঠলো,

হেয়ারটন, তুমি অমন রাগ করে ওঠ কেন—অতো রুক্ষ কেন তোমার স্বভাব ?

হেয়ারটন চুপচাপ।

হেয়ারটন, হেয়ারটন ! শুনছ আমার কথা ?

দূর হও এখান থেকে ! ও গর্জে উঠলো।

দাঁড়াও, পাইপটা তোমার মুখ থেকে আগে কেড়ে নিই—এই বলে ও পাইপ ওর মুখ থেকে কেড়ে নিলে।

ও সেটা উদ্ধার করবার আগেই দু-টুকরো হয়ে আগুনের কুণ্ডে স্থান পেল। ও গাল দিয়ে আর একটা পাইপ বার করলে।

ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠলো, না, তা হবে না, আগে আমার কথা শুনতে হবে। ধোঁয়ার ঐ মেঘ আমার মুখে এসে লাগলে আমি তো কথা বলতে পারি না।

ও চীৎকার করে উঠলো, দূর হয়ে যাবে কিনা বল। আমাকে একা থাকতে দাও।

ক্যাথি উত্তর দিলে, আমি যাব না—কিছুতেই যাব না। তোমাকে বোঝাতে এত চেষ্টা করি—আর তুমি কিছুতেই বুঝবে না। তোমাকে যখন বোকা বলি, আমি তো কিছু ভেবে বলি নে। এমন কথা নয় যে, তোমাকে ঘৃণা করি। এস, আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে। হেয়ারটন, তুমি আমার ভাই, আমার কথা তোমাকে মেনে চলতে হবে।

তোমাকে দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই। তোমার দেমাক তোমার থাক, ও উত্তর দিলে। তোমার দিকে যদি আবার তাকাই,

তার আগে যেন আমাকে নরকে যেতে হয়। এখুনি তুমি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

ক্যাথি ভ্রূকুটি করলে। জানালার কাছে চলে গেল। ঠোঁট কামড়াচ্ছে। ফোঁপানি থামিয়ে রাখছে গুন গুন করে গান গেয়ে।

হেয়ারটন, তোমার বোনের সঙ্গে ভাব করা উচিত, আমি বাধা দিয়ে বললাম, ও তো যা করেছে, তার জন্যে দুঃখ পাচ্ছে। এতে তোমার ভালই হবে। ওকে বন্ধু পেলে তুমি তো অন্য মানুষ হয়ে যাবে।

বন্ধু! ওকে বন্ধু! হেয়ারটন চেঁচিয়ে উঠলো; ও তো আমাকে ঘেন্না করে, ওর জুতো পোঁছারও আমি যুগ্যি নই বলে মনে করে! না, আমি যদি রাজাও হই, ওর মন পেতে আমি ছোঁক ছোঁক করে আর ছুটে যাব না।

আমি তো তোমাকে ঘৃণা করি না, তুমিই বরং আমাকে দুচোখে দেখতে পার না, ঘৃণা কর! ক্যাথি কেঁদে উঠলো। ওর মনের ব্যথা আর চেপে রাখতে পারলে না। তুমি ঐ হিথক্লিফের মতোই আমাকে দেখতে পার না—ঘৃণা কর! তার চেয়েও বুঝি বেশি।

হেয়ারটন চীৎকার করে উঠলো, তুমি একটা আস্ত মিথ্যেবাদী। তাহলে আমি তোমার পক্ষ নিয়ে ওকে চটাতে গেলাম কেন? আর একবার, কতশত বার এমনি হয়েছে। আর তুমি কিনা আমাকে ঘেন্না কর!—আমাকে জ্বালাতন কর। আমি তো তুমি এলে উঠে চলে যাই—গিয়ে রান্না ঘরে ঢুকি!

ক্যাথি চোখ মুছে জবাব দিলে, তুমি যে আমার পক্ষ নাও, তা তো জানিনা। আমি তো বড় দুঃখী, একেবারে তেতো-বিরক্ত হয়ে আছে আমার মন। কিন্তু এখন তো শুনে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, আমাকে ক্ষমা কর। আমি কি করতে পারি বল!

ও হাত বাড়িয়ে দিলে। হেয়ারটনের মুখ কালো হয়ে উঠলো, বজ্রগর্ভ মেঘের মতো ভ্রূকুটি করে রইল। মুঠো করে রইল হাত, মাটির দিকে ওর চোখ। ক্যাথি বুঝতে পারছিল। শুধু বীতরাগে ও এমন হয়ে যায় নি, এক মুহূর্ত

অনিশ্চিত দোলায় দুলে উঠলো ওর মন। তারপরে কি ভেবে ওর গালের উপর আলতো করে এঁকে দিলে চুমু। বড় দুষ্টু মেয়ে। ভাবলে, ওকে আমি দেখতে পাই নি। ও তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে আবার আগের মতোই জানালার ধারেই দাঁড়ালো। আমি তখনো মাথা নেড়ে ব্যাপারটা যেন সমর্থন করতে পারছি না—এমনি ভাব দেখাচ্ছিলাম। ও এবার আরক্ত হয়ে উঠলো লজ্জায়, ফিসফিস করে বললে, এলেন, তুমি অমন করছ কেন! আমি কি করলাম বল তো? ও তো আমার হাতে হাতও মেলাবে না, একবার তাকিয়েও দেখবে না। এখন কি উপায় করি! ওকে তো দেখতে হবে—ওকে আমার ভাল লাগে—ওর মিতিন হতে আমি চাই।

হেয়ারটন চুম্বনে আশান্বিত হোল কিনা বলতে পারি না। কয়েক মুহূর্ত সে সতর্ক হয়ে এদিক ওদিক তাকাল। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। নীচু করে আছে। যখন মুখখানা তুললে, দেখা গেল সেখানে বিহ্বল বিষণ্নতা। কোন দিকে তাকাবে জানে না।

ক্যাথি একখানা বই কাগজ দিয়ে মুড়ে নিচ্ছিল। বইখানা বেঁধে রাখছিল ফিতে দিয়ে! আর তার উপর নাম লেখা—মিঃ হেয়ারটন আর্ণ-শ। ও আমাকে করলে ওর দূতী, যার ঠিকানা দেওয়া আছে, তার হাতে আমাকে সঁপে দিতে হবে।

ও বললে, ওকে বোলো, ও যদি বইখানা নেয়, আমি নিজে এসে ওকে পড়তে শেখাব। আর যদি অস্বীকার করে, আমি উপরে চলে যাব। ওকে আর কখনো বিরক্ত করবো না।

আমি দূতীগিরি করলাম। বই নিয়ে গিয়ে আমার দৌত্যসংবাদ জাহির করলাম। উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার মনিবানী। হেয়ারটন হাতের মুঠো খুলবে না, আমি তাই বইখানা ওর কোলের উপর রেখে দিলাম। ও ছুঁড়ে ফেলে দিলে না। আমিও আমার কাজে চলে গেলাম। ক্যাথি টেবিলে মাথা রেখে পড়ে রইল। কেটে গেল বহুক্ষণ ও শুনতে পেলে খস খস শব্দ হচ্ছে। উপরের মোড়া কাগজখানা যেন কে খুলছে। এবার ক্যাথি পা টিপে টিপে চলে

এল হেয়ারটনের কাছে। হেয়ারটন কাঁপছে। মুখে ওর দীপ্তি। ওর সমস্ত রুক্ষতা, বিমর্ষতা চলে গেছে মুখখানি থেকে; কিন্তু সাহস তো ওর নেই। তাই প্রথমে ও সাহস পেলে না, একটা কথা উচ্চারণ করতে পারলে না। অথচ ক্যাথির প্রশ্নাতুর চোখ—প্রশ্নে উদগ্রীব চোখ। আর অস্ফুটস্বরে সে জানাচ্ছে ওর আবেদন।

হেয়ারটন তুমি আমাকে ক্ষমা করলে? করলে তো? সামান্য দুটো কথা বললে আমি খুঁশি হয়ে যাই। বলবে না—বলবে না?

ও বিড় বিড় করে কি যেন বললে।

ক্যাথি আবার প্রশ্ন করলে, আমার মিতা হবে তুমি—আমার সখা—আমার বন্ধু?

হেয়ারটন উত্তর দিলে, না, না, জীবনে তুমি তো আমার জন্যে লজ্জা পাবে। মিনিটে মিনিটে লজ্জা হবে। আর যত আমাকে ভাল করে জানবে, ততো লজ্জা বাড়বে বই তো কমবে না।

তাহলে তুমি আমার বন্ধু হতে চাও না হেয়ারটন? ক্যাথি হাসলো, মধুর মতই মধুর হাসি। কাছে এগিয়ে এল।

আর শুনলাম না ওদের কথা। কান পেতে শোনা তো যায় না। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ফিরে তাকিয়ে দেখি ওরা ঝুঁকে পড়েছে বইখানির পাতায়। মুখ ওদের ঝলমল করছে। মনে হোল দুপক্ষে এবারে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে—এখন থেকে শত্রু—বন্ধু হোল। একেবারে অঙ্গীকারে বদ্ধ এ বন্ধুত্ব—

বইখানায় বহু মূল্য সব ছবি, ওরা তন্ময় হয়ে রইল তারই মোহে। আর এক মোহ ওদের নিজেদের পরস্পরের সান্নিধ্য। জোসেফ এবার এসে ঢুকলো। ও হয়তো ক্যাথি আর হেয়ারটনকে একই বেঞ্চিতে দেখে অবাক হয়ে গিছলো। আবার ক্যাথি হেয়ারটনের কাঁধে রেখেছে হাত। তার প্রিয় পাত্র হেয়ারটনের কি দশা। সে আজ ক্যাথির সান্নিধ্য শুধু সহ্য করছে না, যেন উপভোগ করছে। এমন গভীরভাবে সে আহত হোল যে কথাটি বলতে পারলে না। অন্তত সে রাতে মন্তব্য করার মতো মনের অবস্থা রইল না। শুধু দীর্ঘনিশ্বাস

বেরিয়ে এল বুক ঠেলে। ও টেবিলে বাইবেল নিয়ে বসলো। তার উপরে রাখলো ওর পকেট-বই থেকে দিনের আদায়-পত্র টাকাকড়ি। খানিকক্ষণ এমনি কেটে গেল। এবার সে হেয়ারটনকে ডেকে বললে,

এইগুলো মনিবের কাছে নিয়ে যাও, ওখানেই থেকো। আমি আমার কামরায় যাচ্ছি, এই গর্তে আর তোমার আমার দুজনেরই ভাল লাগছে না। এবার আর একটা খুজে নিতে হবে।

আমি হাঁক পেড়ে বললাম, ক্যাথি এদিকে এস। তার আগেই আমরা গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমার ইস্ত্রি করা শেষ হয়েছে, তুমি যাবে নাকি ?

ও উত্তর দিলে, এখনো তো রাত আটটাও হয়নি। তবু অনিচ্ছাসত্বে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হেয়ারটন আমি বইখানা রেখে যাচ্ছি। কাল আবার আরো কখানা নিয়ে আসব।

যে বই আনবে, আমি আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দেব ! জোসেফ শাসালে।

ক্যাথিও তাকে শাসিয়ে বললে, জোসেফের নিজের বইএরও এই দশা হবে। আবার হেয়ারটনের পাশ কাটিয়ে হাসতে হাসতে গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলে গেল। এই বাড়িতে ওকে কখনো এমনি দেখিনি।

এমনি ভাবে শুরু হোল অন্তরঙ্গতা। আর বেড়েও চললো। কিন্তু সাময়িক বাধা এল বই কি। আর্ণ-শ একেবারে তাড়াতাড়ি তো আর সভ্যভব্য হতে পারে না। আর আমার খুদে মনিবানীটিও দার্শনিক নন। সহিষ্ণুতারও অবতার তাকে বলা যায় না। কিন্তু মন ওদের তখন একই লক্ষ্যে ছুটে চলেছে—একই বিন্দুতে মিলিত হতে চায়। সে বিন্দু—ভালবাসা। ওরা চায় পরস্পরকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে। ওরা সেই পথেই ছুটে চললো। লক্ষ্যে ওরা পৌছবে এই ওদের আশা।

মিঃ লকউড, আপনি বুঝতেই পারছেন, ক্যাথির মন পাওয়া খুব শক্ত নয়। কিন্তু আপনি যে সে-চেষ্টা করেননি, আমি খুশিই হয়েছি। আমার তখন এক-মাত্র ইচ্ছা, ওদের মিলন হোক। ওদের বিবাহের দিনে আমার হৃদয়ের সব হিংসা-দ্বেষ মুছে ফেলবো। আমি সেদিন হবো সারা ইংলণ্ডের মধ্যে সব চেয়ে সুখী।

তেত্রিশ

হেয়ারটন তখনো আরাম হয়নি। কাজে যেতে পারছে না। বাড়িতেই থাকে। আমাদের ক্যাথিও আমার পাশ থেকে এখন গরহাজির। সে আমার আগেই সকালবেলা নীচে নেমে এসে বাগানে চলে যায়। সেখানে হেয়ারটনের সঙ্গে দেখা হয়। সেদিন ছোট হাজিরির সময় ডাকতে গিয়ে দেখি, ওরা একটা জায়গায় ঝোপঝাপ সাফ করে সেখানে গ্রেঞ্জ থেকে এনে গাছপালা লাগাবে বলে ঠিক করেছে।

একঘণ্টার ভিতরে এতখানি জায়গায় একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে দেখে ভয় পেলাম। বঁইচি ঝোপ জোসেফের খুব প্রিয়। আর তারই ভিতরে কিনা ক্যাথি তার ফুলের কেয়ারী রচনা করতে চায়।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, দেখতো কাণ্ড! একবার টের পেলেই হয়, অমনি মনিবের কাছে খবর দিতে ছুটবে। তখন কি জবাব দেবে? তারপরে তো সে-এক ব্যাপারই হবে। হেয়ারটন, তোমাকেও বলি বাপু, ওর কথায় অমন কাজটা করে বসলে!

হেয়ারটন, ঘাবড়ে গিয়ে বললে, এগুলো যে আবার জোসেফের তা তো জানতাম না। আমি নিজেই ওকে বলবো, আমি করেছি।

আমরা হিথক্লিফের সঙ্গে বসেই খাই। আমি চা দেওয়া থেকে শুরু করে খাবার বেঁটে দেওয়া পর্যন্ত সবই করি। ক্যাথি বসে আমার পাশে। আজ ক্যাথি হেয়ারটনের পাশে পাশে আছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল ও শত্রুতায় যেমন পরিণামের কথা ভাবেনি, মিতালিতেও তা ভাবতে রাজি নয়।

ঘরে ঢুকেই তাই ফিসফিসিয়ে বললাম, দেখো, টেবিলে বসে যেন কথা কয়ো না, বা হেয়ারটনের দিকে বার বার তাকিয়ো না। ওতে হিথক্লিফ ক্ষেপে যাবে।

ক্যাথি উত্তর দিলে, না গো না, তা হবে না।

পর মুহূর্তেই ও গিয়ে হেয়ারটনের পরিজের প্লেটে একটা প্রিমরোজ পুঁতে দলে।

হেয়ারটন কিন্তু কথা বলতে সাহস করলে না, তাকাবে যে সে-সাহসও ওর নেই। কিন্তু ক্যাথি এমন জ্বালাতে শুরু করলে যে দুবার ও হেসে উঠেছিল আর কি। আমি ভ্রূকুটি করলাম। ক্যাথি মনিবের দিকে সভয়ে তাকাল। সেদিন মনিবের কোনো দিকে মন নেই। নিজের ভাবনায়ই বিভোর। ক্যাথি ওর দিকে তাকিয়ে দেখে আবার তেমনি দুষ্টুমি শুরু করলো, এবার হেয়ারটনের ঠোঁট চিরে বেরুলো চাপা হাসি। হিথক্লিফ চমকে উঠলো। আমাদের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে চোখ। ক্যাথি বিব্রত, আবার উদ্ধত-গর্বে উপেক্ষা করছে তার দৃষ্টি।

হিথক্লিফ বলে উঠলো আমার থেকে যে দূরে সরে বসেছ ভালই। আমার দিকে ঐ শয়তানীভরা দুই চোখ তুলে অমন ভাবে তাকাচ্ছ কেন? নামাও, চোখ নামাও! তুমি যে আছ একথা যেন মনে না হয়। আমি তো ভেবেছিলাম, তোমার হাসির রোগ আমি আরাম করে দিয়েছি।

হেয়ারটন বিড় বিড় করে বললে, ও নয়, আমি হেসেছি।

কি বললে? জিজ্ঞেস করলেন মনিব।

হেয়ারটন প্লেটের উপর চোখ নামিয়ে রইল। দ্বিতীয়বার বললে না কথা। হিথক্লিফ ওর দিকে একবার তাকিয়ে আবার খেতে লাগলো। আবার নিজের ভাবনায় সে তন্ময়! আমরা প্রায় শেষ করেছি ভোজন-পর্ব। দুটি তরুণ-তরুণী বুদ্ধি করেই দূরে সরে গেছে। আমার আর বিপত্তির ভয় নেই। জোসেফ এরই মধ্যে এসে হাজির হোল। ওর চোখ মুখের অবস্থা দেখে মনে হয়, ওর প্রিয় গাছ-পালার ধ্বংসসাধন স্বচক্ষে দেখে এসেছে। আর তার আগেই হয় তো ক্যাথি আর হেয়ারটনকে ওখানে দেখতে পেয়েছিল। জাবর কাটার সময়ে গরুর মতো ওর চোয়াল নড়ছে, কথা বোঝা যাচ্ছে না। এবার বোঝা গেল।

আমার মাইনে বুঝিয়ে দাও কত্তা, আমি চলে যাব। ষাট বছর যেখানে

কাটালাম, সেখান ছেড়ে চলেই যাব। আমার গাছ-গাছড়া বাগান সব গোল্লায় গেল গো! আর তো আমি সইতে নারব! এর চেয়ে সড়ক বাঁধারে কাজ করে খাব।

হিথক্লিফ তাকে বাধা দিয়ে বললে, এই হাঁদারাম, কি হয়েছে তাই বল না? নেলি আর তোমার ঝগড়ার ব্যাপার হলে কিছু বলবো না। ও তোমাকে কয়লার খাতে নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলুক না তাতে আমার কি!

জোসেফ বললে, না, না, কত্তা, নেলি নয়। নেলির জন্তে ছুটে আসিনি। কিন্তু ঐ যে আমাদের বিবি—রাণী, উনি তো আমাদের ছোঁড়াটাকে ওষুধ করেছেন। আর ছোঁড়াটাকেও বলিহারি যাই! ওর জন্তে এত করলাম, আর ও কিনা আমার অমন বাগিচা ঝাড়েমূলে উপড়ে ফেললে। জোসেফ কেঁদে আকুল হোল। সাধের বাগিচার শোক তো আছেই, আবার তার উপরে আছে হেয়ারটনের অকৃতজ্ঞতা।

হিথক্লিফ জিজ্ঞেস করলে, বুড়ো কি টেনে এসেছে নাকি? হেয়ারটন, ও কি বলছে?

যুবকটি উত্তর দিলে, দু-তিনটে ঝোপঝাড় আমি উপড়ে ফেলেছি বটে। কিন্তু সেগুলো আবার এখুনি পুঁতে দিয়ে আসছি।

কেন উপড়ে ফেললে? মনিব জিজ্ঞেস করলেন।

ক্যাথি বুদ্ধি করে কথা বললে, আমরা ক'টা ফুলের চারা লাগাতে চেয়েছিলাম। আমারই দোষ, আমিই ওকে বলি!

তুই কে-রে শয়তানী! এখানকার একগাছা কুটো ছোঁবার কি তোর এক্তিয়ার আছে! ওর শ্বশুর অবাক হয়ে গর্জে উঠলেন। এবার হেয়ারটনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, ওর হুকুম তোমাকে কে তামিল করতে বলেছিল?

হেয়ারটন নিরুত্তর! ক্যাথি উত্তর দিলে, আমার সমস্ত জমিজমা তো আপনি কেড়েই নিয়েছেন, কয়েক হাত জমি নিয়ে একটু তাকে সাজাব— তা'তেও আপনার আপত্তি?

তোর জমিজমা! ওরে বেশ্যা, তোর তো স্পর্দ্ধা কম নয়! এক ফোঁটাও জমি তোর কোনকালে ছিল না, হিথক্লিফ গর্জে উঠলো।

আর আমার টাকাকড়ি? ক্যাথি বলে উঠলো, হিথক্লিফের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির বদলে সেও ছুঁড়ে মারলো ক্রুদ্ধ দৃষ্টি!

চুপ, চুপ! আবার গর্জে উঠলো হিথক্লিফ। চটপট খেয়ে নিয়ে এখান থেকে দূর হও!

আর হেয়ারটনের জমিজমা আর টাকা? উদ্দাম ক্যাথি বলে চললো। আমি আর হেয়ারটন এখন মিতালি পাতিয়েছি। ওকে আপনার সমস্ত কীর্তি-কাহিনীই বলবো!

মনিব যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। বিবর্ণ ওর মুখ, ক্যাথিকে দেখছেন! চোখে অপরিসীম ঘৃণা উথলে উথলে উঠছে।

ক্যাথি বলে উঠলো, আপনি যদি আমাকে আঘাত করেন, হেয়ারটন আপনাকে পাল্‌টা আঘাত হানতে কসুর করবে না। আপনি তার চেয়ে সুস্থির হয়ে বসুন!

হিথক্লিফের গর্জন শোনা গেল, হেয়ারটন যদি তোমাকে ঘর থেকে বার করে না দেয়, আমি ওকে জাহান্নামে পাঠাব। ওরে ডাইনী, তুই কি ওকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে সাহস করবি? যাও হেয়ারটন, ওকে দূর করে দাও। শুনছ? ওকে রান্নাঘরে ছুঁড়ে ফেলে দাও! এলেন শোন, ও যদি আর কখনো আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, ওকে আমি খুন করে ফেলবো বলে দিচ্ছি।

হেয়ারটন চাপা স্বরে ওকে চলে যেতে বললে।

হিথক্লিফ অসভ্যের মতো চীৎকার করে উঠলো, হেয়ারটন, ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও। ওরে, এখনো কি তুই বক্‌বক্‌ করবি? তারপর নিজের হুকুম তামিল করতে স্বয়ং এগিয়ে এল।

ক্যাথি বললে, আপনি মন্দ লোক, আপনার হুকুম ও আর তামিল করবে না। আমার মতোই ও আপনাকে ঘৃণা করে।

থাক, থাক ! হেয়ারটন ক্যাথিকে ভৎ'সনা করলে, ওঁকে অমন কথা তুমি বলতে পারবে না। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।

কিন্তু ও যদি আমাকে আঘাত করতে আসে, তুমি বাধা দেবে না ? ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠলো।

তার চেয়ে চলে এস ! চলে এস, হেয়ারটন অধীর হয়ে উঠলো।

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে ; হিথক্লিফ ক্যাথিকে ধরে ফেললো।

সে হেয়ারটনকে বললে, তুমি চলে যাও হেয়ারটন ! ওরে অভিশপ্ত ডাইনী ! ও আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে হেয়ারটন। অথচ এখন তো এসব আমার সহ্য হচ্ছে না, এর জন্য ওকে অনুতাপ করতে হবে।

ক্যাথির চুলের মুঠি চেপে ধরলো হিথক্লিফ। হেয়ারটন চুলের মুঠি ছাড়িয়ে নিতে গেল, কত কাকুতি-মিনতি করলে, সে যেন ওকে আঘাত না করে। হিথক্লিফের কালো চোখ ঝলসে উঠলো। ও যেন ক্যাথিকে দু'টুকরো করে ফেলতে চায়। আমি ওর উদ্ধারে তখন কৃতসংকল্প। এরই মধ্যে হঠাৎ ওর হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গেল। ও চুল ছেড়ে হাত ধরলে, ক্যাথির চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি দেখলো। তারপর নিজের হাতখানা দিয়ে ওর চোখ চেপে ধরলো। একমুহূর্ত বুঝি কি ভেবে নিলে। তারপর শান্ত হবার ভান করে বললে, আমার রাগের সময় আমাকে তুমি এড়িয়ে চলবে। তা না হলে কোনদিন তোমাকে খুন করে ফেলবো। যাও মিসেস ডীনের সঙ্গে উপরে যাও, ওর কাছেই তোমার ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিও। আর হেয়ারটন যদি তোমার কথা শোনে, তাহলে ওকে আমি দূর করে দেব। তোমার ভালবাসা পেয়ে ও হবে ফকির ! নেলি, ওকে নিয়ে যাও, যাও ! চলে যাও !

ক্যাথিকে নিয়ে চলে এলাম। ও রেহাই পেয়ে খুশি। আর সবাইও চলে এল। হিথক্লিফ রাতের খাওয়া অবধি সেখানে রইল। ক্যাথিকে পরামর্শ দিলাম, ও যেন উপরেই রাতে খায়। কিন্তু রাতে খাবার সময় ওর শূন্য আসন দেখে হিথক্লিফ ওকে ডাকতে আমাকে পাঠালে। কারো সঙ্গে কথা বললে না, খেলও খুব সামান্য—তারপর বেরিয়ে গেল। বলে গেল, ফিরতে রাত হবে।

ওর অনুপস্থিতির সুযোগে দুটি নতুন প্রণয়ী জমিয়ে বসলো। ক্যাথির শ্বশুর হেয়ারটনের বাবার উপরে কি অবিচার করেছে সে কথা বলতে গিয়ে ক্যাথি ধমক খেল। ও বললে, হিথক্লিফের নিন্দা ও সইতে পারবে না। ও যদি শয়তানও হয়, তাতেও ক্ষতি নেই, হেয়ারটন তার পাশে গিয়েই দাঁড়াবে। ও আরো জানালে, হিথক্লিফকে গাল পাড়ার চেয়ে ও আগের মত তাকেই গাল পাড়ুক—তাতে ও বরং খুশিই হবে। ক্যাথি রেগে গেল। কিন্তু ও তাকে এই বলে চুপ করিয়ে দিলে যে, ক্যাথির বাপের নিন্দে করলে তার কেমন লাগবে। ক্যাথি বুঝলো হিথক্লিফ আর হেয়ারটনের সম্পর্ক গভীর—এ বন্ধন যুক্তি দিয়ে ছিন্ন করা যায় না। বিশ্বাসের হাপরে গালাই—ঢালাই হয়ে দৃঢ় হয়েছে। এখন বন্ধন শিথিল করতে যাওয়া তো নিষ্ঠুরের কাজই হবে। ক্যাথি সেই থেকে ওকথা এড়িয়েই চলতো। আমার কাছেও বলতো, সে হেয়ারটন হিথক্লিফের ভিতরে বিবাদ বাঁধাবার চেষ্টা করে ভুলই করেছে। আমার তো মনে হয় আর কখনো ও কথা সে ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করেনি।

এই সামান্য মতের অমিল রইল না। আবার ওরা হোল মিতা। আবার শিক্ষক ছাত্রের কাজ শুরু হোল। আমার কাজ কর্ম সেরে ওদের কাছে এসে বসতাম। ওদের দেখে মন জুড়িয়ে যেত। কি করে যে সময় কেটে যেতো জানি না। ওদের যেন আমার নিজের ছেলেমেয়ে বলে মনে হোত। এক জনের জন্যে তো আমার গর্ব ছিলই। আর একজনের জন্যও মায়া পড়ে গেল। হেয়ারটনের স্বভাবটি ভাল, বুদ্ধিও আছে। ও তাড়াতাড়ি ওর সেই অজ্ঞানতা আর অবনতির মেঘ কাটিয়ে উঠলো, ক্যাথি হোল ওর প্রেরণা। ওর মন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে মুখে সে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এখন তো দেখে মনে হয়, ও অভিজাত বংশের সন্তান। আমি তো ভেবেই পেতাম না, এই কি সেই ছেলে যাকে প্রথম হাইটস্‌এ দেখেছিলাম! ওরা লেখাপড়ায় ব্যস্ত, আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তারিফ করলাম। এদিকে রাত হোল। মনিব এসে গেল, ও হঠাৎ এল, আমাদের তিনজনকেই দেখলো। আমরা না দেখার আগেই ও দেখলো। এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর

কি হতে পারে! এর জন্যে ভর্ৎসনা করা তো লজ্জার কথা। ওদের মুখে পড়েছে অগ্নিকুণ্ডের আলো, শিশুর অভিনিবেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। হেয়ারটনের বয়েস তেইশ হোল, আর ক্যাথির আঠারো! কিন্তু ওরা দুজনে নতুন করে শিখছে জীবনধারা—তাই ওরা এখনো মোহবিচ্যুত পরিপূর্ণতা লাভ করেনি।

ওরা দুজনেই চোখ তুলে তাকালো। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি, ওদের চোখ একই রকম—ঠিক ক্যাথেরিনের মতো। আমাদের ক্যাথির তো মার সঙ্গে আর কোনো মিল নেই—শুধু চওড়া কপাল আর নাকের ব্যাসেই মিল—আর এই চোখ দুটি। কিন্তু হেয়ারটনের মিল তার চেয়েও যথেষ্ট। মনে হয়, এই মিল দেখেই হিথক্লিফ বিভ্রান্ত হয়ে গিছলো। ও অস্থির হয়ে ছুটে এল। সে তাকিয়ে রইল যুবকের দিকে, তার অস্থিরতা বুঝি মিলিয়ে গেল। না অস্থিরতার ভোল পাল্‌টে গেল। হেয়ারটনের হাত থেকে বইখানা নিয়ে খোলা পাতাখানার দিকে তাকালে। পড়ে না দেখে আবার ফিরিয়ে দিলে। ক্যাথিকে চলে যেতে ইসারা করলে। হেয়ারটনও বেশিক্ষণ রইল না। আমিও চলে যাচ্ছিলাম। ও আমাকে বসতে বললে।

এই যে দৃশ্য ঘটে গেল ওর চোখের সুমুখে, তারই কথা ভাবতে ভাবতে বললে, বড় নিরস উপসংহার হোল নেলি, তাই না? আমার এত শ্রমের এই কি পরিণতি? শাবল, কুড়ুল, দুরমুশ নিয়ে এসে দুটো বাড়িকে ভেঙেচুরে দিচ্ছিলাম। হারকিউলেসের (গ্রীক্ উপকথার বীর) মতো কাজ করছিলাম, যখন সব তৈরি, সমস্ত ক্ষমতা আমার আয়ত্তে, তখন আর ছাদের একখানা শ্লেট বা টালি তুলে ফেলারও আর আমার ইচ্ছে রইল না। আমার পুরানো শত্রুরা আমাকে হার মানাতে পারেনি, এই তো ছিল ওদের উত্তরাধিকারিণীদের উপর প্রতিশোধ নেবার সময়। আমি তা পারতাম, কেউ আমাকে বাধা দিতেও পারত না, কিন্তু লাভ কি? আর আঘাত হানতে ইচ্ছে করে না, হাত তুলতেই ইচ্ছে করে না। তার মানে কি এই—এতদিন ধরে মেহনৎ করলাম সে কি শুধু চরিত্রের শূন্য মহানুভবতার পরিচয় দেব বলে! না,

তা তো নয়। বরং ওদের ধ্বংসে আমি আর আনন্দ পাচ্ছি না, আমি শুধু শুধু ধ্বংস করতেও আর পারছি না—আমি অলস হয়ে পড়েছি।

নেলি, কেমন এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘনিয়ে আসছে। এখন তো তারই ছায়ায় আমি আছি। নিজের রোজকার জীবন আর ভাল লাগে না। পান-ভোজনে আমার অরুচি। ঐ যে ওরা চলে গেল, ওরা দুটিই এখন আমার কাছে একমাত্র বাস্তব। আর ঐ বাস্তব আমাকে ব্যথা দেয়, সে তো কুরে কুরে খায় আমাকে। ক্যাথির কথা আমি বলবো না, আমি ভাবতেও চাইনা ওর কথা ; ও যদি অদৃশ্য হয়ে থাকে তাহলেই ভাল। ওর উপস্থিতি তো আমাকে ক্ষেপিয়েই তোলে। কিন্তু হেয়ারটন—ও তো অন্য অনুভূতিই নিয়ে আসে। যদি পারতাম, ওকেও এড়িয়ে চলতাম। ওর মুখ না দেখতে পেলেই খুশি হতাম। হিথক্লিফ একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, আমি যদি তোমাকে বলি ঐ হেয়ারটনকে দেখলে আমার মনে অতীতের কত হাজারো স্মৃতি জেগে ওঠে, তুমি তো আমাকে পাগলই ভাববে। কিন্তু তুমি আশা করি আমার মনের কথা শুনে কাউকে কিছু বলবে না। আমার মন তো নিজের গণ্ডীতেই বন্দী, অন্যের কাছে যদি তাকে দেখাতে পারি—সে তো আমার কাছে এক মস্ত প্রলোভন।

পাঁচ মিনিট আগে ঐ হেয়ারটনকে দেখে কি মনে হয়েছিল জান, ও যেন তখন আমার যৌবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিল। মানুষ বলে ওকে মনে হয়নি, মনে হয়েছিল আমারই অতীতের ছবি-প্রতীক। ও এমনভাবে আমার সঙ্গে এক হয়ে আছে, যে, ওর বিচার আমি যুক্তি দিয়ে করতে পারি নে। প্রথমেই ক্যাথেরিনের সঙ্গে ওর ঐ আশ্চর্য মিল, ও ওরই সঙ্গে যেন মিশে আছে বলে মনে হয়। কিন্তু তুমি ওটাকেই আমার আকর্ষণের প্রধান কারণ বলে মনে কোরো না। ও তো কারণই নয়। ক্যাথেরিনকে তো আমি সর্বত্রই দেখতে পাই। সবকিছুতেই তো আছে ওর স্মৃতি—এই তো এই যে মেঝে রয়েছে, এই মেঝেতে ওরই ছবি আঁকা। ও আছে মেঘে, গাছপালায়, রাতের হাওয়ায়—আর দিনের আলোয়।

ওরই ছবি আমার চারিদিকে ঘিরে আছে। সাধারণ নরনারীর মুখে, আমার নিজের মুখে ওরই তো মিল। আমাকে যেন তারা প্রতারিত করে। সমস্ত পৃথিবীটাই তো আমাকে জানিয়ে দেয় ও বেঁচে আছে, আর আমি ওকে হারিয়ে বসে আছি! হেয়ারটন তো আমার সেই অমর প্রেমিকার প্রেতায়িত ছবি। আমার দাবি জানাবার উদ্দাম প্রচেষ্টার প্রতীক—ও আমার অবনতি, আমার গর্ব, আমার সুখ, আমার ব্যথার প্রতীক।

কিন্তু তোমার কাছে একথা বলা তো ক্ষেপামি, শুধু তোমাকে জানাতে চাই, সব সময়েই একা থাকতে আমি চাই না কিন্তু ওর সঙ্গ তো আমার পক্ষে ভাল নয়; ও তো আমার ব্যথা বাড়িয়ে দেয়। তাই তো আমি ওদের দুজনের সম্বন্ধে এত উদাসীন। তাই তো আর ওর দিকে নজর দিই না।

কিন্তু এই যে পরিবর্তন, একে তুমি কি বলবে হিথক্লিফ? ওর কথায় ভয় পেয়েই আমি জানালাম। ও জ্ঞান হারায় নি, মুমূর্ষুও নয়, বরং স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী পুরুষ। আর ও তো ছোটবেলা থেকেই ঐ সব উদ্ভট কল্পনায় মত্ত থাকতে ভালবাসে। হয়তো ওর স্বর্গতা প্রেমিকা সম্বন্ধে ওর ক্ষেপামিই আছে, কিন্তু অন্যসব ব্যাপারে ও আমার মতোই সুস্থ, স্বাভাবিক।

পরিবর্তন না এলে কি করে বলবো, ও বললে, কিন্তু আমি যেন বুঝতে পারছি —আসছে।

অসুখ করেনি তো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

না, নেলি।

তাহলে মৃত্যুর ভয় তোমার নেই?

ভয়? না, ও উত্তর দিলে, আমার মৃত্যুর ভয় নেই, আশংকা নেই—আশাও নেই। কেন থাকবে বল তো? আমার এই মজবুত দেহ, এই মিতাচারী জীবন, আর নিশ্চিন্ত পেশায় আমি তো ভালই আছি। কিন্তু এতো আর চলে না। আমি যে নিশ্বাস ফেলছি একথা নিজেকে জানাতে চাই—আমার হৃদয়ের স্পন্দনের কথাও জানিয়ে দিতে চাই। এ যেন শক্ত এক টুকরো স্প্রিংকে

নোয়াবার চেষ্টা। বাধ্য হয়ে আমি কাজ করে যাই; বাধ্য হয়ে জীবিত মৃতের বাছ-বিচার করি।

আমার একমাত্র কামনা আছে, আর সেই কামনাই ছেয়ে রেখেছে আমার সমস্ত সত্তা। আমি সেই কামনা পূরণ করতে চাই। এতদিন ধরে, এমন অবিচলিত নিষ্ঠায় এ কামনাকে আমি কার্যকরী করতে চেয়েছি—আমার তো দৃঢ় আস্থা—এ কামনা আমার সফল হবে—শীঘ্রই হবে—কেননা আমার অস্তিত্ব তো সে আছন্ন করে রেখেছে। এরই সফলতার আশায় আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে। কিন্তু তোমার কাছে স্বীকার করে তো আমার ব্যথা কমলো না। তবু আমার মনের আর একটা দুর্জ্ঞেয় দিকের পরিচয় তুমি পেলে। ভগবান এ কি লড়াই—দীর্ঘ লড়াই—কবে এ লড়াই শেষ হবে কে জানে!

ও পায়চারি করতে লাগলো ঘরে, নিজের মনে কত ভয়ানক কথা আউড়ে গেল। জোসেফের কথায় আমার বিশ্বাস হোল, বিবেক ওর বুকখানাকে নরক করে তুলেছে। কোথায় এর শেষ হবে কে জানে! ও কখনো তো মনের অবস্থা কাউকে জানায় না। মিঃ লকউড, আপনি ওকে দেখলে তো বুঝতে পারবেন না একথা।

চৌত্রিশ

তারপর থেকে ক'দিন হিথক্লিফ রাতে খাবার সময়, আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগলো। কিন্তু তাই বলে হেয়ারটন আর ক্যাথিকে সে অব্যাহতি দিলে না। নিজের অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণে তো ওর সব চেয়ে ঘৃণা। তাই ও গরহাজিরই রইল। ও দিনে একবার খেলেও ওর তো শরীরের কিছু হয় না।

একরাতে সবাই তখন শুয়ে পড়েছে। টের পেলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে ও সদর দরজার কাছে এল। তারপর বেরিয়ে গেল। ও কখন ফিরেছে আর টের পেলাম না। ভোরে উঠে দেখি, ও তখনো ফেরে নি। তখন এপ্রিল

মাস, আবহাওয়া মধুর, উষ্ণ, ঘাস সবুজ, যেন সবুজ বর্ষার ধারা নেমেছে। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। দুটো বেঁটে আপেল গাছ দেয়ালের ধারে। সেখানে ফুটেছে ফুল। প্রাতরাশের পর ক্যাথি আমাকে চেয়ার নিয়ে ফার গাছের কাছে এসে বসতে বললে। ওখানে বসেই আমার কাজ করবো, আর ও ভুলিয়ে নিয়ে এল হেয়ারটনকে—তার খুদে বাগানখানা তৈরী করতে হবে। আমি বসন্তের সুগন্ধিতে মাতাল, উপরে কোমল নীল আকাশ আমাদের ক্যাথি ছুটে গেল ফটকের কাছে—কয়েকটা প্রিমরোজের চারা আনতে। মাত্র কয়েকটা নিয়ে ছুটে ফিরে এল। ও এসে খবর দিলে হিথক্লিফ আসছে।

ও কেমন যেন বিভ্রান্ত। বললে, উনি আমার সঙ্গে কথা বললেন।

কি বললেন? হেয়ারটন জিজ্ঞেস করলে।

উনি আমাকে দূর হয়ে যেতে বললেন, ক্যাথি উত্তর দিলে। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক ওর চেহারা যে, আমি থেমে পড়ে একবার না তাকিয়ে পারলাম না।

কি রকম দেখলে?

কেন—বেশ হাসিখুশি। কিছুই হয়নি, তবু যেন উত্তেজিত মনে হোল।

ওই রাত্রে চরে বেড়ানোয় উনি বুঝি খুশি হয়েছেন, আমি মন্তব্য করলাম কিন্তু ওদের তো অবাক হবারই কথা, মনিবকে হাসিখুশি দেখা তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার নয়। আমি একটা ওজুহাত দেখিয়ে ভিতরে গেলাম। হিথক্লিফ খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ও কাঁপছে, বিবর্ণ ওর মুখ কিন্তু চোখে কি আনন্দের ঝলমলানি! সমস্ত মুখখানার চেহারাই যেন বদলে গেছে। ওকে বললাম, কিছু খাবে নাকি? তোমার নিশ্চয়ই রাতে ঘুরে ঘুরে খিদে পেয়েছে। কথায় কথায় জানতে চাইলাম, ও কোথায় ছিল, কিন্তু সেকথা তো ওকে জিজ্ঞেস করা যায় না।

ও বললে, না খিদে পায়নি। ওর আনন্দের কারণ আবিষ্কার করতে চাই, একথা ও বুঝতে পেরেছে, তাই মুখ ফিরিয়ে নিলে।

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। ভৎ´সনা করবার এই সময় কিনা তাই বা কে বলবে! তবু বললাম,

বিছানায় না থেকে, বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোটা ভাল নয়। এখন যা দিনকাল, তাতে কখনো উচিত নয়। সর্দি লাগবে, জ্বর হবে। তোমার হয়েছে কি বল তো?

কিছুই হয়নি, ও উত্তর দিলে। এ আমার সইবে। তুমি এখন আমাকে একা থাকতে দাও। যাও ভিতরে ঢুকে পড়—আমাকে জ্বালিও না।

আমি ওর হুকুম মেনে নিয়ে চলে এলাম। পাশ দিয়ে আসতে আসতে লক্ষ্য করলাম, ও বেড়ালের মতোই হাঁফাচ্ছে।

আপন মনে ভাবলাম, এবার অসুখে পড়বে। ক'দিন ধরে কি করছে তাই ভাবছি।

সেদিন দুপুরে আমাদের সঙ্গে রাতে খেতে বসলো। প্লেটের পর প্লেট আমার হাত থেকে নিয়ে জড়ো করলে নিজেদের কাছে। এতদিন যে উপোস করেছে; তারই ক্ষতিপূরণ করবে এইভাবে।

নেলি, আমার সর্দি :হয় না, জ্বর হয় না, তোমার দেওয়া খাবারের কিরকম সদ্গতি করছি দেখ না।

কাঁটা আর চামচে তুলে নিয়ে খেতে গেল, কিন্তু হঠাৎ ওর খিদে যেন উবে গেছে। ও টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো কাঁটা-চামচ। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে, তারপর উঠে বেরিয়ে গেল। আমরা যখন খাচ্ছিলাম, ও বাগানে পায়চারি করে বেড়ালো। হেয়ারটন এবার উঠে পড়ে বললে, ও গিয়ে জিজ্ঞেস করবে—উনি কেন খেলেন না। ওর মনে হয়েছে, ওকে আমরা বোধ হয় ব্যথা দিয়েছি।

ও বেরিয়ে গেল। ফিরে আসতে ক্যাথি জিজ্ঞেস করলো, কি আসছেন নাকি?

না, ও উত্তর দিলে। উনি কিন্তু চটে যান নি। বরং খুশিই দেখলাম। ওঁকে বারবার জিজ্ঞেস করতে উনি বরং অসহিষ্ণু হয়ে উঠে আমাকে

চলে যেতে বললেন। উনি তো অবাক, কি করে অন্তের সজ এখন আমার ভাল লাগছে।

আমি ওর খাবার গরম রাখবার জন্তে উনুনের উপর রেখে দিলাম। ঘণ্টা দুয়েক পরে ও এসে ঢুকলো। কিন্তু তখনো শান্ত হয় নি। তখনো কালো ভ্রূর নিচে তেমনি অস্বাভাবিক আনন্দের ঝলক—মুখে তেমনি রক্তহীন পাংশু আভা, দাঁত মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে হাসিতে। দেহ কাঁপছে, দুর্বলতা বা শীতের কম্পন নয়। যেমন টান করে বাঁধা তার কেঁপে কেঁপে ওঠে—এ যেন তেমনি কম্পন, এতে শক্তির ইঙ্গিত আছে, ভীতির নয়।

ভাবলাম, জিজ্ঞেস করবো কি ব্যাপার? আমি ছাড়া আর কে-ই বা করবে? বললাম, হিথক্লিফ, তুমি কি কোনো সুখবর পেয়েছ? তোমাকে বড় উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

ও বললে, আমার কাছে কোথা থেকে ভাল খবর আসবে, নেলি? খিদেয় মরে যাচ্ছি, তাই অমন দেখছো। কিন্তু খেতে তো রুচি নেই।

রুচি নেই কেন, তোমার খাবার তো তৈরী।

না, এখন দরকার নেই। একেবারে শেষে খাব। নেলি, তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা, ঐ হেয়ারটন আর ঐ ওকে আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে বোলো। কেউ আমাকে বিরক্ত করে, তা আমি চাই না। এইখানে আমি একা থাকতে চাই।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের কি মানে বল তো? কেন তোমাকে এমন অদ্ভুত লাগছে হিথক্লিফ? কাল রাতে কোথায় ছিলে? শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছি না।

ও হেসে বললে, শুধু শুধুই এ তোমার প্রশ্ন। অহেতুক কৌতূহল। তবু আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। আমি তো নরকের ফটকে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু আজ আমি দেখে এসেছি স্বর্গের এক ঝলক। চোখ চেয়ে দেখেছি—আমার থেকে তিন হাত মাত্র ব্যবধানে। তুমি এখন যাও তো। তুমি যদি উঁকি ঝুঁকি না মারো, ভয়ের কিছু দেখবে না, শুনবেও না, একথা তোমাকে বলতে পারি।

চলে এলাম। আরো বেশি যেন ঘাবড়ে গেছি।

সেদিন বিকেলে আর ও বাড়ি থেকে বেরুল না। কেউ ওর নির্জনতায় অনধিকার প্রবেশও করলে না। রাত আটটার সময় আমার মনে হোল, ওর রাতের খাবার দিয়ে আসি। আর একখানা মোম। আমাকে ও ডাকেনি, তবু গেলাম। গিয়ে দেখি, জানালায় বসে আছে। কিন্তু বাইরের দিকে তো চোখ নেই। ভিতরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। আগুন এখন নিবন্ত, মেঘলা সন্ধ্যার ভিজে স্যাঁতসেতে হাওয়া এসে ঘর ভরে দিলে। নীরব রাত। শুধু গিমারটনের নদীর কুলুকুলু ধ্বনি শোনা যায়, উপলে উপলে বাধা পেয়ে ছলছল করে ওঠে। আমি সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে এলাম। কাছে ওকে সজাগ করবার জন্য বললাম, তোমার এই সামনের জানালাটা কি বন্ধ করে দেব?

আমি যখন কথা বলছিলাম, ওর মুখে খেলে গেল এক ঝলক আলো। মিঃ লকউড, আমি কি রকম চমকে গেলাম ওর চেহারা দেখে। ঐ গভীর কালো দুই চোখ। ঐ হাসি আর ঐ মৃত্যুম্লান মুখ! ওকে দেখে আর হিথক্লিফ বলে মনে হয় না—ও যেন এক প্রেত। আমি ভয়ে মোমখানা উলটে দিলাম। এবার তো ঘিরে এল আঁধার।

ও চিরপরিচিত স্বরে বলে উঠলো, হাঁ, এ জানালাটাও বন্ধ করে দাও। মোমখানা নিবিয়ে দিলে কেন। যাও, জলদি আর একখানা নিয়ে এস!

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জোসেফকে বললাম, কর্তা, একটা মোম চাইছে। আমার যেতে ভয় করছে।

ও চলে গেল, আবার কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে বললে, মনিব শুতে যাচ্ছেন। খাবার তাঁর চাই না। আমরা শুনলাম, ও সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে। ও নিজের কামরায় গেল না। সেই চাঁদোয়া-ঢাকা ডবল কামরায় ঢুকে পড়লো।

ও কি প্রেত না রক্তচোষা বাদুড় ভাবতে লাগলাম। আমি তো কত শয়তানের অবতারের কথা পড়েছি। তারপরে মনে পড়লো ওর শৈশবের কথা।

আমিই ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি; তারপরে ও একদিন পা দিলে যৌবনে। গোটা জীবনটাই চোখের সামনে ভেসে উঠলো, কিন্তু কোথা থেকে এল ঐ খুদে কালো ছেলে, কেনই বা মনিব নিজের পরিবারের ধ্বংসের জন্য ওকে আশ্রয় দিলেন? তন্দ্রাতুর মনে কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ওর বাপ-মার কথা ভাবতে শুরু করলাম। খেই পেলাম না, তারপরে হঠাৎ মনে হোল, কেমন হবে ওর মৃত্যু আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। কি হবে ওর সমাধিলিপি। ওর কোনো পদবী নেই—তাই শুধু হিথক্লিফ নামটাই থাকবে। আর তাই তো আছে। আপনি কবরখানায় গেলে দেখতে পাবেন।

এমনি করে কাটলো রাত। ভোরের দিকে আত্মস্থ হলাম। উঠে বাগানে গেলাম। ওর ঘরের জানালার নীচে লক্ষ্য করলাম: না, জানালা দিয়ে রাতে বাইরে যায় নি। পায়ের চিহ্ন নেই। ও তাহলে বাড়িতেই ছিল। আজ তাহলে ভালই আছে। ছোট হাজিরি তৈরী করে ক্যাথি আর হেয়ারটনকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বললাম। মনিব দেরী করে ওঠেন আজকাল। ওরা বাইরে খাবার বন্দোবস্ত করে নিলে। আমি গাছের তলায় ওদের জন্তে টেবিল পেতে দিলাম।

এসে দেখি হিথক্লিফ নীচে নেমে এসেছে। জোসেফ আর ও খামারের কথা নিয়ে কি আলাপ করছে। স্পষ্ট নির্দেশও দিচ্ছে বটে, কিন্তু ওর কথাগুলো যেন কেমন উত্তেজনাভরা, জোসেফ চলে যেতে ও গিয়ে নিজের জায়গায় বসলো। আমি ওর সামনে এনে রাখলাম এক পেয়ালা কাফি। ও টেনে নিলে পেয়ালা। কিন্তু চোখ ওর কাফির পেয়ালায় নেই, উল্টো দিকের দেয়ালে কি দেখছে।

আমি ওর হাতে খানকয়েক রুটি গুঁজে দিয়ে বললাম, কি দেখছ গো কর্তা, এখন খেয়ে নাও! কাফি তো জুড়িয়ে যাবে।

ও আমাকে লক্ষ্যই করলে না, তবু মুখে ওর হাসি। ওর অমন হাসির চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষা দেখাও ভাল ছিল।

আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, কত্তা গো, অমন করে তাকিয়ে থেকো না— যেন ভূত দেখেছ এমনি তোমার চোখ।

দোহাই তোমার, ও বললে, তুমিও অমন করে চেঁচিয়ো না নেলি। আচ্ছা বলতো নেলি, আমরা মাত্র দুইজনেই কি এ ঘরে আছি? একবার তাকিয়ে দেখ তো!

হাঁ গো, হাঁ, আবার কে থাকবে।

কিন্তু তবু ওর কথা মতো ফিরে তাকালাম। ও হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলে প্রাতরাশের বাসন-কোসন পিরীচ-পেয়ালা।

এবার বুঝলাম ও দেয়ালের দিকে তাকাচ্ছে না, ওর দৃষ্টি সামনে দুহাত দূরেও নয়। যা-ই ও দেখুক, ও সুখে বিভোর।

চোখ ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিকে এমনি করেই কেটে চললো সময়। রুটি পড়ে রইল, কাফি জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল। আমি সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হয়ে ঠায় বসে রইলাম। ওর চোখ খাদ্যবস্তুর দিকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিলাম। ও বিরক্ত উঠে পড়ে বললে, ও যখন হয় খেয়ে নেবে। হুকুম দিলে, ওর খাবার সময় আমাকে আর কখনো বসে থাকতে হবে না। খাবার রেখে যেন চলে যাই। এই কথাগুলো বলে ও বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আবার বাগানের পথে ও চলেছে ধীরে ধীরে। এবার খোলা ফটক দিয়ে বার হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল।

প্রহরগুলি যেন আশংকা-আকুল। বয়ে বয়ে যাচ্ছে, মন্দ গতিতে। আর এক রাত এল। আমি দেরী করেই শুতে গেলাম। বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না, হিথক্লিফ সেদিন ফিরলো দুপুর রাতে। ফিরেই শুতে গেল না। নিচের কামরাটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

হিথক্লিফের পায়ের শব্দ শুনছিলাম, অস্থিরভাবে পদচারনা করছে, আবার মাঝে মাঝে নীরবতা ভঙ্গ করছে দীর্ঘনিশ্বাসে। দীর্ঘ নিশ্বাস নয়, গোঙানি, অসংলগ্ন কথাও বলে গেল; একটা কথাই বোঝা গেল। ক্যাথেরিনের নাম। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, উদ্দাম সোহাগের সম্ভাষণ, দুঃখে গলে গলে পড়ছে।

মনে হয় ক্যাথেরিন যেন সশরীরে ওর সামনে রয়েছে। তাই বুঝি চাপা ওর স্বর, ব্যগ্র ওর স্বর—মনে হয় আত্মার গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে পড়ছে ওর সোহাগ। ঘরে ঢুকতে সাহস পেলাম না। কিন্তু ওর এই দিবাস্বপ্ন ভেঙে দিতে হবে। তাই আগুনের কুণ্ডটা নিয়ে পড়লাম। উস্কে দিলাম আগুন, ছাইয়ের গাদা সরিয়ে দিলাম। ও টের পেল, দোর খুলে ডাকলে।

নেলি, নেলি, ভিতরে এস! ভোর হোল নাকি? তোমার আলোটা নিয়ে এস!

জবাব দিলাম, চারটে বাজলো এইমাত্র, আলো চাই নাকি তোমার, উপরে যাবে।

না, উপরে যেতে চাই না। তুমি এখানে এসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যাও। যা করবার হয় কর।

আগে কয়লা ধরিয়ে নিই, তবে তো নিয়ে আসতে পারব। চোঙাটা নিয়ে ফুঁ দিতে শুরু করলাম।

ও পায়চারি করছে তো করছে, যেন ক্ষেপে গেছে। ওর বুক ঠেলে অবিরাম দীর্ঘনিশ্বাসের স্রোত বেরিয়ে আসছে। নিশ্বাস নেবার সময় নেই।

হিথক্লিফ বললে, ভোর হলেই গ্রীনকে ডেকে পাঠাব। কয়েকটা আইনের ব্যাপার জানতে হবে। এখনো আমার উইল করা হয়নি। সম্পত্তি কাকে দিয়ে যাব এখনো ঠিক করতে পারিনি। আমার কি ইচ্ছে জান—বিষয় সম্পত্তি যদি একেবারে ফুঁকে দিয়ে যেতে পারতাম তো বেশ হোত। পৃথিবীতে ওর আর অস্তিত্বই থাকতো না।

ওকে বাধা দিয়ে বললাম, আমি সেকথা বলবো না। এখন চলে গেলে তো যত অন্যায় করেছ তার কোনো শাস্তিই পাবে না। আমি তো ভাবিওনি, তোমার এমনি দশা হবে। নিজের দোষে তোমার এই দশা। এই কটা দিন যেভাবে কাটিয়েছ দৈত্যেরও সে ধকল সয় না। কিছু খাও, একটু জিরোও। একবার আরসীতে চেয়ে দেখ না, তোমার ঐ দুটোরই দরকার আছে

কি না! গাল তো বসে গেছে, যেন কতদিন উপোস করে আছো, আর না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ লাল।

ও উত্তর দিলে, আমি যে খেতে বা জিরোতে পারছি না, সে কি আমার দোষ! তোমাকে হলফ্ করে বলছি, আমার কোনো মতলব নেই। আমি খেতে পারলে এখুনি খাব, জিরোবও। কিন্তু যে-লোক পারের কাছাকাছি এসেছে, তাকে জিরোতে বলছো কি করে, তাকে তো ঢেউয়ের সঙ্গে আর কিছুক্ষণ লড়তে হবেই। আগে পারে পৌঁছুই, তারপর বিশ্রামে গা ঢেলে দেব। গ্রীন চুলোয় যাক এখন! আর নিজের অন্যায়ের অনুশোচনার কথা বলছো! আমি তো কোনো অন্যায় করিনি তাই আমার অনুশোচনাও নেই। আমার অফুরন্ত সুখ, কিন্তু তবু আবার মনে হয়, যথেষ্ট সুখ আমি পাইনি। আমার আত্মার আনন্দ আমার দেহটাকে তিলে তিলে ধ্বংস করছে, কিন্তু নিজেও সে তো তৃপ্তি পাচ্ছে না।

চেঁচিয়ে উঠলাম, তুমি সুখী? তাহলে সে এক অদ্ভুত সুখ বলতে হবে! যদি রাগ না কর তো বলি, তোমাকে আমি সুখের উপায় বাতলে দিই!

দাও, তাই বাতলে দাও।

হিথক্লিফ শোন, তেরো বছর বয়েস থেকে তুমি স্বার্থপরের মতো জীবন কাটিয়েছ, ধর্মেরও খোঁজ-খবর রাখনি। কখনো বাইবেলখানা ছুঁয়েও দেখনি। হয়তো তাতেও কি আছে তাও ভুলে গেছো। একজন পাদ্রি ডেকে আনো, তাঁর কাছে শোন, বাইবেল ভুলে গিয়ে তুমি নিজের কি অপকার করেছ। স্বর্গরাজ্যে তো তুমি ঠাঁই পাবে না।

ও বললে, নেলি, তুমি যে আমাকে আমার অন্ত্যেষ্টির কথাটা মনে করিয়ে দিলে এর জন্যে সত্যিই আমি খুশি। আমাকে কিভাবে গোর দেওয়া হবে, বলি। সন্ধ্যের দিকে আমাকে ওরা নিয়ে যাবে গীর্জায়। ইচ্ছে হলে, তুমি বা হেয়ারটন আমার শবাধারের সঙ্গে যেতে পার। শুধু দেখাবে, ওর শবাধারের পাশে আমারটি রাখা হয়েছে কিনা। পাদ্রির দরকার নেই, প্রার্থনারও দরকার

নেই। তোমাকে তো বলেছি, আমার স্বর্গরাজ্য প্রায় কাছে এসে গেছে। অন্য কিছুর আমার কাছে কোনো মূল্য নেই।

ধর, তুমি উপোস করে মরলে, ওরা যদি তোমাকে গীর্জার গোরস্থানে কবর দিতে না দেয়।

তা হবে না। তুমি তা হতে দেবে না। যদি তুমি তা হতে দাও, জানবে মরা মানুষ আবার উঠে আসতে পারে।

আর সবাই জেগেছে, সাড়া পেয়ে ও আবার নিজের গুহায় ফিরে গেল। আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম, বিকেলে জোসেফ আর হেয়ারটন যখন কাজে ব্যস্ত, ও আবার রান্নাঘরে এল। ওর চোখে তেমনি উন্মাদ দৃষ্টি। ও আমাকে ওর কাছে গিয়ে বসতে ডাকলো। কাউকে ওর সঙ্গী চাই। আমি রাজি হলাম না; জানালাম, ওর অদ্ভুত কতাবার্তা আর ভাবভঙ্গী আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়। আমার তাই ওর সঙ্গী হবার ইচ্ছে নেই, আর ইচ্ছে থাকলেও স্নায়ুর সে ধকল সইবে না।

ও হেসে বললে, তুমি বোধ হয় আমাকে একেবারে শয়তান বলেই ঠাউরে বসে আছো, আমার মতো এমন ভয়ংকর জীবের সঙ্গে এক ছাউনির নীচে থাকা যায় না, তাই না?

ক্যাথিও সেখানে ছিল। ওকে আসতে দেখে আমার পিছনে লুকিয়েছিল। ওর দিকে তাকিয়ে বললে, কি তুমি আসবে নাকি? ভয় নেই, আমি তোমাকে মারব না। না, না! তোমার কাছে আমি তো শয়তানেরও অধম। কিন্তু একজন তো আমার সংস্পর্শে এলে ভয় পাবে না। কিন্তু ও বড় নিষ্ঠুর। ওর নিষ্ঠুরতা যে রক্ত মাংসের শরীরে আর সয় না!

আর কারো সংশ্রব সে রাখতে চায় না। একা থাকতে চায়, তাই সন্ধ্যে হতেই চলে গেল ওর কামরায়। সারা রাত আর ভোর অবধি শুনলাম ওর গোঙানি আর অস্পষ্ট স্বর। হেয়ারটন ওর ঘরে ঢুকতে চাইলে। কিন্তু আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, কোনো ডাক্তারকে ও এখুনি গিয়ে নিয়ে আসুক, তিনি এসে দেখে শুনে যা হয় ব্যবস্থা করুন। ডাক্তার

তো এলেন, আমি দরজা খুলতে কত অনুরোধ করলাম। শেষে নিজেই খোলার চেষ্টা করলাম। ভিতর থেকে চাবি বন্ধ। হিথক্লিফ আমাদের সাড়া পেয়ে গাল পাড়তে লাগলো। ও জানালে, ও ভাল আছে, ও এখন একা থাকবে। ডাক্তার চলে গেলেন।

সন্ধ্যেয় নামলো বৃষ্টি। ভোর অবধি বর্ষণ আর থামে না। আমি ভোরেই বেড়াতে বেরুলাম। বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখি হিথক্লিফের কামরার জানালা খোলা। বৃষ্টি জানালা দিয়ে সোজা ঢুকেছে ঘরে। ভাবলাম, বিছানায় ও নিশ্চয়ই শুয়ে নেই। থাকলে বৃষ্টির পশলা ওকে ভিজিয়ে চুপ চুপে করে দিত। হয় উঠছে, নয়তো বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আর ভাবনার সময় নেই। সাহস করে গিয়ে দেখতে হবে ব্যাপার কি!

আর একটা চাবি দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঢুকে শার্সিগুলো দিলাম তুলে। ঘর ফাঁকা। এবার চারদিকে তাকালাম। হিথক্লিফ শুয়ে আছে। ওর চোখ দেখে চমকে উঠলাম। হঠাৎ ও হাসলো। ও যে মরে গেছে ভাবতে পারিনি কিন্তু ওর মুখ ভেজা; বিছানার চাদর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। ও নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই। ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম। হাঁ, এবার নিঃসন্দেহ হলাম—ও মারা গেছে!

জানালা বন্ধ করে দিলাম। ওর দীর্ঘ কালো চুল কপালের উপর থেকে পিছনে আঁচড়ে দিলাম। চোখ বুজিয়ে দিতে গেলাম। যদি সম্ভব হয় তো ঐ ভয়ংকর দৃষ্টি আমি বুজিয়ে দেব। অন্যে না দেখুক, তাই আমি চাই। কিন্তু চোখ তো বোজান যায় না, আর দাঁতের সারও ব্যঙ্গে ঝলসে উঠেছে। ভয় হোল, জোসেফকে চীৎকার করে ডাকলাম। জোসেফ নেমে এল। কিন্তু মরাকে সে ঘাঁটতে রাজি নয়।

ও চেঁচিয়ে বললে, শয়তান ওর আত্মা দখল করে বসে আছে। উঃ, মরবার সময়ও কি ভীষণ দেখাচ্ছে গো। ও বুঝি বিছানার চারদিকে নাচবে এমনি ভাবখানা! হঠাৎ কি ভেবে থেমে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে ও দুহাত তুলে

ভগবানকে ধন্যবাদ জানালে, সত্যিকার যারা উত্তরাধিকারী তারাই আবার ফিরে পেল তাদের বিষয়-আশয়!

আমি তো হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমার পূর্বস্মৃতি মনে পড়ছিল। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ পেল হেয়ারটন, অথচ ও তো সবচেয়ে নিগৃহীত। সারা রাত মৃতদেহের পাশে বসে রইল, কাঁদলো, ঐ ব্যঙ্গ আর আদিম বর্বরোচিত অভিব্যক্তিময় মুখে চুমু খেল, হাত ধরে রইল, আর কেউ তো ও কথা ভাবতেই পারে না। ইস্পাতের মতোই দৃঢ় হয়ে গেছে ওর হৃদয়, তবু উদারতা মুছে যায় নি। ওর কান্না দেখে তাইতো মনে হোল।

কেনেথ ডাক্তার তো হতভম্ব হয়ে গেলেন, কি সে ও মরলো, তিনি বুঝতে পারেন নি। ও যে চারদিন কিছু খায়নি সে কথা বলিনি। কি জানি আবার কি মুশকিলে পড়বো। তারপরে শুনলাম, ইচ্ছে করে উপোস করেনি। ওর ঐ অদ্ভুত রোগের জন্যেই উপোস করেছিল, উপোসটা মৃত্যুর কোনো কারণই নয়।

ওর ইচ্ছে অনুসারে ওকে আমরা কবর দিলাম। সারা অঞ্চলে নিন্দা রটে গেল। হেয়ারটন, আমি আর গীর্জার সেক্সটন আর শবাধার বয়ে নিয়ে চললো ছজন মানুষ। গোরস্থানে নামিয়ে দিয়েই ওরা চলে গেল। আমরা রইলাম। হেয়ারটন চোখের জলে ভেজা মুখ নিয়ে সবুজ ঘাসে ভরা জমি খুঁড়তে লাগলো। তারপর ওকে নামিয়ে দেওয়া হোল কবরে। এখন তো ওর পাশের কবরটির মতো মসৃণ আর সবুজ হবে। আমার তো মনে হয়, ও আরামেই সেখানে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু গাঁয়ের মানুষরা তো বাইবেল ছুঁয়ে হলফ করে বলবে, ও ঘুরে বেড়ায়, কেউ কেউ নাকি গীর্জার কাছে ওকে দেখতেও পেয়েছে। আবার হাওরের ধারে, বাড়িতেও নাকি ওকে দেখা গেছে। আপনি বলবেন, এসব আষাঢ়ে গল্প। আমিও তাই বলবো। কিন্তু ঐ যে রান্না ঘরে যে লোকটা রয়েছে, ও নাকি ও নিজের কামরা থেকে ওদের দুজনকে দেখেছে। বাদলা দিন হলেই নাকি ওরা দুজন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মাসখানেক আগে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। একদিন সন্ধেবেলা, গ্রেঞ্জে যাচ্ছিলাম।

অন্ধকার মেঘলা রাত, বাজ পড়বার ভয় আছে। হাইটস্ থেকে বাঁক নিয়েছে যেখানে পথটা, সেখানে একটা রাখাল ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা ধাড়ি ভেড়া আর দুটো ছানা তার সঙ্গে; খুব কাঁদছে ছেলেটা। ভাবলাম, ছানাগুলি বুঝি বাড়ি ফিরতে চাইছেনা—তাই ওর কান্না।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কি গো, কি হয়েছে?

ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, ঐ যে গো, হেথায় হিথক্লিফ আর মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। কি করে যাব গো।

আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু ছেলেটাও যাবে না। ভেড়া আর ছানাগুলোও নড়ে না। আমি নিচের সড়ক ধরে যেতে বললাম। বাবা আর সঙ্গীদের কাছে শুনেছে গল্প, তাই কল্পনায় ওদের দেখেছে। কিন্তু তবু গা ছম ছম করে উঠলো। কি বলবো, অন্ধকারে আজকাল বাইরে বেরুতে আর সাহস হয় না। এই বাড়িতে একা থাকতেও ভয় পাই। কিন্তু কি করবো। ওরা গ্রেঞ্জে গেলে তবে আমার স্বস্তি।

বললাম, ওরা তাহলে গ্রেঞ্জেই যাচ্ছে?

মিসেস ডীন উত্তর দিলে, হাঁ, বিয়ে হলেই যাবে। নতুন বছরের প্রথম দিনে তো ওদের বিয়ে।

এখানে কে থাকবে?

জোসেফ তদারক করবে, আর তাকে সাহায্য করতে যে কোনো একটা ছোঁড়া হয় তো থাকবে। ওরা রান্নাঘরেই থাকবে—বাকি বাড়িটা থাকবে বন্ধ।

অর্থাৎ, যে-কোনো ভূতের ইচ্ছে হলে এসে বাসা বাঁধবে—এইতো!

না, না, মিস্টার লকউড, নেলি মাথা দুলিয়ে বললে, মরা মানুষরা শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে ওদের সম্পর্কে ওভাবে কথা বলা ঠিক নয়!

ফটক খুলে গেল এবার। ভ্রমণকারীযুগল ফিরছে।

ওরা তো কাউকেই ডরায় না—এমন ওদের ভাবখানা। আমি জানালা দিয়ে ওদের দেখে বলে উঠলাম। ওরা শয়তান আর তার দলবলকে তুচ্ছ করবে।

ওরা দরজার সিঁড়িতে এসে থামলো—শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে চাঁদকে—না ঠিক করে বলতে গেলে, চাঁদের জ্যোৎস্নায় পরস্পরকে নিচ্ছে দেখে। আমি ওদের এড়াইতেই চাইলাম। মিসেস ডীনের হাতে আমার স্মৃতিচিহ্ন গুঁজে দিয়ে চলে এলাম। সে কত বললে। কিন্তু ওরা দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই আর দাঁড়ালাম না।

বাড়ির পথে ফিরতে দেরীই হোল। গেলাম গীর্জা দেখতে। এই সাত মাসে গীর্জাটা যেন আরো পুরোনো হয়ে গেছে। বহু জানালা ফাঁকা—কাচ নেই, রেলিঙ ভেঙে ভেঙে পড়ছে এখানে ওখানে। আসছে হৈমন্তিক ঝড়ে আরো ধসে পড়বে।

খুঁজতে লাগলাম। শেষে আবিষ্কার করা গেল জলার কাছে তিনটি সমাধি ফলক। মাঝখানেরটি ধূসর, আধখানা মাটিতে পোঁতা; এড্গার লিন্টনেরটির উপর ঘাস আর শ্যাওলা ঢাকা—শুধু সেইখানেই আগেরটির সঙ্গে তার মিল। আর হিথক্লিফেরটির উপর এখনো পড়েনি ঘাস আর শ্যাওলার আস্তরণ।

আমি অনেকক্ষণ রইলাম। উপরে প্রসন্ন উজ্জ্বল আকাশ। তাকিয়ে দেখছিলাম, প্রজাপতিগুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছে ঝোপে ঝাড়ে, ফুলে ফুলে গিয়ে বসছে। কান পেতে শুনলাম ঘাসের ভিতর দিয়ে বয়ে-যাওয়া বাতাসের মৃদু নিশ্বাস। মনে হোল, এমন নিরালা জগতে নিদ্রিতদের ঘুম যে গভীর নয়—এতো কল্পনা করা যায় না!